জনাব তসলিমউদ্দীন আহমদ
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর

প্রবন্ধ

শুদ্ধতম কবি (২য় সং)

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

জীবনানন্দ দাশের গদ্য-লেখা

অর্কেস্ট্রায়ন

কবিতা

ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ

নির্বাচিত কবিতা

ছোটগল্প

সত্যের মতো বদমাশ (২য় সং)

চলো যাই পরোক্ষে

মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা

উপন্যাস

পরিপ্রেক্ষিতের দাস-দাসী

সূচিপত্র

কথাসাহিত্য প্রাসঙ্গিক

এটা আমার কাছে বহুদিন থেকে ক্ষোভের বিষয় হ'য়ে আছে যে, বাংলাদেশের একজন খাঁটি লেখক আত্মহত্যা কিংবা অতিঅকালমৃত্যু বেছে নিলেন না। এর কারণ, আত্মহত্যার জন্য যে-টানজোগানময় মননভূমির অবশ্য-প্রয়োজন, যেখান থেকে সৃষ্টি ও আহ্বানের শিহরিত উৎসারণ চিরকালের, বাংলাদেশে তার অহেতুক অভাব: আমরা বলি, 'ওহে জীবন, তুমি নন্দনসর্বস্ব নও জানি, তোমাতে প্রবিষ্ট হবার অধিকারও দিলে না, তবু তোমার সঙ্গে কিছুকাল ঘর করতে হবে আমাদের, কাজেই এসো তোমার সঙ্গে একটা মিটমাট ক'রে ফেলি।' বিপদ-আপদের সুবিধায় এইভাবে আমরা ঈশ্বরপূজায় নমিত হই, বেঁকেচুরে থেকে যাই যে-কোনো প্রতিবেশ থেকে 'মঙ্গল' উদ্ধারে: 'জীবনের সঙ্গে মিটমাট' নামক এই ব্যাপারটি মরিয়ারকমে দুঃসহ, আদর্শচ্যুতির মজা ছাড়া শূন্য, ফাঁপা, ভঙ্গুর ও আত্মপ্রবঞ্চক। যে-লোকটাকে গ্রহ থেকে লুপ্ত ক'রে দিতে পারলে রক্তে হাততালি পড়ে, কেন তার কাঁধের উপর সন্ত হাত রেখে কথা বলি? যাকে অসহ্য লাগে, তার কোনো-একটি ছোট্টো গুণ প্রাণপণে খুঁজে, কেন মানুষের মঙ্গলকরতার অসম্ভব প্রশংসায় মেতে উঠে নিজেকে ঠকাই, বাঁচাই? একটি প্রবৃত্তিচালিত লোক কেন খুন করতে ভয় পায়? একজন শক্তিমান ও ফানুশপ্রতিম সাহিত্যিক কেন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ ক'রে নিজেকে নিজের উপর স্থাপন করেন না? আমি ভাবি। কিন্তু বাংলাদেশে এই ভীরুতা ও আলস্য কেবলমাত্র জীবনেই অবিচ্ছিন্ন নয়, হায় সাহিত্যের গাধার প্রবাহ আত্মজালিয়াতিময় পুণ্য-ভরা চালের কুসংস্কারে চ'লে যায় বৎসর-বৎসর। অনুভবহীন পুরোনোর অনুকরণ: মঙ্গলকাব্যের শতাব্দী-ব্যাপী রক্তহীন, কাব্যহীন চক্রবর্তী গ্রথিত বুঝি আমাদের মজ্জারক্তে। পশ্চিমে যেখানে নব-নব আন্দোলনের পুণ্য পৃষ্ঠদেশে সাহিত্যের রাজপুত্রের

দল অবিশ্রাম কম্পমান অগ্রসরমান, আমাদের প্রতিষ্ঠিতের দল গড্ডলের সেবাব্রতে ও সময়ের উল্টোপথে নিখিল থেকে বিচ্ছিন্ন, দীপ্ত ফাল্গুনের হায় শিক্ষাও চৈতন্যের মোড় ফেরাতে পারে না। পাস্টারনাক-এর সমকালীন রুশ মননজীবীর দল এবং একজন অপার রাজকুমারী, বেগম ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, আপনাপন জীবনের মহান্‌ ঠাট্টায় আমাদের আক্রমণ করেন, যখন অতিব্যবহৃত রাঙাপথের ধুলোয় আমাদের বিবেক ছোটে।

১৯৬২-র কোনো-এক শীতের উপস্থিত দুপুরে কোনো-এক পত্রিকাপত্রে কলিন্‌ উইল্‌সন্‌ ও অন্য-একজন বিস্মৃত বাক্যধুরন্ধরের স্বল্পায়তনিক এক আক্রমসম্মত এই শতাব্দীর একাধারে নির্মম ও সহৃদয়তম আক্রমণকারী ডি. এইচ. লরেন্স এর কতকগুলি চিত্রচীৎকার দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সৌভাগ্য হয়েছে, তার অন্যতম কারণ, যদিচ এই শতাব্দীর সমগ্র ক্রুশকাষ্ঠে অর্পিত শরীরময় প্রাণের অধিকারী এক মহানের সংস্পর্শজনিত উল্লাস, তত্রাচ মূলে ঐশী এক সুযোগ: মনে হয়েছিলো যেন সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নের মধ্য থেকে আশ্চর্য যোগসূত্র উদ্বোধিত হচ্ছে পরাক্রান্ত ঈশ্বরসমেত। স্বপ্নময় ও আদর্শায়িত, আরণ্যিক ও সদুত্তরহীন এই সকল চিত্রচীৎকার আমার কটিতলে তৃতীয় একটি চক্ষু উদ্ভিন্ন করে: চিত্রের অন্তর্ভূত নগ্ন এবং খাঁটি কুশীলবেরা তাদের ভারি অসুন্দর মুখ, সুগঠিত নিতম্বপ্রধান শরীর এবং শরীরময় তদন্তে আমাদের রক্ত-স্বপ্ন-ইচ্ছা স্পর্শ করে। সাহিত্যের সহিত সূর্যউপাসকদের এইরকম আলুলায়িত যোগ আছে। লরেন্সের চিত্রচীৎকারীগণ দেহের দিক থেকে নগ্ন, তথাকথিত কথাসাহিত্যে আমি চাই নগ্ন আত্মার লীলা। তথাকথিত বাস্তবতার আর দরকার নেই; যে-সব মাংসভুক সাঁড়াশিগণ আমাদের নিজস্ব খাবার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট, এবং তার বাধা ও ব্যাঘাতে মনোলোকে স্তরে স্তরে যে-সব জ্যান্ত আয়তন রচিত হয়, তারই পুঙ্খে-পুঙ্খে আমরা চারিয়ে দেবো তদন্ত এবং ফলে হয়তো কখনো-কখনো গ্রেফতার ক'রে আনতে পারবো এমন কিছু যা আমাদের চক্ষের অতীত, ভাবনার অনধিগম্য, রক্তের পরপারে। মনোলোক থেকে রত্ন ও আতঙ্ক উদ্ধার ক'রেই চ'লে যেতে পারে অনেকানেক জীবন: কেননা মনোবিন্যাসের কাউন্টেনান্স অদ্যাবধি কোনো বিজ্ঞানে নিবিষ্ট হয়নি, অতলের আলোর পশ্চাতে মায়ার পশ্চাতে আমরা কেবল অর্ধচৈতন্যের গুণ টেনে নিয়ে যেতে পারি কূলে-কূলে, সেই

অলৌকিক মাঝিকে আমরা কোনোদিনই সম্পূর্ণ দেখার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবো না, কোনো একটিমাত্র সত্যকে কোনোদিনই মুঠোর মধ্যে বলের মতো পেড়ে ফেলতে পারবো না, এবং সেজন্যেই বাঁচোয়া, সেজন্যেই অলোকমিস্ত্রিরা অতল আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হ'লে খুশির সাহসে ব'লে উঠি, 'ধন্যবাদ, মনোজ মল্লিনাথ!'

অতঃপর চারিটি অগত্যা অবিনয় প্রস্তাব নিবেদন করি,—নিজেকে, কেননা আমি সাহিত্যে সচেষ্ট, এবং সাহিত্যে সর্বজনব্যবহারযোগ্য প্রস্তাবের অসারতা সম্বন্ধে আমি সচেতন আছি।

শিল্পের পণ্ডিতের মুখে চাঁটি মারো

পাঠকের মুখে সুপরিকল্পিত সুনিয়মিত চাঁটিস্থাপন পশ্চিমে অনেক আগে শুরু হ'য়ে গেছে; বঙ্গদেশে তার ঢেউ এসে নূতন লাগলো। নব্য কথকেরা পাঠকের মুখে তো চাঁটি মারবেই, বিশেষত পণ্ডিতের মুখমণ্ডল তাদের লক্ষ্যস্থল। যে-কোনো চেতনশীল লেখককে সময় এই কথাটা ভাবিয়েছে যে, শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগ, যেমন চিত্রকলা, কি ভাস্কর্য, কি সঙ্গীত, ইত্যাদি, যখন বাঁকা প্রকাশকে অবলম্বন করেছে, সাহিত্য কেন পুরোনো চালে যাতায়াত করবে? চাই নূতন প্রকাশরীতি, অগোচর মনোবিন্যাসের উন্মোচন, চাই প্রথম জানোয়ারশোভন চীৎকার। কতকগুলি অক্ষরের ক্রীতদাস হ'য়ে এবং কতকগুলি অতিব্যবহৃত প্রকরণের সেবায় নিযুক্ত করবো কেন নিজেকে? গল্প লিখতে গিয়ে আমরা এখন কবিতা বা প্রবন্ধ লিখবো স্বেচ্ছাকৃত ভুলে, উপন্যাস লিখতে গিয়ে আদি প্রাচীন রচনাসম বিশ্বব্যাপার স্বেচ্ছাকৃত ভুলে। কেননা জীবন একটি ছোটোগল্প নয়, জীবন একটি উপন্যাস নয়, —আবহমান সাহিত্য এই ভীষণ স্বেচ্ছান্ধতা স্বীকার ক'রে নিয়েছে; কিন্তু জীবনকে আমরা বিভক্ত করবো না, জীবনকে আমরা জীবনের মতো উপস্থাপিত করবো, নিজেকে উৎসারণ করবো জীবনের পাত্রে দুঃখের মতো সংলগ্ন হ'য়ে। ভুল-জীবনে লেখক হ'য়ে এসে, এই রকম সময়ে যদি এমন একটি তুমুল বিষয় রচনা করতে না-পারি, যা পাঠ ক'রে পণ্ডিতের মনে হবে তার সমস্ত শিক্ষার পরেও কিছু আছে কিছু থেকে যায়, তাহ'লে সমগ্র পরিশ্রম পণ্ডশ্রম মনে করা উচিত।

'বাঁধা রাস্তার আধুনিকতাগিরি' আমাদের জন্য নয়; পুরোনো খবরকে তুমুল সুসমাচারে পরিণত করাই আমাদের লক্ষ্যঃ এক ফোঁটাও তথ্য নয়, বিচিত্র বিচ্ছুরণ, বাঁশি যেমন শূন্যতার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে তেমনি 'কিছুই-না'র মধ্য দিয়ে আমরা সকলে মহাকালে ঝ'রে যাবো। কিছুই-না, কিছুই-না, কিছুই-না, -কে ঘিরে-ঘিরে দণ্ডিত উচ্চারণ আমাদের, কেননা এই গ্রহ এবং গ্রহ-ছাড়ানো যে-জীবনের ভুল দাঁড়িয়ে আছে তা 'কিছুই-না'র রাজ্য। জনাব 'না' আমাদের আদিআব্বা। শিল্পের পণ্ডিতের মুখে অবিচ্ছিন্ন চড়চাপড় মেরে আমরা তাঁর ত্রয়ী চরণে পতিত হবো। অতএব, এখন গল্প গল্পহীন, উপন্যাস উপন্যাসহীন হ'য়ে উঠুক।

যাও পশ্চিমে যাও

বাঙালি গল্পে বাঙালি উপন্যাসে দেশ আজ মেঘেলা, পশ্চিম একমাত্র উদ্ধার। পশ্চিমে যে-সব বড়ো-বড়ো আন্দোলন এই অর্ধাধিক শতাব্দী ভাসিয়ে অবিশ্বাস্য সব দীর্ঘজীবী গ্রন্থের সাঁকো লুটে নিয়ে চ'লে যায়, শিল্পসাহিত্যে, আমি মনে করি এই বঙ্গদেশে তার পরম্পরাক্রম পুনরুত্থিত গভীর যাতায়াত সম্প্রতিকালে অত্যাবশ্যক। কেবলমাত্র আশুতোষ, সুখদ, নীরক্ত গ্রন্থের প্রজননে বঙ্গদেশ বোকার মতো ভেসে থাকবে; কথাসাহিত্য কবিতাসাহিত্য এইরকম নিরর্থ, বিমর্ষ, নীতিপ্রাণ ভেদজ্ঞানে বঙ্গদেশ কেবলি কেঁপে উঠবে; কেবলি নির্দোষ গল্প সৃষ্টি হবে, কেবলি নিরপরাধ উপন্যাস, সুগোল গল্প, সাধারণের উপন্যাস—এ-কালীন বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে এর চেয়ে মর্মান্তিক কিছু আছে ব'লে আমি মনে করি না। নব্য কথকদের উপর সমগ্র ইউরোপ যদি একে-একে গভীর বলাৎকার না করেন—তাহ'লে নব্য সওগাত গর্ভের নিকটে এসেও সৃষ্টি ও শ্রদ্ধার অপর পারেই অধিবাস করবে। শিল্পের পণ্ডিতের মুখে চাঁটিস্থাপন যদি আমাদের কর্তব্য হয়, তাহ'লে পশ্চাৎশিক্ষার সান্দ্র সাহচর্য ও প্রতিবেশ জপমালা ক'রে তুলতে হবেঃ বঙ্গসাহিত্যে তখনই য়োরোপীয় গল্প, য়োরোপীয় উপন্যাস, য়োরোপীয় নাটকের সম্ভাবনা হবে নিয়তিসম।

কলকাতার দিকে তাকিয়ো না—আত্মার দিকে

কিন্তু সারি-সারি হংসঅর্জন কিরূপে সম্ভবে? পশ্চিম এবং আত্মা,

এই দুইকে, মিলনসময়ের স্বামী-স্ত্রী ক'রে তুলতে হবে! এরকম বাস্তব-পীড়িত সত্যসংবাদ রটনা করতে হ'লো এই কারণে যে, বাংলাদেশের নব্য রচয়িতাদের দেখছি সব প্রবীণদের মতোই; কলকাতার দিকে মুখ ফেরানো; পশ্চিম এবং আপন আত্মা থেকে ঘাড় উল্টে কম্পমান অগ্রসরমান বঙ্গভাষার একাংশের দিকে তাকিয়ে থাকা হীনমন্যতার লক্ষণ—অবশ্য হীনমন্যতা থেকেই সকল সাহিত্য জন্মায়, যিনি যতো হীনমন্য সাহিত্যে তাঁর সম্ভাবনা ততো বেশি, কিন্তু এই হীনমন্যতা আপন আত্মা থেকে রূপবান জন্ম নেয়; কলকাতার দিকে তাকিয়ে আমাদের অনুকারবৃত্তি সন্তোষ পাচ্ছে, আদর্শ পঙ্গু, এটা অনুচিত। কলকাতার প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই, তত্রাচ দুঃখ না-ক'রে উপায় থাকে না যখন সকলকে আত্মা থেকে চোখ তুলে, পশ্চিম থেকে চোখ তুলে ঐদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখি সারে-সারে।

আসলে সময়ের সঙ্গে ছুটতে হবে, রবীন্দ্রনাথ নামক ঘনঘোর ঠাকুরের মতো, মুগ্ধতা কাটিয়ে, সর্বস্ব পশ্চাতে ঝেড়ে, সময়ের সঙ্গে চ'লে যেতে হবে। আত্মা এবং অগত্যাপশ্চিমের সঙ্গমমন্ত্র পড়তে পড়তে, সারি সারি গম্ভীর বিজ্ঞের সামাজিক মুখে প্রাপ্য চড়ের বেতন কষিয়ে, উপলক্ষে-উপলক্ষে নগ্ন হ'য়ে, মানদণ্ডহীন পূর্বাপরময় সময়ের সঙ্গে ছুটে যেতে হবে।

চলো যাই পরোক্ষে

এবং এইভাবে আমরা চ'লে যাবো পরোক্ষে,—যেখানে সৃষ্টি ও আহ্বানের জানোয়ারশোভন উৎসারণ, অস্থায়ী আলোর অস্থায়ী মায়ার পশ্চাতে বীজের মতো জোড়া-জোড়া চোখ, যেখানে দিনের আলোয় নগ্ন হ'য়ে যেতে একগুচ্ছ বিঘ্ন নেই, বিকল্প—শুধু বিকল্পের ঘূর্ণায়মান আসন, প্রতীক—মঙ্গলামঙ্গলে কেবলি প্রতীক, জানোয়ার—অসম্বদ্ধ জানোয়ার। পরোক্ষ থেকে সেখানে আমরা গুচ্ছ-গুচ্ছ আক্রমণ চালাবো আমাদেরই নির্ভরগুলিকে, ছেঁকে আনবো রত্ন ও জানোয়ার, যেন আত্মআবিষ্কারের পর আমাদের ফাঁপা শরীর কবরে পৌঁছোয়, ছিনিয়ে আনবো স্বপ্ন ও রিভেরি, যেন যে-কোনো মুহূর্তে আত্মহত্যার উপযোগী হয় আমাদের ভাবনা-বেদনা॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কালো সূর্যের নিচে বহ্ন্যুৎসব

সেটা ছিলো ১৯১৪-র মধ্যগ্রীষ্ম, যখন য়োরোপে ছোট্টো একটি যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে অচিরেই মহাদেশের পাঁচটি বৃহৎ শক্তিকে জড়িয়ে ফেললে শীতোষ্ণ নাগপাশে, আর তারপরই দ্রুত-ঘন করতালে পৃথিবী ভ'রে শুরু হ'য়ে গেলো এই শতকের প্রথম প্রধান যথেচ্ছ তাণ্ডব। এতোদিনে বিচূর্ণ হ'লো শান্ত, সোনালি, সুখদ, বরদ ও শুভদ উনিশ শতক; একটি আস্ত বিশ্বযুদ্ধ যেন পাল্টে দিলো একই সঙ্গে প্রাক্তন ফিজিক্স আর ফিলসফি।

আকাশ-পাতাল তোলপাড়ার মধ্য দিয়ে এক নূতন ভুবন জেগে উঠবে :— এইমতো ধারণা আলো হ'য়ে ছিলো সব ভালো মানুষের মনে; কিন্তু বিশ্বব্যাপী এইসব স্বপ্ন-রঙা সুধী-চিত্ত মারাত্মক ভুল বুঝে এক সময় খাঁচার ভিতরে চমক উঠলো, উদ্যোগের ময়ূরপঙ্খী গতি হারালো বাস্তবের পঙ্ককুণ্ডে এসে; এই বঙ্গভূমিতেও প্রতিশ্রুত বিপ্লব চিন্ময় মেরুদণ্ড ভেঙে ফিরে এলো। অর্থনৈতিক মায়াদণ্ড পৃথিবী ভ্রমণে বেরোলো :—ক্ষুধা ও আশরফির কিমাকার দ্বৈতনৃত্য; 'বুম' যেন ক্ষুৎকাতর মানুষেরই স্বপ্নের ফানুশ, স্বপ্ন তবু সত্যও বটে : মুদ্রা আর মাংস, উল্লাস আর সম্ভোগ, হিরের ঝড় আর খুশির চীৎকার, 'কাল ছিলো ডাল খালি, আজ গেলো ফুলে ভ'রে।'

তখন কে জানতো ঐ আলো মৃত্যুর আগে মুমূর্ষুর শেষ জ্ব'লে ওঠা। শেআরমার্কেট আছড়ে প'ড়ে শতচূর্ণ হ'য়ে গেলো, হাজার বাতির ঝাড়লণ্ঠন গেলো এক ফুঁয়ে তমসায় তলিয়ে, দেখা দিলো 'গ্রেট ক্র্যাশ' তথা নিরাবলম্ব শনির সময়। সদাগর, স্বৈরাচারী আর একনায়কের একচ্ছত্র শাসনের তলায় হিরের ভিতরকার বিষের মতো লুকিয়ে ছিলো দারুণ যে-সংকট, এবার তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূর্তি ধ'রে বেরিয়ে এলো; এসে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যার ভিৎ ফাটিয়ে দিয়েছিলো, সেই দ্বিধাটলোমলো বিশ্বাসের মাটি দিলে একেবারে

সরিয়ে ; 'ধর্ম' নামক বিশ্বাসের যে-দুর্গে অন্তিম এতোকাল ছিলো মানুষের আশ্রয়, তাও ধ্বংসে পড়লো ; প্রাক্তন পৃথিবীর যাবতীয় তরু ও প্রদীপ ও জল ছেড়ে দিয়ে অন্য এক পাতাশূন্য গাছ ও বিমর্ষ আলো ও ঘোলা ডোবার শোচনীয়তায় এসে উপস্থিত হ'লো এই গ্রহের মানুষ।

যেহেতু কোনো লেখকই সময়সীমা ও দেশপরিধির বাইরের অধিবাসী নন, অতএব স্বভাবতই তাঁর উপর কালের শাসন পড়ে থাকে। অন্যান্য দেশের মতো, বাংলাভূমির কবি-কথকদের উপরেও এই সময়শাসন লক্ষ্য করা যায় স্বাভাবিকভাবেই। বিশ-শতকীয় বাংলা কাব্যের তিন প্রধান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ—উপর্যুক্ত সময়কে ছুঁয়ে আছেন, ঐ যুগের স্বাক্ষরও আছে তাঁদের রচনাধারায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত[১] ছিলেন 'বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী,' 'জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে' বেড়ে উঠেছেন, 'বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি' দেখেই হয়তো তাঁর হাত থেকে আস্তে-আস্তে ঝ'রে পড়েছে 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস'। অবশ্য, একথা কখনোই বলা যাবে না যে, এই কবি নিছক সময়ের দান। কোনো শিল্পীই তা হ'তে পারেন না—তাঁর সমকালে অন্য যে-সব কবি কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর মানস ও কবিতার ব্যবধানই তাহ'লে সম্ভব হ'তো না। কবির রচনাধারায় সময়ের ছাপ স্পষ্ট, তত্রাচ একথা কখনোই বলা যায় না সময়ই কবিতার ছাঁচ গ'ড়ে তোলে। বস্তুত কোনো-এক অলৌকিক, অচেনা আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপই কবিতার জন্মদাত্রী।

বাংলা কাব্যে নৈরাশ্যবাদ

কবির বাল্যবেলা কেটেছে যুদ্ধের নান্দীরোলের ভিতর, দেশে ও বিদেশে এক প্রবল ঝটিকা যখন পণ ক'রে বসেছে সনাতন মানবচিত্তকে সে বিদীর্ণ করবেই। কিন্তু কেবলমাত্র বহির্জগতের সাধ্য নেই কবির কাব্য নিরূপণের। তাহ'লে তাঁরই সমকালীন বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশ কিভাবে কালো সময়প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন? বুদ্ধদেবের নির্দ্বন্দ্ব নন্দনসর্বস্ব স্নিগ্ধতা, অমিয় চক্রবর্তীর ঈষদবিদীর্ণ আধ্যাত্মিকতা ও বিষ্ণু দে-র উদ্বেল বিশ্বাস কিভাবে সম্ভব হ'লো? একমাত্র জীবনানন্দ দাশের সঙ্গেই তাঁর মনোজগতের কিছু ঐক্য দ্রষ্টব্য: জীবনানন্দ

সারাজীবন ক্লান্তির কথা বলেছেন। তারই ফলে ধরা দিতে চেয়েছেন 'স্বপ্নের হাতে'; সুধীন্দ্রনাথের মতোই মৃত্যু কামনা করেছেন, অবশ্য জীবনানন্দ শেষপর্যন্ত 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' এরকম আশাই রেখে গেছেন। সুধীন্দ্রনাথের এই নিখিলনিবিড় নৈরাশ্যের পিছনে কারণ ছিলো একাধিক: ঐ শনিতে-পাওয়া সময়, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আর সর্বোপরি তাঁর কবিহৃদয়ের উন্মুখিতা—সত্যিকার অন্তঃপ্রেরণা না-থাকলে ঐ নিরাশাকে তিনি আজীবন আগলে রাখতে পারতেন না। তত্রাচ, কোনো কবিই স্বয়ম্ভূ নন, প্রথমত কোনো কবিকে যতোই অভিনব লাগুক একটু মনোযোগ দিলেই তাঁর পিছনে অন্তত কিছুকালের রচিত ইতিহাস দেখা যাবে। অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথই এই নৈরাশ্যের প্রথম শিকার নন, এবং তা নিতান্তই বিদেশবাহিতও নয়: এই স্বদেশেই, তাঁর পূর্বে ও সমকালে, অন্তত কোনো-কোনো কবি, অন্তত কোনো-কোনো সময়ে এই নৈরাশ্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরিপূর্ণ আশাবাদী ছিলেন—এ কথা মানতে আমি প্রস্তুত নই। সত্য, ঊনিশ শতকী উজ্জীবনের দিনে তাঁর জন্ম, এবং তাঁর রচনাতেও প্রচুর উজ্জ্বল সাক্ষ্য আছে তার; তবু তাঁর মনোজগৎ যেখানে বিদীর্ণ, সেখানে তিনি বিশ শতকী নাগরিক, আমাদেরই একজন, এবং তাঁর বিদ্রোহ যদি অধিকতর অন্তর্ময় ও 'সাহিত্যিক' হ'তো, তাহ'লে তিনি নিরন্তর যে-অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিলেন, যে-'আশার ছলনে' পতিত হয়েছিলেন, তা দুরতিক্রম্য ও নৈরাশ্য-নিবিড় হ'তো সন্দেহাতীতভাবে। মাইকেলের কোনো প্রতিভাবান অনুসারক বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি—হেম-নবীন কায়কোবাদ শুধুমাত্র প্রতারক বাহিরঙ্গের ছদ্মবেশে ম'জেছিলেন—তা নাহ'লে তাঁর অজাত সন্তানের ভিতরে উপর্যুক্ত মনোভাব প্রকাশ পেতে পারতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরাট প্রভাবই হয়তো সে-পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছিলো; এবং তাই, যতোদিনে সূর্যাস্ত হ'লো তারপরে মাইকেলের ঐ আভ্যন্তরীণ প্রভাব আধুনিক পোশাকে মুড়ে এসে সুধীন্দ্রনাথে ফ'লে উঠলো।

বস্তুত, উক্ত লুক্কায়িত নৈরাশ্য বাদ দিলে, বাংলাভূমির সমগ্র ঊনিশ-শতকী সাহিত্য শতবিচিত্র মঙ্গলের প্রসঙ্গে উন্মুখর। রবীন্দ্রনাথ, কিন্নরকণ্ঠ, এসে ঐ কল্যাণের মন্ত্র—একান্ত বাংলাভূমির কল্যাণের মন্ত্র ছড়িয়ে দিলেন বিশ্ব-

সংসারে। পৃথিবীকে তিনি ভালবাসেন, এই একটি কথাই কতোবার কতো-ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বললেন, আশি বছর ধ'রে বললেন বারবার 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই', ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তিতে এক-জীবনে শুধু ভালোবাসা তাঁকে রোজ-রোজ জন্ম দিয়ে গেলো। শুধু কল্যাণ-মঙ্গল-ভালো, শুধু সুখদ ভাবনার অত্যধিক প্রজননেও ক্লান্তি তাঁকে পেড়ে ফেলতে পারলো না। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুখের বিষয়, আমার পূর্বোক্তিই অসাধ্য হ'তো এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মহত্ত্ব লাভ করতে পারতেন না, যদি-না তিনি উত্তর-জীবনে হঠাৎ—প্রায়-হঠাৎ জীবনের অন্য-একটি দিক সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে উঠতেন: চিত্রপর্যায়; "সে", "খাপছাড়া' ও "গল্পসল্প" ছোটোদের উদ্দিষ্ট এই তিনটি গ্রন্থ; 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি; "মালঞ্চ" ও "চার অধ্যায়" উপন্যাস; 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ; একেবারে শেষ জীবনের কোনো-কোনো কবিতা। উনিশ-শতকী বাস্তবতা ও সৌন্দর্যধ্যান থেকে মধ্য-বিশ শতকের অবচেতনা পর্যন্ত তাঁর মহাকবির হাত প্রসারিত হ'লো অন্ত জীবনের নিরর্থ-সুন্দর কাটাকুটিতে কি দুঃস্বপ্নপ্রতিম চিত্রপারম্পর্যে: চাঁদ, গোলাপ ও নারীর মুখের কবি এক ভীষণ সুন্দর ভূতলবাসের ইতিকথা রচনা ক'রে দিলেন—যা দেখলে আমা[illegible] রক্তের ভিতরে ভয় করে।—তবে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনিও মানুষ, প্রা[illegible] চাপা দিয়ে রেখেছিলেন নিজের একটি অংশ, যা, মৃত্যুর কয়েক বছর অ[illegible] হঠাৎ বেরিয়ে এলো নিগূঢ় ভিতর থেকে? 'ল্যাবরেটরি' ও "চার অধ্যায়"-এর কোনো কোনো অংশ যৌনতায় আরক্ত হ'য়ে উঠলো। "সে", "খাপছাড়া" ও "গল্পসল্পে" মহাকবির সমুদ্রপ্লাবী করুণা মুখ ফিরিয়ে থাকলো, আদর্শ রোষে ও পবিত্র ঘৃণায় তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো তাঁর রচনা, দেখলেন: 'সিভিলাইজেশনের / সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের,' এমনকি এমন কথাও তাঁর মনে হ'লো, 'মানুষকে ভুল ক'রে গড়েছেন বিধাতা।' এইসব রচনার জন্য তাঁর অন্তর্জীবন যেমন, তেমনি তাঁর সমকালও সমানভাবে দায়ী। একদিন দেখেছিলেন 'জগৎ-পারাপারের তীরে ছেলেরা করে খেলা', তারা-যে কী সর্বনেশে সন্তান এতোদিনে বুঝতে পারলেন যেন। তাঁর পক্ষে আশ্চর্য—বাংলা সাহিত্যের পক্ষে আশ্চর্য "মালঞ্চ" উপন্যাস রচনা করলেন, রৈবিক মালঞ্চে বুঝি বিষপুষ্প ফুটে উঠতে চাচ্ছে তখন—নির্মম ঐ গ্রন্থ, দয়াহীন তার কুশীলবেরা: আদিত্য, নীরজা, সরলা সকলেই তাই, তার উপসংহার ক্ষমাহীন:

হঠাৎ ঢিলে শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। অদ্ভুত গলায় বললে, "পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" ব'লেই প'ড়ে গেল মেঝের উপর।

এই মনই ভীষণ রেগে উঠেছে 'সভ্যতার সংকট' নামক বহ্নিমান প্রবন্ধে :

জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে-বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হ'য়ে গেল।

কোনো-কোনো কবিতায় 'কণ্ঠের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত' উঠেছে ঘুলিয়ে, দেখলেন ঈশ্বরের সৃষ্টিপথ আকীর্ণ হ'য়ে রয়েছে বিচিত্র ছলনাজালে :

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

[১১ সংখ্যক কবিতা, শেষ লেখা]

রবীন্দ্রনাথের সমকালে যে-কজন কবি তাঁর সর্বগ্রাস থেকে নিজেদের কোনো-রকমে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন : নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। স্মরণীয়, তিরিশের কবিরা প্রথমাবস্থায় এইসব বিধর্মীদের শরণ নিয়েছিলেন। নজরুল বলীয়ান যৌবনের, মোহিতলাল তীব্র দেহবাদের ও যতীন্দ্রনাথ তিক্ত দুঃখবাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কোনো দিক থেকেই মিল নেই এবং শেষোক্তের তুলনায় প্রথমজন অনেক অগভীর। তত্রাচ,

যতীন্দ্রনাথের নাম এ কারণে উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই প্রথম স্পষ্টভাবে তির্যকভাবে মানবজীবনের দুঃসহ নৈরাশ্যের কথা বলেন—অবশ্য তা জীবনের উপরিস্তরের, বাস্তবতার ; তাঁর কাব্যগ্রন্থ "মরীচিকা", "মরুমায়া" ইত্যাদি নামের মধ্যেই তাঁর 'জীবন-দর্শন' বিম্বিত।

তিরিশের শ্রেষ্ঠ কবি ও বাংলা কাব্যেতিহাসের অন্যতম প্রধান, জীবনানন্দ দাশও[২] অফুরান নৈরাশ্যের অধিগত হয়েছিলেন. তার চিহ্ন ছড়ানো আছে তাঁর প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থের অন্তরে ; হয়তো সেজন্যেই তিনি বাংলাদেশের নামে এমন এক অসম্ভব দেশে বাস ক'রে গেছেন যা মানচিত্রে অদৃশ্য। অবশ্য কোনো কবিই মানচিত্রের জগতে অবস্থান করেন না, তাঁরা মনোজগতের অধিবাসী। যে-সর্বাত্মক বিনষ্টির অমর গল্প বেদনাময় রেখায় ধরা পড়েছে তাঁর সূক্ষ্ম তুলির আখরে, যে-মৃত্যুচৈতন্যে তিনি সারাজীবন ক্ষ'য়ে গেছেন ভিতরে-ভিতরে, অবিরল যে-ক্লান্তির কথা বলেছেন—তারাই সমবেত হ'য়ে এসে সাক্ষ্য দিয়ে যায় যে তিনি একালেরই পতিত বাশিন্দা।

২

আমি মনে করিঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একালের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিনিধি ; দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়, তথা অর্ধ-বিংশ শতক, একজন বাঙালি কবির উপর কী নিরীশ্বর, অবিশ্বাসী, অপ্রেমের শরীর ও মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো তাঁর ছয়টি (অনুবাদ কাব্য "প্রতিধ্বনি" বাদ দিয়ে) পরিপূরক কাব্যগ্রন্থে তার নগ্ন, তুঙ্গ ও মারাত্মক প্রকাশ। আমি বলতে চাচ্ছিঃ এই কবির ভিতর ভূগোলব্যাপ্ত বিষাদ ও নৈরাশ্য পরিপূর্ণ আকৃতি পেয়েছে, আচ্ছাভাবে তাঁকে কামড়ে ধরেছে মরীয়া সমকাল, তাঁর সমকালীন আর-সব বাঙালি কবির চেয়ে বেশি ক'রে, আর সেটাই সুধীন্দ্রীয় প্রতিকৃতি। প্রথম কাব্য "তন্বী" অতিরাবীন্দ্রিক, তবু সেখানেই তাঁর ভবিষ্যৎ চারিত্র্যের ধ্বনি আসন্ন প্রসঙ্গ, প্রকরণ ও বিন্যাসে। প্রথম কাব্য হ'লেও এটি অভিজ্ঞতার পরিণতিপর্বে লেখা (সার্থকতার কথা বলছি না) ; স্মৃতি-ভরা ; 'মৃত প্রেম', 'ভ্রষ্ট লগ্ন' ইত্যাদি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যেই 'নিরাশা-নিবিড়' 'ভবিতব্যভারাতুর' ধ্বনি কোথাও-কোথাও ঝলক দিচ্ছে সুধীন্দ্র-নাথের উচ্চারণেঃ

> ১. অনিত্যা মৃন্ময়ী অম্বা, তবু তার রূপমরীচিকা
> নিশ্চল অমিত শূন্য মরুভূমিমাঝে
> অস্তিম স্বপ্নসম দিশাহারা নয়নে বিরাজে॥
>
> [নামকবিতা, তন্বী]

২. আমিই একেলা শুধু অতন্দ্রার শয়নীয়ে শুয়ে,
ক্লান্ত শির থুয়ে
ব্যর্থতাকণ্টকক্লিষ্ট তপ্ত উপাধানে,
চেয়ে আছি শূন্যতার পানে।

['অতন্দ্রায়', ঐ]

৩. নেমে আসে নিমীল নয়নে
জগৎ-দলন শিলা অবসন্ন অশান্ত তন্দ্রার
নৈরাশনিবিড় হ'ল অখিল অনঙ্গ অন্ধকার ॥

['অন্ধকার', ঐ]

৪. কুটিল সংহত আঁধা ব্যাপ্ত দিশে দিশে,
পলে পলে, তিলে তিলে, ধূলিবৎ করি, মোরে পিষে।
... ...
অতীতের সুখস্মৃতি, কেবল-কঙ্কালসার লুব্ধ মরীচিকা,
অনুতাপ পরিতাপ প্রবঞ্চনা ক্রূর বিভীষিকা।

['নিকষ', ঐ]

"অর্কেস্ট্রা" ফুটে বেরোলো সম্পূর্ণ দীপ্তি, সৌগন্ধ্য ও ঝংকারে; "তন্বী"র রবীন্দ্রানুসরণকে প্রায় স্পষ্টভাবে বিদায় দিলেন "অর্কেস্ট্রা"র প্রথম কবিতা 'হৈমন্তী'তেই : 'বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার/আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।' "অর্কেস্ট্রা"র পাতায়-পাতায় ঝ'রে পড়তে দেখি এক তীব্র, ধাতব ও জ্বলন্ত স্মৃতি, নৈরাশ্য এখানে নিবিড় ও পরিপক্ব হ'লো কুশল প্রেমের অবলম্বনে :

১. সে-শুদ্ধ চৈতন্য, হায়, বৃথা তর্কে আজি দিশাহারা
বন্ধ্য স্পর্শে পরিণত স্বপ্নপ্রসূ সে-গাঢ় চুম্বন ;
ভ্রাম্যমাণ আলেয়ারে ভেবেছিল বুঝি ধ্রুবতারা,
অকূল পাথারে তাই মগ্নতরী আমার যৌবন।

['অপচয়', অর্কেস্ট্রা]

২. পুনর্মিলনের আশা ? সে কেবল প্রেমার্ত কল্পনা ;
সপ্তসিন্ধুপরপারে, অদর্শনে আমার বসতি ;
দুর্বল বুভুক্ষু দেহ ; প্রতিশ্রুতি দয়ার্দ্র বঞ্চনা :
বসন্ত বার্ষিক পান্থ ; ফাল্গুনী সুলভ হেথা, সতী।

['পণ্ডশ্রম', ঐ]

৩. অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসংগত চির প্রেম : সংবরণ অসাধ্য, অন্যায় ;
... ...

আশা আজি প্রবঞ্চনা ; দিব না স্মারক অঙ্গুরীয় ;
ব্যবধি ব্যাপক জেনে অঙ্গীকার নির্বোধ বিদ্রূপ ॥

['মহাসত্য', ঐ]

৪ তোমারে ভুলিব আমি, তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয় ;
মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব ;
হরিবে অসংখ্য অলি যৌবনের অমৃতসঞ্চয় ;
সর্বস্বান্ত মর্মে শুধু প'ড়ে রবে অবেদ্য অভাব ॥

['ভবিতব্য', ঐ]

৫. মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাথী ॥

['অর্কেস্ট্রা' ঐ]

"অর্কেস্ট্রা"য় ছিলো প্রেমের বিভিন্ন সিঁড়ি, "ক্রন্দসী"তে এসে কবি জীবনের শতবিচিত্র রূপে ছড়িয়ে দিলেন নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, কিন্তু ঐসব লোকায়ত ও লোকোত্তর সকলের উপরেই ঝুলে আছে এক ও অনন্য কৃষ্ণপক্ষ ঃ

১. কোথায় লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে ।

['উটপাখী', ক্রন্দসী]

২. কপোলকল্পনা ত্যাগ ; নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন ;
অনন্তপ্রস্থ ন মিথ্যা ; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা ;
বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই ; মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা ;
সৃষ্টির রহস্যমাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন ।

['সৃষ্টিরহস্য', ঐ]

৩. নাস্তিগর্ভ প্রাক্তন তিমিরে
আমার স্বতন্ত্র সত্তা হতে থাকে ক্রমাগত ক্ষয় ;

['লঘিমা', ঐ]

৪. অমের জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ ।
অতএব পরিত্রাণ নাই ।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে ।

['নরক', ঐ]

৫. মৃত্যুর সৈকতে
মহত্ত্ব কল্পনামাত্র। বল্মীকের সাম্যময় স্তূপে
নির্লিপ্ত, নির্বাণ, শান্তি কেবলই স্বপন।

['মৃত্যু', ঐ]

'উত্তরফাল্গুনী' থেকেও তাঁর নৈরাশ্যের পরিধি রচনা করা যেতে পারে :

১ তার পরে হাওয়া ওঠে, শুকতারা হঠাৎ হারায়,
দুঃস্বপ্নের বিপর্যয়ে নিশি জাগে শুধু অন্ধ হানি।

['শর্বরী', উত্তরফাল্গুনী]

২. কিছুই হয়নি আজ। তবু জাগে কী শোক মরমে ;
অনাথ সাধ্বীর মতো ধরা যেন ধায় অধঃপাতে ;
নিহত সুন্দর শিব অনুচর পিশাচের হাতে ;
অরাজক চরাচরে উচ্ছৃঙ্খল বিভীষিকা ভ্রমে।
মনে হয় একা আমি।—পরিত্যক্ত ভিটার জঞ্জালে
পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে।

['অহৈতুকী', ঐ]

৩ সুপ্তিশান্ত গৃহদ্বারে হানা দেয় বিনিদ্র নগর ;
সচকিত নিঃসঙ্গতা বাহুপাশে হরে মোর শ্বাস ;
মন্থর কালের স্রোতে স্তূপীকৃত হয় সর্বনাশ ;
মোদের বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুপম ব্যবধি দুস্তর।

['জাগরণ', ঐ]

৪. মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে :
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় [illegible]ত্য বিয়োগের পথে ;

['দ্বন্দ্ব', ঐ]

"সংবর্ত" কাব্যেও তাঁর আজীবন সঙ্গীর অবতারণা :

১. অপমৃত ভগবান, অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার ;
অরাজক চরাচরে প্রত্ন প্রতিহিংসার প্রতুল :
অতিদৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল,
তাই সে আত্মহা আজ, তার ধর্ম আত্মীয়সংহার।

['জাতক (১)', সংবর্ত]

২. নির্বাণ নভে গৃধ্নু রাহুর গ্রাস ;
তুমি অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে :
কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে ?

['১৯৪৫', ঐ]

"দশমী" কাব্যেও ঐ নৈরাশ্যের আবহ প্রমাণ করে তিনি শেষপর্যন্ত প্রথম কদম ফুলের কাছেই তথা 'পাঁকের কাছে গচ্ছিত' ছিলেন ঃ

> ১. অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই ঃ
> অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই ;
> বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
>
> ['প্রতীক্ষা', দশমী]

> ২. নৌকা অচল, মাঝি
> বিকল, সম্প্রতি তাই ধ্যানে দিগ্বিজয়ী সে, আজ অভিজ্ঞানে
> স্বয়ংবরের মাল্য পরায় শকুন্তলা তাকে ; কিংবা চাকে
> ক্রন্দসী সংবর্তে আবার, ফুরায় কলি আদিম অন্ধকারে,
> আগামীকাল বিষাবশেষ ক্ষিপ্ত পারাবারে ভেসে ওঠে।
> তাকিয়ে থাকে পঙ্গু নাবিক : ভুষণ্ডী কাক রক্তপঙ্ক খোঁটে।
>
> ['প্রত্যুত্তর', দশমী]

প্রথম কাব্য থেকে শেষ কাব্য পর্যন্ত এই নারকীয় মনোভাব সুধীন্দ্রীয় কাব্যে ক্রমাগত ঘুরছে, টান ক'রে রেখেছে একই মানদণ্ড—এটা আমরা পরিচ্ছন্নভাবে দেখতে পাচ্ছি। বাংলা কাব্যের নৈরাশ্যবাদ পাতাল প্রবেশ করেছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে ; তিনি নৈরাশ্যবাদের আত্মার সন্তান।

স্বদেশ দীপক

কোনো লেখকই সম্পূর্ণ মৌলিক বা স্বতন্ত্র নন, কেননা সাহিত্যের অঙ্গনে স্বয়ম্ভূর স্থান নেই। বাংলা ভূমিতে উত্তররৈবিক কাব্যবিলোড়নও স্বভাবের নিয়মেই সম্পূর্ণ নূতন নয়, আক্ষরিক অর্থে সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ অভিনব নয়। বস্তুত 'অভিনব' বিশেষণটি আর যেখানেই মানাক, সাহিত্যিককে সাজে না। তাই অভিনিবেশ দিলে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যকৃতির পশ্চাতেও দেখা যায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সব মহাজন—এক ঐতিহ্য—এক উদ্যমের ধারার উত্তর-সাধক তিনি। অন্ততপক্ষে, বাংলাদেশের তিনজন কবির ঠাণ্ডা উপস্থিতি তিনি তাঁর কাব্যে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মোহিতলাল মজুমদার। সত্য, মাইকেল যেখানে উনিশ-শতকী মনোপ্রসাদে ধনী, যেখানে তাঁর কবিতা বর্ণনাপ্রচুর, যেখানে তিনি মহাকবির চারিত্র্যে বিশেষিত,—সেখানে এই শতকের সুধীন্দ্রনাথ অন্তর্বিপ্লবের স্বর্গ ও নরকের যাতায়াতে বিক্ষত, অগ্রজের অটল বিশ্বাস লুপ্তিবরণ করেছে তাঁর মন থেকে, সময়স্বভাবের প্রভাবে তাঁর কবিতায় ব্যঞ্জনাবীথি ছড়ানো এবং

ভবঘুরে গীতিকবিতার স্বপ্নদ্রষ্টা। তত্রাচ, এই দুই দত্তঙ্গ কবিতে কিছু ঐক্য চোখে পড়ে ; বহিরঙ্গ সাযুজ্য : কঠিন, সংবৃত, সংস্কৃত শব্দব্যবহারে, যত্নকৃত যতিচিহ্নের উপস্থাপনে ও গঠনের নিবিড় জ্যামিতিতে ; আর গভীরতর অন্তরঙ্গ মিল এইখানে : দুজনই আত্মতা‍ মানসিক জর্জরিত দ্বৈরথ সমরে দুই বিক্ষুব্ধ সন্তান, এক দারুণ অপ্রতিকার্য নিয়তিচৈতন্যের পুত্র ;—ব্যক্তি-জীবনে মস্ত পার্থক্য আছে কিন্তু মনোজীবনে বুঝি সন্দেহ আর সংরাগে অনন্য : সুধীন্দ্রনাথ, আধুনিক কুশল মানুষের মতোই, ভদ্রলোকিত্বের ইস্ত্রি-করা পোশাকের তলায় প্রাণপণে ঢেকে রেখেছিলেন অন্তর্জগতকে—পশুশালাকে, যার দরোজা খুলে দিলেই হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে আসতো রবীন্দ্রনাথের ছবি—যেখানে সন্দেহ, অসুখ, বিবেক, অপ্রেম, চীৎকার, স্মৃতিকষ্ট, আর সর্বোপরি লোকোত্তর তাড়না, যার দেহ থেকে ঈশ্বরকে কিছুতেই উচ্ছিন্ন করা যায় না, থেকে যান তিনি, হায়, থেকে যান তিনি চৈতন্যের অলিগলির বিপদআপদে। ফলত মাইকেলের 'প্রাক্তন'ই সুধীন্দ্রনাথে গুরুতর 'ভবিতব্য' হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত ধারণা ব্যক্ত করি : মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথের বংশ বাংলাদেশে কোনোদিন একেবারে লোপ পাবে না, কথ্যভাষার একক জয়যাত্রার দিনেও না, ফিরে-ফিরে দেখা দেবে ; কেননা এই দুজন এমন একটি প্রসঙ্গের কোলে নিজেদের স্থাপন করেছেন, যেখানে কোনো-কোনো সত্যসন্ধিৎসুকে কালে-কালে আসতে হয়, কেননা তা মানবের গভীরতর নীলাভ শীতল অভিজ্ঞা-নেরই অবশ্যঅংশ।

আর সুধীন্দ্রনাথ তো রবীন্দ্রনাথের যুগের মানুষ ; আরো, একরকম রবীন্দ্রচ্ছায়ায় লালিত ; রবিশস্যে তাঁর অধিকার খুব স্বাভাবিক। তাঁর কাব্যপ্রথমার রবীন্দ্রানুসরণ শেষপর্যন্ত অবশ্য টেকেনি, এটা সুখেরই বিষয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মেজাজকে ব্যবহার না করলে উপায় ছিলো না তাঁর—বাংলাদেশের উত্তররৈবিক সকল কবিকেই তা করতে হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ, সর্বগ্রাসী কবি, তো শুধু খেয়ালি অতিপ্রজ রচনারই জনক নন, তিনি ক্লাসিক গঠনেরও অধিকারী বটে : অন্তত স্তবকগঠনে ও ছন্দোরক্ষায় রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্বেচ্ছাচারিতা করেননি, শুধু অপার-অবার স্বাধীনতাই মেনে নিয়েছিলেন ;—হ্যাঁ, 'স্বাধীনতা', অর্থাৎ শুধু নিজের অধীনতা, এবং যে নিজের অধীন নয়, স্বায়ত্তশাসক নয়, তার

কাব্যচর্চা পণ্ডশ্রমমাত্র। আরো: সুধীন্দ্রনাথ গঠনে ও মনোভাবে ক্লাসিক ঐতিহ্যেরই সাম্প্রতিক উত্তরাধিকারী বটে, তবু রোমান্টিক উজ্জীবন তাঁর মধ্যে স্বতঃপ্রকাশ, কেননা একালে বোধহয় অকৃত্রিম ধ্রুপদের শরীর ও মাত্রার সাধনা অসম্ভব; সারাজীবন যে-ব্যক্তিগত তমসা ও আভার উচ্চারণ ও চীৎকার তাঁর কাব্যে তাও রোমান্টিকতারই বংশলক্ষণ।

অব্যবহিত অগ্রজ, এবং তিরিশের কবিরা যে-তিনজন কবির ভিতরে প্রথম উন্মীলিত হয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিলো যাঁরা আশু বিধর্মের পারে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদেরই অন্যতম মোহিতলাল মজুমদারের কিছু পরোক্ষ প্রভাব আছে কবির উপর—ক্ষীণ ও পরোক্ষ। শব্দব্যবহারে, বাক্যগঠনে, বুদ্ধিবাদে, দেহধর্মিতায় ও কাব্য-দর্শনের স্বরূপের আরোপে কবির উপর মোহিত-লালের প্রভাব—প্রভাব না-ব'লে মিল বলাই উচিত—কিছু আছে। অবশ্য, কবির বুদ্ধিবাদ, দেহধর্ম ও কাব্য-দর্শনের স্বরূপের আরোপ মোহিতলাল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; মোহিতলালের অর্থে তিনি কোনোদিন দেহবাদী ছিলেন না, গভীরতর ভাবে তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক: হয়তো 'বৈনাশিক কালে'র দুই কালো হাত থেকে সাময়িক উদ্ধার পাবার জন্য শান্তি ও মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন দেহের আশ্রয়ে; মোহিতলালের দেহধর্মে আস্থা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াজাত, আর কবির যেহেতু কাল বা স্মৃতি কি ঈশ্বর বা প্রেম কেউ ক্ষমা করে না, তাই দেহের সীমানা মেনে চলা, কিন্তু তাও তিনি কোনোদিন পারেননি: আরো লক্ষণীয়, তিনি প্রায় কোনো সময়েই বর্তমান কালের ভোগবাসনার কথা বলেন না, যখনই তিনি দেহসম্ভোগের কথা বলেন তা স্মৃতির ভিতর দিয়ে রচিত এবং তাও অনুতাপের দুর্মর পাহারায় —মোহিতলালের মতো মোটে বলীয়ান ও উদ্ধত নয়।[৩]

হে বিদেশি ফুল

ছিলেন তিনি স্তেফান মালার্মে-র ভীষণ ভক্ত ও অনুরাগী; কিন্তু শুধু মালার্মে নন, তাঁর দুই স্বনামধন্য শিষ্য পোল ভালেরি ও কবি-ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত—এই তিন মহাজনকে মিশিয়ে যেন তিনি নিজকে অটুটভাবে গ'ড়ে তুলেছিলেন, এবং উপর্যুক্ত ত্রয়ীকে হ্যাঁ ও না-এর তুলাদণ্ডে চড়িয়ে দিলে না-এর দিকের পাল্লাই যে বেশি ভারি হবে, তাও সন্দেহাতীত।

রূপদগঠন ফরাশি কবিতার প্রতি তাঁর ঝোঁক ও আকর্ষণ স্বাভাবিক ব'লেই মনে হয়। আর টমাস স্টর্ন্‌স্‌ এলিঅট-এর 'পোড়োজমি' তার বিশ্বগ্রাস ক্ষুধা নিয়ে, সমকালীন পৃথিবীর বহু কবিকেই অধিগত করেছিলো, তার প্রভাবের কথা তো উল্লেখ না করলেও চলে।

বোঝবার সুবিধায় আমরা শুধু কোনো লেখকের সঙ্গে পূর্ববর্তী ও সমকালীন অন্যান্য লেখকদের ঐক্য ও অনৈক্য খুঁজে ফিরি। সুধীন্দ্রনাথ স্বদেশ-বিদেশের কোন কোন কবির সঙ্গে কাব্যনির্মাণে ও কাব্যভাবনায় যুক্ত, তা বললাম; কিন্তু এইসব কবির আপাত ও লুকোনো প্রভাব ছাড়িয়ে যেখানে তাঁর মৌলিকতা ফ'লে উঠেছে—এবং সে-রকম অংশই তাঁর কাব্যাধারে বেশি—সেখানেই তিনিই স্বতন্ত্র, একাকী ও উত্তরসাধকের বিস্ময়স্থল।

৩

এলিঅট একদা বলেছিলেন, কিছু কবির সমগ্র কবিতা পাঠযোগ্য, আর কিছু কবির সমগ্র রচনাবলি পড়ার দরকার হয় না। প্রসঙ্গে ও বক্তব্যে, বিন্যাসে ও প্রকরণে যে-কবি বার বার নিজেকে অতিক্রম ক'রে এসে নূতন দিগন্তের দরোজা খুলে দিয়েছেন, নিরন্তর বিবর্তনে যিনি পূর্ণাঙ্গ, তাঁরই সমগ্র রচনাবলি দাবি করে পাঠকের অভিনিবেশ, সূচ্যগ্রপরিমাণ দাবি কেউ ছাড়ে না। পক্ষান্তরে, যে-কবি একই ভাবনা-বেদনায় আসীন সারাজীবন, একই প্রকাশভঙ্গির একনিষ্ঠ সেবক, তাঁর রচনার অংশই কাব্যামোদির অপরূপ উত্তেজনার স্বাদ মেটাতে পারে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শেষোক্ত শ্রেণীর কবি: প্রসঙ্গ, প্রকরণ ও বিন্যাস—যার কথাই ভাবি-না কেন, নব-নব গন্তব্যে পৌঁছোনোর উচ্চাশা কবির নেই; নেই রাবীন্দ্রিক শতবিচিত্রতা (হয়তো ঐ আত্মবিলোপকারী কাব্যসময়ে সম্ভবই ছিলো না), একই কথা প্রায় একই ভঙ্গিতে তিনি বিভিন্ন কাব্যকোরাসে বলেছেন,—একই কথা, কিন্তু দ্বিতীয়রহিত, অর্থাৎ সহজীবী কবিদের থেকে একেবারে আলাদা; তাঁর প্রকাশরীতি ও অভিজ্ঞতাপরিধি ছোটো, ছোটো কিন্তু গভীর, আর নিখুঁত, নিটোল, নিজস্ব ও সমস্তসুন্দর। আর তাঁর সমগ্র রচনা এতো কম যে, এলিঅটের উপদেশ ভুলে সমস্তটাই একবারে প'ড়ে ওঠা যায়। তবু তাঁর মধ্যে রূপায়ণের কুশল পরিণতি ও

বক্তব্যের বিবর্তন কিছুমাত্র নেই,—একথা বললে শুধু সত্যের অপলাপ হবে। তাঁর কাব্য তৎকালীন, রবীন্দ্রসমকালীন, আত্মবিলোপকারী, অতিপ্রজ, সুখদ, ললিত, কল্যাণকর, তরলিত, নিরর্থ, নির্বোধ ও সমতল গড্ডলকবিতার বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় ও জরুরি দেয়াল। যদি কেউ বলেন, 'এ তো তিরিশের কবিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য', তাহ'লে তার নূতন উত্তর হবে এই : তিরিশের গরীয়ানতম কবি জীবনানন্দ দাশও, তাঁর শতমুখ নূতনত্ব সত্ত্বেও, বাংলা কাব্যের অতিমাত্র ললিত, সুখদ, রমণীয় কাব্যধারার উত্তরসাধক ; অবশ্যই তিনি চিরাচরিত আবহমান ললিত ধারাকে বর্জন বা লংঘন করেছেন ; কিংবা একথা কি বলা যায় না তিনি এদের আধুনিকতার পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন ? তাদের উপর ঝলমলে শিল্প চাপিয়ে তীরে উত্তীর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিলেও, উল্টোদিক থেকে তাঁর ভাস্বর কবিতাগুচ্ছ কি অধিকতর আবেগের দাস ও অধিকতর কল্পনার সোনালি ঝড়ের উল্লাসে সজীব, চঞ্চল ও অস্থির হ'য়ে ওঠেনি ? সুধীন্দ্রনাথের কাব্যেও ছড়িয়ে আছে একমুষ্টি স্বপ্ন—কেননা কবিমাত্রই স্বপ্নদ্রষ্টা, আর কবিদৃষ্টি মানেই এমন এক-রকম চাউনি, যা সমস্ত বস্তুর মর্মে গিয়ে বেঁধে—কিন্তু এই কবির স্বপ্নদর্শন সমকালীন ও ঈষদপূর্ববর্তী ললিত ধারাকে হঠিয়ে এতো বেশিরকমে স্বরচিত যে বাংলাদেশের অন্য কোনো কবিকেই তাঁর সঙ্গে খাপে-খাপে আচ্ছাভাবে মেলানো চলে না। ছিলো একদিকে উন্মুখ যুগচৈতন্য, আর অন্যদিকে আত্মঅনুসরণ—যা এক হিশেবে সত্যসন্ধিৎসারই সম্পন্ন, পরাক্রান্ত ও গোপন ইতিহাস, আর ঐ দুই প্রসারিত হাতই তো দুর্বোধ্য দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত : যেখানে রাজনীতি আর আত্মসন্ধান, প্রেম আর মৃত্যুচেতনা, ইন্দ্রিয় আর ভাবনা, ঐকাহিনী আর চিরন্তনী এসে এক করতলে জড়ো হয়। অবশ্য উক্ত সকল প্রসঙ্গই এক স্থানে এসে ফল প্রসব করছে, জটিল গ্রন্থিল ভূগোল এসে প্রবেশ করছে আত্মার ভিতর, যাবতীয় ঘটনাই এঁকেবেঁকে ইন্ধন জোগাচ্ছে আত্মসন্ধানের ; এবং এই আত্মসন্ধান, এই বিশ্লেষণ উন্মোচন নিষ্কাশন, এই দার্শনিকতা বাংলাভূমির ভঙ্গুর রঙ্গিল কাব্যে যেমন অভাবনীয় তেমনি অভিনব।

"তন্বী"

"তন্বী" রবীন্দ্রবৃক্ষের ছায়াতলে ব'সে রচিত ; তবে সুধীন্দ্রনাথের মতো আত্মসচেতন লোকের তা জানতে দেরি হয়নি কাব্যের ঐ 'ভূমিকা' ও

'উৎসর্গ'ই তার উদাহরণ।[৪] রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রসঙ্গে ও প্রকরণে চোখে পড়ে, এবং এর অনেক রচনাই কৈশোরিক। "তন্বী" সম্বন্ধে দু একটি কথা উল্লেখযোগ্য: প্রথমত গ্রন্থটি প্রধানত প্রেমের কাব্য—যদিচ কবির পরবর্তী প্রেমের কবিতার সঙ্গে এর মিল প্রবল নয়; দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি কবিতার সযত্ন স্থাপত্য তখনই লক্ষ্য করা যায়; তৃতীয়ত, পরবর্তী জীবনে কবি যাকে সারাজীবনের জন্যে গ্রহণ করবেন সেই নৈরাশ্যবাদ এর কোনো কোনো কবিতায় তখনই ঝলক দিচ্ছে; চতুর্থত, এটি কবির প্রথম কাব্য হ'লেও মানসিকতায় বেশ পরিণত (এই কাব্য প্রকাশের সাত বছর আগে থেকেই কবির কাব্যচর্চা শুরু);—'পরিণত' কথাটি পরিপক্ক অর্থে ব্যবহার করছি না, প্রেমের উপলব্ধির বয়সের ও সময়ের নিকষে। তাই দেখা যায় তাঁর প্রথম কাব্যই স্মৃতিভারাক্রান্ত ('বাৎসরিক', 'পলাতকা', 'উর্বশী' প্রভৃতি); এবং এই স্মৃতিও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তিক্ত; কিছু কবিতার নামই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ('মৃত প্রেম', 'ভ্রষ্ট লগ্ন' প্রভৃতি)। 'মৃত প্রেম' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করি: ১৯২৬ শালে ঠিক এ ধরনের 'বুদ্ধিমান কবিতা'—এক মোহিতলাল মজুমদার বাদে—হয়তো সম্ভব ছিলো না:

অন্তিমে মোরা আরোহি জীবনকূটে
নিরালোক এক নিরাগ সন্ধ্যাখনে,
দেখিনু মোদের মৃত প্রেম, অযতনে,
ভাঙা পন্থার রাঙা রজোপথে লুটে ॥
এত দিন পরে সহসা সে মুখ ফুটে,
কহিল আমারে ক্রোধ কম্পিত স্বনে,
"তব মুমূর্ষু স্মৃতির সংক্রমণে
মোর প্রাণ কবে ম'রে, ঝ'রে, গেছে টুটে ॥"
আমি বলিলাম, "সে কি কথা, প্রিয় সখী?
তোমারই প্রণয় গেল যবে অমরাতে,
আমার প্রাণের বিনাশাশঙ্কা লখি,
নিল তারে সাথে, সংহারি অপঘাতে ॥"
সে কাঁদিল; আমি কহিলাম, "বেশ তাই,
চলো তবে শবসৎকারে এবে যাই।"

['মৃত প্রেম', তন্বী]

"অর্কেস্ট্রা"

প্রথম কাব্যের ঈষদবিদীর্ণ বিশ্বাস যেমন চূর্ণ হ'লো "অর্কেস্ট্রা"র প্রকাশে, তেমনি জড়লতা ঘুচিয়ে কবির চরিত্রও বিকশিত হ'লো পূর্ণাঙ্গ আকারে,—

এটিই কবির প্রথম বহুলাঙ্গে পরিণত কাব্য। "অর্কেস্ট্রা" প্রেমের তথা বিরহের কাব্য; কিন্তু এই প্রেম ও বিরহের সঙ্গে বাংলা কাব্যের চিরাচরিত ধারার, তৎকালীন রবীন্দ্রসমকালীন কাব্যপ্রবাহের ব্যবধান বিরাট: যেন রবীন্দ্রনাথের সুখদা কল্যাণী শাশ্বতীর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলেন নিজস্ব নায়িকা ক্ষণিকাকে, ক্ষণিক, রঙিন, আধুনিক প্রেমকে:

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার;
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার।
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।।

['হৈমন্তী,' অর্কেস্ট্রা]

এই কাব্যেই প্রথম দেখা দিলো আধুনিক প্রেম, তার বহুস্তর দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মা: ক্ষণিকতা ('হে মোর ক্ষণিকা, তোমার অরূপ স্মৃতি সে নহে শাশ্বত', 'মূর্তিপূজা'), প্রেমের অপ্রিয়-সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও স্পষ্ট কথন ('অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ', 'মহাসত্য') কবি জানেন, তার প্রেমিকাও একদিন চ'লে যাবে অপরের কাছে—সাধারণ লোকেরা হয়তো এই মর্মান্তিক সত্য স্বেচ্ছায় ভুলে থাকে—কিন্তু কবি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং যে-লোক নিজের ভবিষ্যৎ স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, তার মত দুঃখী কেউ নেই; যদি ভুলে থাকা যেতো সংসারের অন্য দশজন লোকের মতো, তাহ'লেই বোধ হয় ছিলো এক মাত্র উজ্জ্বল উদ্ধার, কিন্তু কেউ-কেউ স্বরচিত কষ্ট থেকে কিছুতেই নিজেকে উপড়ে ফেলতে পারে না ব'লেই তো কবি হয়:

ভেবো না, ভেবো না সখী; স্বপ্নদুষ্ট দীর্ঘ রাত্রি-শেষে
বসন্ত অন্তরে তব আরম্ভিবে পুন চতুরালি;
নবীন ফাল্গুনী আসি হানা দিবে রুদ্ধ দ্বারদেশে;
ফলিবে মানসক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে সোনার চৈতালী।।
ক্ষণিক [illegible] নিতি অনায়াস [illegible],
তোমার উরসস্বর্গ বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর;
যে-হস্ত নিবদ্ধ এবে মোর ভুজে প্রাণপণ বলে,
রচিবে বরণমাল্য বারংবার সে-নিষ্কম্প করে।।

['ভবিতব্য,' অর্কেস্ট্রা]

আগেই বলেছি, কবির প্রেয়সী আধুনিকা: সে যেমন পূর্বে ছিলো অন্য কারো প্রেমিকা, তেমনি ভবিষ্যতেও সে অপরের হৃদয়াসনে বিরাজ করবে; শুধু মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে সে ও কবি ভ'রে উঠেছিলো ভালোবাসায়।

'সঞ্চয়', 'সর্বনাশ', 'অর্কেস্ট্রা ৫ ঃ ৩' কবিতায় যেমন আছে প্রিয়তমার অতীতের কথা, তেমনি তার ভবিষ্যতের চিত্র আছে 'ভবিতব্য', 'শাশ্বতী' ইত্যাদি কবিতায়। দেখা যাচ্ছে কবির অতীত অন্ধকার, ভবিষ্যৎ মৃত; —কবি তাঁর প্রেমিকার গতজীবনের বিবরণ শুনলেন, আর অমনি

লুপ্ত হল আধারবিন্দু বিশ্ব হতে;
খিল খসাল নাস্তি পুনবার;
ভাগ্যরবি চলল ছুটে পাতালপথে;
চতুর্দিকে আদিম অন্ধকার।।
একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের 'পরে;
সামনে মরু অস্থি সমাকুল।
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিল আজকে মোরে;
অস্তমিত বিধির আমি ভুল।।

['অর্কেস্ট্রা,' অর্কেস্ট্রা]

প্রেমের বহুস্তর মনোভাবের ফলেই প্রিয়াকে কবির কখনো মনে হয় 'ছলনাময়ী', কখনো 'গর্বান্বিতা' কখনো-বা 'মহাশ্বেতা', আবার কখনো 'প্রলুব্ধ ছায়াময়ী'। কবি-প্রেমিকার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন কোনোটাই কবির পক্ষে সুখের নয়, তবে কি বর্তমানই একমাত্র নিশ্চিত, নির্বোধ ও অপাপবিদ্ধ?— না, তাও নয়; বর্তমানও (স্মৃতির ভিতর দিয়ে) অকপট ভালোবাসায় ভরা নয়ঃ

জানি অলজ্জিত রাতে, শ্লথনীবি, কম্প্র আত্মদানে,
দেয়নি সে মোরে অর্ঘ্য, খুঁজেছিল বসন্তসখাকে।।

['জিজ্ঞাসা', অর্কেস্ট্রা]

এই মর্মান্তিক, রূঢ় ও বদমাশ সত্যকে যিনি জানেন, তিনি দার্শনিক বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে শান্তি দুরাশারই নামান্তর—আমরা তখনই বুঝতে পারি, প্রেমিকা স্বচ্ছন্দচারিণী ব'লেই কবির যন্ত্রণা নয়, সে-যন্ত্রণার উৎস তাঁরই নিজস্বে ধরা পড়ে। আসলে যাঁর চোখ মঞ্জুল প্রতিমা ভেদ ক'রে ভিতরের কাঠ-খড়-আবর্জনা দেখতে পায়, মোহিনী নারীর ভিতরে ত্মাখে শুধু কঙ্কাল, তাঁর মতো অসুখী আর কে আছে?—অসুখী,—হ্যাঁ, তাই, কিন্তু একথাও মানতে হয় যে সত্যের উপরিস্তর তাঁকে আর ভোলাতে পারবে না, তাঁর কবিদৃষ্টির রঞ্জনরশ্মি এক নিরুত্তর সত্যের মর্মে গিয়ে বেঁধে।

প্রেমের দ্বিধাবিরহিত আনন্দ কবি একেবারে পাননি তা নয়, একটি কবিতায় তার উজ্জ্বল মুদ্রণঃ 'মূর্তিপূজা', 'পুনর্জন্ম', 'অনুষঙ্গ', 'মহাশ্বেতা'

প্রভৃতি। এই ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ ফসল 'শাশ্বতী' কবিতাটি: এক কথায় কবিতাটি অনির্বচনীয়, এবং এখানেও যদিচ তাঁর নায়িকা 'আজ আর কারে ভালোবাসে', তত্রাচ 'সে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না', এই পরম উদাত্ত ঘোষণায় প্রেমের বিজয়স্তম্ভ আকাশ স্পর্শ করেছে। এটি সুধীন্দ্রনাথের তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'শাশ্বতী', 'জিজ্ঞাসা', 'অর্কেস্ট্রা' প্রভৃতি এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

"ক্রন্দসী"

কবির মানসিক ভ্রমণের পথ একেবারে সরল নয়—যদিও পাথেয় অনন্য অবিশ্বাস—মানসিক ভ্রমণের পথ গেছে কিছু অন্তর্গত কোণ মোড় বাঁক নিয়ে। "তন্বী"র বিশ্বাস সম্পূর্ণ চূর্ণ হ'লো "অর্কেস্ট্রা"র ঝঙ্কারে, আর তারপরই "ক্রন্দসী"র দিব্য প্রকাশ; —হ্যাঁ, দিব্য প্রকাশ, ("অর্কেস্ট্রা"-ও হয়তো তারই অন্তর্গত, পরস্পরের সম্পূরক পরিপূরক এই বই দুটি একই মনোগ্রন্থের দুই খণ্ড) আবহমান বাংলা সাহিত্যের পক্ষে বড্ড বেশি রকমে নূতন, ভাবনা-বেদনায় অভিনব বলতে দুর্নিবার লোভ হয়, মন ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়: এর আগে এই বঙ্গদেশে কেউ কি অনুভব করেননি কাকে বলে অবিশ্বাস, বোঝেননি প্রেম আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র, মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেননি ঈশ্বর মৃত? শুধু কি বিংশ শতাব্দী, আর তার ভুবনবিস্ফোরক দুই মহাযুদ্ধই দায়ী এর জন্যে, অন্তর্গত দ্বৈরথ সমরের পরপারে 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়' কারো কবিদৃষ্টিতে অভিভূত হ'য়ে ওঠেনি কি? —এইসব সাধারণ, মারাত্মক, স্বাভাবিক ও আরক্তিম জিজ্ঞাসা আমরা না-ক'রে পারি না, কিন্তু একথাও জানি যে তার উত্তর দেবার চেষ্টা আমাদের ক্ষমতাতীত। নিশ্চয় কোনো-কোনো একা, বিপন্ন ও সমাজচ্যুত মানব স্বকীয় ভাবনা-বেদনার ভিতর এই-সবেরই ক্ষীণ, দুঃসহ, আগ্নেয় স্ফুরণ অনুভব ক'রে গেছেন, এইসব দমআঁটকানো সিঁড়িতে উঠে গেছেন একেলা রোমহর্ষে, কিন্তু প্রকাশের এই দুঃসহ, স্পষ্ট ও কুসংস্কারমুক্ত পথ খুলে দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন একা, ভাবীকালের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ, একা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। শুধু "অর্কেস্ট্রা"র উপর এই সম্মান চাপানো একদেশদর্শিতার পরিচায়ক; কেননা ঐ কাব্যের মুখ্য মানদণ্ড প্রেম, এবং প্রেম জীবনের একটি দিক মাত্র। বরং "ক্রন্দসী"র

নাম আরো-বেশি উল্লেখযোগ্য ঃ কেননা এখানেই প্রথম দেখা দিলো শতবিচিত্র জীবনের নিঃসার মণ্ডলপরিক্রমা—এখানেই প্রথম দেখা গেলো 'ধূ ধূ করে মরুভূমি; ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।' আর ঐ মরুভূমিতে ব্যক্তির হৃৎপদ্মের সব আলোক ও নীলিমা নিভে গেলো; প্রেম আত্মপ্রবঞ্চনা, কাল ক্ষুৎকাতর, বিদ্রোহ স্বাতন্ত্র্যরহিত, মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা, ভগবান শুধু রিক্তনাম লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত।

সুধীন্দ্রনাথের নাস্তির দর্শন "অর্কেস্ট্রা"য় ছিলো শুধু প্রেমকে অবলম্বন করে। "ক্রন্দসী"তে বিশ্বসংসারের সকল প্রসঙ্গে চারিয়ে গেলো। প্রথম কবিতা 'উটপাখী'তেই ফুটে বেরোলো অস্তিত্বের সর্বনাশ। 'সন্ধান' কবিতায় যে বললেন, 'আপনারে অহরহ খুঁজি', তাই ছিলো তাঁর আজীবনের অন্বিষ্ট, সারাজীবনের গন্তব্য; —আর এই সন্ধানের তৃতীয় রাস্তা ছেঁকে তুলতে গিয়েই দেখলেন ঃ 'স্বষ্টির রহস্যমাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন।' দেখা গেলো ঃ 'রোমন্থক মহাকাল আপনারে পরিপাক করে।' দেখা গেলো ঃ 'অনন্ত অমৃত তব মায়া, মিথ্যা মায়া/সম্ভবত তার চেয়ে সত্য এই অতীতের ছায়া।' কালচেতনা, ঈশ্বরচেতনা, মৃত্যুচেতনা—সকলেরই জন্মভূমি এই কাব্য, আর সকলেই অনন্য অন্তিম একটি ফল ফলিয়ে তুলছে ঃ নাস্তি। 'কাল', 'লঘিমা', 'ভাগ্যগণনা' ইত্যাদি কবিতায় কালচেতনা স্পষ্ট; মহাকাল এমনকি স্মৃতিকেও ক্ষমা করে না, কবি 'মিছে এ মিনতি' করছেন যাতে কালের হাত থেকে রক্ষা পায় 'সর্বস্বান্ত কৃপণের শেষ সঞ্চয়ন/ওই কটা মূল্যহীন, নিরানন্দ, কণ্টকিত স্মৃতি।' ফলত অনিবার্যভাবে ঃ

নাস্তিগর্ভ প্রাক্তন তিমিরে
আমার স্বতন্ত্র সত্তা হ'তে থাকে ক্রমাগত ক্ষয়,
ফুরায় ইন্দ্রিয়বোধ; মূক হয় বাচাল হৃদয়;
শুধু স্মৃতি জেগে রহে। মহামোনে শুনি অকস্মাৎ
বিনষ্ট বিশ্বের প্রান্তে কোথা যেন কালের প্রপাত
উল্লম্ব রভসে নামে অনন্তের উন্মুদ্র অতলে।
কণিকাও নহি আমি; চরাচর লুপ্ত সে-কল্লোলে।।

['লঘিমা', ক্রন্দসী]

ঈশ্বরচেতনা মূর্ত হ'লো 'প্রশ্ন', 'প্রার্থনা' ইত্যাদি কবিতায় ঃ

ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই?
নেই তুমি যথার্থ কি নেই?

তুমি কি সত্যই
আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন ?

['প্রশ্ন', ঐ]

'অকৃতজ্ঞ', 'মৃত্যু' ইত্যাদি কবিতায় দেখা দিলো মৃত্যু-চেতনা ;

মৃত্যুর সৈকতে
মহত্ত্ব কল্পনা মাত্র। বল্মীকের সাম্যময় স্তূপে
নির্লিপ্তি, নির্বাণ, শান্তি কেবলই স্বপন ॥

['মৃত্যু', ঐ]

জীবনানন্দের মতো সুধীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন, কী একা ও নিঃসঙ্গ আমাদের জীবন ; সাধারণ মানুষের জীবনও তাই, কিন্তু কবি মাত্রেই আরো-একা ; রবীন্দ্রনাথও 'মহা একা' মনে করেছেন নিজেকে, এবং এই অনুভবের মধ্যে এক বিরাট বেদনা ঢেউ তুলে ব'য়ে যায়, সে নৈঃসঙ্গ্য মহাপুরুষের ; আর আধুনিক কবির একাকীত্ব মানে শুধু দ্বৈরথ সমর, শুধু যন্ত্রণার প্রস্রবণ ঃ

১. ভিড়ে মিশে আমি ভেসে যাব একা একা ॥

['জাতিস্মর', ঐ]

২. ভিড়ের সংসর্গ মোরে করে সদা নৈঃসঙ্গ্যব্রত ॥

['প্রতীক,' ঐ]

৩. সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি।

['প্রত্যাখ্যান', ঐ]

৪. আমি একা, আজ আমি একা।

['কাল', ঐ]

প্রেমেও অবিশ্বাস প্রায় স্থায়িত্ব পেয়ে বসেছে যেন ঃ 'অকৃতজ্ঞে'র স্তবক, 'জাতিস্মরে' এই অন্তরঙ্গ জ্ঞান ঃ 'সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে/চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে ।।' একালের নায়ক সিনেমার শেষে আলো জ্ব'লে উঠলে হঠাৎ হয়তো ভিড়ের ভিতরে দেখতে পান সেই সংগোপন চিরন্তনীকে ঃ

সহসা আমার অঙ্গ ভ'রে গেলো দিব্য রোমাঞ্চনে,
ভেসে এল ছিন্ন হ'য়ে উতরোল জনস্রোত হতে
তোমার আননখানি নয়নের পিপাসার সৈকতে,
হে চির অপরিচিতা। একবার তরল কৌতুকে

বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা, অপাঙ্গে তাকায়ে মোর মুখে
তিমিরে মিলালে তুমি দীপান্বিত দেহলী উত্তরি ।।

['সিনেমায়', ঐ]

তারপর ভিড় ঠেলে কবি যখন প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এলেন, তখন ঃ

পরিপূর্ণ রাজপথ মাঝে
উত্তাল ঘূর্ণির মতো শূন্যকেন্দ্র জনতা বিরাজে ;
শুধু তুমি অন্তর্হিত ; ভ্রষ্ট লগ্ন ; সমাপ্ত সুযোগ ।
আবার নিষ্ফল হল আজন্মের বিরাট উদ্যোগ ।।

['সিনেমায়', ঐ]

এই অনির্বচনীয় কবিতাটি একালের প্রেমিকের অন্তরাখ্যান।—এই সমস্ত বহুলাঙ্গ নিঃসারতা চরম ফলে পৌঁছলো বুঝি 'নরক' ও 'প্রার্থনা' কবিতায়, বোধে, ইন্দ্রিয়ে ও চেতনায় উপর্যুপরি আঘাত করছিলো যে-শূন্যকেন্দ্রিক জীবন 'নরক' কবিতাটি বুঝি তারই তীব্র, অন্তঃশীল ও নিরুপম দলিল, আর দেরি না-ক'রে কুয়াশা ও অর্ধ-আলোকের মধ্যে অভিজ্ঞতা লুকিয়ে না-রেখে স্পষ্ট ব'লে দিলেন ঃ 'জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া', অসংবরণীয়, দীপ্ত, ক্ষমাহীন ও নৃশংস সারাংশ রচনা ক'রে দিলেন ভিতর-দুয়ার অনর্গল ক'রে ঃ

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ ।
অতএব পরিত্রাণ নাই ।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে ।।
ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি ;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমন-কি বিভীষিকা তুমি ।।

['নরক', ঐ]

এইসব অবিশ্বাস, নারকী বন্দনা, চীৎকার, ক্রোধ যেমন মানসিক গলি-ঘুঁজির ওপারে তুঙ্গে উঠেছে 'নরকে', কি বাঁকাভাবে প্রায় হিংস্র হ'য়ে উঠেছে 'প্রার্থনা' কবিতায়, তেমনি এই পাতালস্পর্শী কৃষ্ণাভারই উল্টো পরিপক রক্তিম উৎসারণ 'বিরাম' কবিতাটি ঃ সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে বিধর্মী,

সমগ্র সুধীন্দ্রীয় কাব্যে একক, উত্তরকালে যেমন তিনি মানসজটিলতার শিকার থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল হ'তে চেয়েছিলেন, তেমনি এখানে—একবার শুদ্ধ বর্তমানে বেঁচে থাকতে মনে হয়েছিলো, 'নেহাৎ মেকী দুর্ভাবনাগুলো।' হঠাৎ মনে হয়েছিলো, বুঝি এইসব 'কান্না, হাসি, সাধ্য ও সাধ, আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ, / চাওয়া, পাওয়া, সিদ্ধি, প্রবঞ্চনা' শুধুই ফাঁকি। আর তার পরেই সেই অমোঘ উচ্চারণ, যা সুধীন্দ্রনাথের মতো ভাবনা-প্রধান দার্শনিককে একবার বলতেই হ'তো, যা হয়তো আরো কেউ-কেউ অনুভব করেছেন ঃ

> সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা,
> সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলে বাঁচা,
> বাঁচা, কেবল বাঁচা।
>
> ['বিরাম', ঐ]

তাঁর মতো অতিপ্রজ ভাবনার নিরন্তর অত্যাচারে ক্ষ'য়ে যাচ্ছে যে, তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব—উপরের উদ্ধৃতির নির্গলিতার্থও তাই—'আহা, আমি যদি মনোহীন হতুম!' এই হচ্ছে আমাদের সময়ের সমস্ত মননজীবীর মনের কথা, এই যুক্তিহীন যুগের বিবেকী মানবের প্রার্থনা ঃ 'আহা, আমি যদি মনোহীন হতুম!'

"উত্তরফাল্গুনী"

পূর্ববর্তী বইগুলির অন্তরঙ্গে যা-যা ঘটেছিলো ফাল্গুনোত্তরে তারই বহুলাঙ্গ বিস্তার; সদ্যোপ্রাক্তন "ক্রন্দসী"কে এড়িয়ে নিয়মিত চাঁদের মতো তাঁর কাব্যের প্রধান প্রসঙ্গ—প্রেম—এলো ফিরে বহুস্তর আধুনিকতায় ভরপুর, উৎসুক ও গভীর। প্রেমিকা, কবি জানেন, একেবারেই সাধারণী, তবু তার মধ্য থেকেই যখন জেগে ওঠে চিরন্তনী তখনই এক ক্ষমাহীন মৌল জিজ্ঞাসাও আস্তে-আস্তে অনমনীয় মাথা তুলে দাঁড়ায় ঃ 'ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি ?/ বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে ?' এই বিজ্ঞ হিয়া, এই জ্ঞানবান হৃদয়, এই বুদ্ধি, জ্ঞান, মনীষা, এই-তো শেষ পর্যন্ত মননজীবীর শত্রু; তাকে তিনি শত-হস্ত দূরে রাখতে চান, কিন্তু ঐ জাগর চৈতন্যই কবিকে ঘুমের ভিতরেও নিদ্রাহীন ক'রে রেখে দিয়ে যায়। 'প্রতিদানে' প্রেমের আশা-নিরাশা উভয়ই আছে—সুন্দরের ভিতরে ঝকঝকে ছুরির গুচ্ছ লুকোনো আছে, কবি তা জানেন ঃ

সেই বিভীষিকা ছায়ার সমান
ফেরে অহরহ রূপের পাছে,
বহু বার তার আকার, প্রকার
ব্যক্ত হয়েছে আমার কাছে।
আমার মনের আদিম আঁধারে
বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে।
প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর
দায় ভাগ মোর শোণিতে নাচে।
সমুখে মরুর মরীচিকা ডাকে,
প্রলয়পয়োধি গরজে পাছে॥

['প্রতিদান', উত্তরফাল্গুনী]

'ব্যবধান', 'অহৈতুকী', 'নিরুক্তি' ইত্যাদি কবিতায় প্রায় অনুরূপ মনোভাব ঘোরাফেরা করতে দেখি। হয়তো 'অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায় সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে'-র দুঃসময়ে প্রিয়তমার সঙ্গে কবির দেখা হয়েছিলো ব'লেই পূর্বপুরুষের মতো শুধু নির্দ্বন্দ্ব ভালোবাসা তাঁর মনে ফুলঝুরির মতো ঝ'রে পড়লো না; হয়তো তাই 'তমিস্রার আবিল প্রপাত ডুবায় স্বপ্নেরে'; হয়তো অন্তিম সত্য এই:

সালোক্য, সাযুজ্য সঙ্গ, সে কেবলই সম্ভব স্বপনে;
বিসংবাদ, বিকর্ষণ আমাদের জাগ্রত জগতে;
ছুটি মোরা মর্ত্যচর আত্মঘাতী আবর্তের স্রোতে,
ফেনিল সম্মোহে মেতে, রন্ধ্রকেন্দ্র নাস্তির শোষণে॥

['দ্বন্দ্ব', ঐ]

একজন কবির সংবেদনায় এইসব অবিরাম অভিঘাত বোধ হয় জীবন্ত হরষে ডাক দ্যায় 'মরণতরণী'কে, কিংবা মধুরতম বিষাদে ভ'রে ওঠে 'মহানিশা'। মৃত্যু-চেতনার কবিতা হিশেবে জীবনানন্দের 'অন্ধকার' কবিতাটির সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের 'মহানিশা' তুলনীয়: হয়তো দুই কবিই তলায়-তলায় একই বিষাদ ও ক্লান্তির শিকার হয়েছিলেন ব'লেই ঐ কবিতা লিখেছিলেন: কিন্তু 'অন্ধকার' কবিতায় জীবনানন্দকে ভ'রে রেখেছিলো অরুচি ও বিবমিষা, জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা ও অভিমান; আর সুধীন্দ্রনাথ যেন অন্তিম দিনের কল্পনায় গ'লে গেছেন মধুরতম কবিত্বে, মধুরতম নারীত্বে—রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রায় অনুরূপ কবিতা লিখে গেছেন।

"উত্তরফাল্গুনী"র প্রথম ও অন্তিম কবিতা কাব্যটিকে যেন এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে: 'শর্বরী' ও 'প্রতিপদ' কবিতাদ্বয় শুধু জটিল অন্বয়ে সমায়তন নয়;

আদি কবিতায় যেমন কালের নিকষে 'দুঃস্বপ্নের বিপর্যয়ে নিশি জাগে শুধু অন্ধ হানি', অন্ত কবিতায় তেমনি 'আত্মহারা স্বয়ং সবিতা'; প্রথমোক্তের নৈর্ব্যক্তিক তমসায় বুঝি শেষ পর্যন্ত তলালো কবিব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ 'অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু স্বাগত।'

তত্রাচ, সুধীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যই পরিপূর্ণ নিরাশ্বাস নাস্তির সমর্থন করে না, প্রতিটি কাব্যেই অতল শূন্যের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে ঝংকার দিয়ে উঠেছে স্বর্গের চাবির গুচ্ছ; "তন্বী"র উল্লেখ তো না-করলেও চলে; আর, আগেই বলেছি, "অর্কেস্ট্রা"য় তার সন্ধান পাই 'মূর্তিপূজা', 'পুনর্জন্ম', 'অনুষঙ্গ', 'মহাশ্বেতা' ও সর্বোপরি উত্তুঙ্গ 'শাশ্বতী' কবিতায়; 'ক্রন্দসী'তেও আছে তার উপস্থিতি; 'বাক্য' নামক কবিতায় সম্পূর্ণ এবং 'প্রার্থনা'য়ঃ 'আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমি সুমেরুর বাধা/হয় যেন নন্দনে সমাধা,/ যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা/সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা/ নীবিবন্ধ খুলে/শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরু মূলে।' "উত্তরফাল্গুনী"-তে এই ধরনের 'আশাবাদী' কবিতা হচ্ছে 'প্রতিদান', 'অননুতপ্ত', 'প্রশ্ন', 'জন্মান্তর', 'মাধবী পূর্ণিমা', 'ডাক' প্রভৃতি। 'প্রশ্ন' কবিতার শেষ চারিটি লাইন অবিস্মরণীয়ঃ

> সত্য কি বাসো ভালো?
> এলাও, এলাও তবে ও-কবরী কালো।
> অনাদি অমায় হোক ত্রিভুবন নিমেষে হারা;
> শুধু জেগে থাক নিবিড় নীরবে চারটি নয়নতারা॥

['প্রশ্ন', ঐ]

কিংবা

> আধখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে
> জাগায়েছে তার মুখে কী মদির কান্তি।
> নিমেষনিহত স্বচ্ছ চোখের সরসে
> ভ্রষ্ট তারকা সন্ধানে সংক্রান্তি।
> রেশমী কেশের ঘন, কুঞ্চিত লহরে
> ভর ক'রে আছে অনাদি অসীম রাত্রি।
> নিরাশানিবিড় আয়ুর অন্ত্য প্রহরে
> কেন এল আজ অনাহূত বরদাত্রী?

['জন্মান্তর', ঐ]

"ক্রন্দসী"-তে যেমন 'বিরাম' কবিতাটি তেমনি "উত্তরফাল্গুনী"র 'মৌনব্রত'; অবশ্য কবিতা দুটির পার্থক্য স্ব-প্রকাশঃ 'বিরাম' কবিতায় কবি বর্তমানে

মুগ্ধ ও নিঃশেষ হ'তে চেয়েছিলেন, এখন তাঁর মনে হ'লো যত গান' তিনি রচনা করেছেন সব 'নিরর্থক বাক্যের জঞ্জাল', কেননা 'সংক্ষিপ্ত ভাষার শক্তি', তার চেয়ে ভালো নীরবতা—যে-'নীরবতা অক্ষয়, অমেয়।'

"সংবর্ত্ত"

এইবার প্রবেশ করলো তপ্ত ও স্পন্দিত সমকাল তাঁর ভাস্কর্যের দেহে; একদিন ঈশ্বর গুপ্ত রাগি ও বাঁকা চোখে তাঁর সময়কে যেমনভাবে তাঁর কাব্যে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছিলেন তেমন ক'রে নয়; কিংবা নয় পরবর্তীকালের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা নজরুল ইসলামের মতো, কেননা এঁদের 'রাজনীতিক কবিতা' স্পষ্টত প্রেমের কবিতা থেকে ভিন্ন; কিছুতেই পরস্পরে মেলে না; অন্যদিকে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর নায়িকাকে স্থাপন করলেন স্বেদসিক্ত সমসময়ের অস্থির পটে; কেননা রাজনীতি তো জীবনবহির্ভূত কোনো ব্যাপার নয়। তা এই নির্নিমেষ জীবনেরই অঙ্গ—তাই প্রেয়সী, প্রকৃতি ও রাজনীতি একাকার এলোমেলো জীবনের বিন্যাসে নির্মাণে পুনর্বিন্যাসে পুনর্নির্মাণে। 'নান্দীমুখে' তার উদ্বোধন, ছড়ানো 'উপসংহারে':

> হেথা নাস্তি পৃষ্ঠে পুরোভাগে:
> মাঝে শুধু তুমি, আমি আর এ-আদিম অরণ্যানি;
> সমাধিনমগ্ন কাল, অসম্ভূত অমা একা জাগে,
> পরাহত লুব্ধ কানাকানি।।
>
> ['উপসংহার', সংবর্ত্ত]

ব'লে দিতে হবে না যে উক্ত 'অরণ্য' নগরসভ্যতারই নামান্তর, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় উন্মুক্ত হ'লো আতিশয্যে; তখন দেখা গেলো 'নিরংকুশ, নিঃসন্তান, নিত্য মরুভূমি আস্তিকের পুরস্কার'; তরণী শতচ্ছিদ্র; চাঁদ কাস্তে হ'লো; 'অরাজক চরাচরে প্রশ্ন প্রতিহিংসার প্রতুল' এবং 'জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত অতীন্দ্রিয় ভাবনানিচয়।'

আধুনিক যুগের স্বাক্ষর মুদ্রিত এর পাতায়-পাতায়:

> অশক্য পিতা; বন্দীর কণ্ঠলগ্ন
> মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন;
> ক্ষাত্রশোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
> তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
>
> ['নান্দীমুখ,' ঐ]

আসন্ন প্রলয় ঃ

মৃত্যুভয়

নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।

সর্বস্ব ঘু'চয়ে, যারা ব্যবচ্ছিন্ন দেহে আজও বাঁচে

একমাত্র মুমূর্ষাই তাদের নির্ভর ;

['উজ্জীবন', ঐ]

তবু "ক্রন্দসী"র 'প্রার্থনা' কবিতায় যেমন অন্তিম যাত্রার পারে সুরসুন্দরীর সান্নিধ্যের আশা করেছেন, তেমনি "সংবর্ত" কাব্যের 'সংবর্ত' কবিতায় 'স্বপ্নের নিভৃতে' 'ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মনীষা'-ভরা এক রাষ্ট্র ছিলো, 'শ্বাপদসংকুল নয় যেখানে কানন/দুরাক্রম্য নয় গিরিচূড়া,/ পরিস্রুতসুরা/নিদাঘের অফুরন্ত দিন।'

"দশমী"

সপ্তপদীর এই হচ্ছে শেষ সোপানে, যেখানে কবি পৌঁছেছেন অনেক কোণ-মোড়-বাঁক নিয়ে, কাঁটাতারের মনোজ সীমান্ত ভেঙে ফেলে অনেক ভাবনা-বেদনার নদীর পরপারে ফ'লে উঠেছে দশটি আশুতোষ ও পরিপক্ব ফল ঃ প্রথম কাব্যের বিস্পষ্ট রবীন্দ্রানুগত, আসন্ন পদধ্বনি সাড়া ভাঙলো, উদ্বেল অথচ সংবৃত হ'য়ে উঠলো একক "অর্কেস্ট্রা"য় ; নিখিল নাস্তি তার খিল খশিয়ে কবিকে ডেকে নিলে ভিতরে, ভঙ্গুর ও শূন্যময় ভিতরে, ঐকতান হ'লেও একজন সুধীন্দ্রনাথের পরিচালনা তথা চারিত্র্য প্রকাশিত হ'লো অনিবার্যভাবে ; পরবর্তী কাব্যে একই মাধ্যমের তরঙ্গভঙ্গ বিস্তীর্ণ হ'লো, শুধু এক প্রেমের প্রসঙ্গ উত্তীর্ণ হ'লো জীবনের সর্বস্তরে ; "উত্তর-ফাল্গুনী"তে ফিরে এলো প্রেম-প্রধান গল্পের বেদনাময় রেখাগুলি ; পরবর্তী কাব্যে প্রলয়ের ফাটলে ফাটলে ধরা পড়লো ক্ষণকালীন, সমকালীন, বৈদ্যুতিক, বঙ্কিম ও সমান্তর চরণসমূহ, বাংলা কাব্যে আগন্তুক রাজনীতির নূতন বিদীর্ণ পরিবেশভূমিকায় রচিত হ'লো সংরক্ত চিত্রগুচ্ছ ; আর সর্বশেষে পাকা, স্বচ্ছ, মিনারস্পর্শী, নিরঞ্জন, "দশমী"। বস্তুত, সব কবিই তো জীবন ভ'রে একটিমাত্র গ্রন্থ রচনা করেন ; শুধু সুবিধার খাতিরে তাদের ভিন্ন-ভিন্ন নাম দিতে হয়, তা নাহ'লে আসলে তো শতবিচিত্র জীবনবিন্যাসের মধ্য দিয়ে একটিমাত্র কবিমনই শিহরিত শিকড়ের মতো প্রবেশ করে, মনের মাটির নিচে সেই একই জলজ্বলে ও রুদ্ধশ্বাস ফলগুলি, একই হীরকচ্ছুরিত উন্মোচন। এই উক্তি শুধু এলিঅট-কথিত 'বিবর্তনহীন' কবিদের উপরেই

প্রযোজ্য নয়, যাঁরা এক-জীবনে বারবার জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদেরই অন্যতম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-নামক মহাকবিটিও উপর্যুক্ত সংজ্ঞার বাইরে চ'লে যেতে পারেন না, কেননা তিনিও সকল কাব্যের মধ্য দিয়ে বইয়ে দিয়েছেন কোনো একটিমাত্র বাণী, বার-বার, জীবন ভ'রে পুনরাবৃত্তির পরোয়া না-ক'রে তিনি একটি অতল ও সনাতন আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছেন— উত্তরকাল যাকে তাঁর আত্মার নির্যাস ও স্বর্গের সন্তান ব'লে শনাক্ত করেছে। আর সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগুলি, কি প্রসঙ্গে কি প্রকরণে কি বিন্যাসে, এমন পার্থক্যরহিত ও সমান্তর যে কোনো দপ্তরি বা ভাগ্যবিধাতা যদি এগুলিকে একটি গ্রন্থে বেঁধে দিতেন—'কাব্যসংগ্রহ' কথাটি বাদ দিলে "সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ" গ্রন্থটি যেমন হ'তো, তা আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে কোনো আপত্তি থাকতো না; কিংবা সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-সংগ্রহে বিভিন্ন গ্রন্থের নামগুলি খণ্ডবিভাগের শীর্ষনাম হিশেবে যদি কল্পনা করা যায়, তাহ'লে এটিকে একটি বই ব'লে স্বীকার করতে বাধা থাকে না।

যে-মনোভাব "উত্তরফাল্গুনী"র কোনো-কোনো অংশে উঁকিঝুঁকি মারছিলো, তাই নিজস্ব মার্কা নিয়ে নিশ্চিতভাবে ফুটে বেরোলো "সংবর্তে"র শেষ কবিতা-দ্বয়ে—'উন্মার্গ' ও 'প্রত্যাবর্তনে'—আর "দশমী" কাব্যগ্রন্থে সে ই হ'য়ে উঠলো একমাত্রঃ শুধু উধাও ক্ষণবাদের মুগ্ধতায় তারা এক প্রশস্তি নয়, শুধু মুহূর্তের আনন্দ কবির সব গাম্ভীর্য ও দার্শনিকতাকে ভাগিয়ে দিচ্ছে ব'লেই এদের তুলনা ঘনিয়ে এসেছে একথাও বলা যাবে না; বস্তুত 'উন্মার্গ' ও 'প্রত্যাবর্তনে'ই দেখা দিলো ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান, প্রকৃতির পরিবেশ, মননজীবী কবির চিত্রপ্রধান কাব্যরচনায় হাতে-খড়ি—যার ব্যবহার "দশমী" কাব্যে অটুট, উদ্দেশ্যময়, ও অবিরল।[৫] সুধীন্দ্রনাথ এই কাব্যে নিজেকে বলেছেন 'ক্ষণবাদী', তাঁর বৈনাশিক ও ক্ষুৎকাতর কালচৈতন্য এখানে মিইয়ে এসে খানিকটা আনন্দ পেতে চেয়েছে। মুহূর্তের চূড়ায়-চূড়ায়, যেন বুঝলেন, সুখ তো অসম্ভব, তার চেয়ে স্বস্তি খুঁজে পাওয়া ঢের ভালোঃ

> ১. আমি ক্ষণবাদীঃ অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
> নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
> তাতে যার জের, সে-সংসারও।
>
> ['উপস্থাপন', "দশমী"]

২. ......"সুদূরে আর চোখ চলে না, এখন আমি
শুদ্ধ কৃতাঞ্জলি, বর্তমানের প্রত্যাদেশে দিন সঁপেছি
যাতে ভূতের বেগার খাটতে না হয় রাতে"...

['প্রত্যুত্তর', ঐ]

৩. একা সে এখন, বাঁধা অধুনার তালে ;

['ভ্রষ্টতরী' ঐ]

৪. সে-চির মুহূর্ত এই, বিশ্বরূপ যার ব্যাত্ত মুখে,
যার সারথ্যে ও সখ্যে ক্লৈব্য থেকে মুক্ত ক্ষণবাদী ঃ

['ভূমা', ঐ]

এই ক্ষণিকার মায়ায় মজেছিলেন ব'লেই ইন্দ্রিয়ের সারল্যে মুগ্ধ ও স্নাত হ'তে শিখলেন এতোদিনে৬ ঃ

১. শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে ঃ
চক্রবালে শুভ্র মেঘপাল
নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ'রে ; কদাচিৎ খোঁড়ায় রাখাল
স্নিগ্ধ বনান্তরে ॥

['নৌকাডুবি', ঐ]

২. হেমন্তের বেলা প'ড়ে আসে :
ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটা হ'য়ে গেছে সারা,
খামারে খামারে সোনা, ভারা ভারা খড় আশেপাশে ;
স্তব্ধ ঘাট, রিক্ত বাট ; একমাত্র তারা
অনুমিত পাণ্ডুর আকাশে ॥

['অগ্রহায়ণ', ঐ]

৩. সবুজের স্বরগ্রাম ফাল্গুনের রৌদ্রে হিরন্ময়,
সংগত সে-ঐকতানে অসম্পৃক্ত আমের মুকুল :
হলুদে চিত্রিত লাল, জনপদবধূর দুকূল
সংরক্ত রূপের সাক্ষ্য ঃ অন্তরাত্মা পর্যন্ত তন্ময় ॥

['ভূমা', ঐ]

৪. কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে,
কুলায় খোঁজে শুক ঃ
চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে.
সূর্য অধোমুখ ।
কেবলই দূর মুখর তবু পবনে,
কোথায় যেন নিবিদ বলে যবনে ;
চিরায়মাণ নির্বাপিত হবনে
কালের কৌতুক ।

বিরত মহাশূন্য ওই গোধূলি ধীরে আছে ঃ
কৃষ্ণচূড়া তাড়ায়, ওড়ে শুক ।।

['নষ্টনীড়', ঐ]

এই দিক থেকে "দশমী"র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা"র তুলনা অপ্রতিরোধ্য আপাতদৃষ্টিতে। উভয় কাব্যেই ক্ষণমুহূর্তের হর্ষে মজেছেন দুই কবি, কিন্তু গভীরতর পার্থক্য বিরাট ও বিপুল ঃ "ক্ষণিকা"য় রবীন্দ্রনাথের যে-নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতা নিঃসৃত তার পিছনেও হয়তো 'চোখের জল' ছিলো ; কিন্তু "দশমী"র কবির যন্ত্রণা আরো অনেক বেশি, সেজন্যে ক্ষণবন্দনায়ও "ক্ষণিকা"র কবির মতো গাম্ভীর্য খ'শে পড়ে না, এটা যেন প্রায় কবির পূর্ববর্তী কাব্যের প্রতিক্রিয়া, কিংবা অন্তিম ফসল, যেন এতোদিনে তিনি 'জীবনের সঙ্গে মিটমাট' করতে চাচ্ছেন, "দশমী" আধুনিক কবির অভিজ্ঞ চুক্তি, এর পিছনেও জটিল মানসিক কলকব্জার অস্তিত্ব স্বতঃপ্রকাশ। আরো ঃ প্রেম, পৃথিবী বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কবির অবিশ্বাস এখনো দৃঢ়, নিশ্চিত ও শরীরী ঃ

১. অন্তত এতে সন্দেহ নেই আর
অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে, সংসার
অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যক্তির বুদ্বুদ
সময়ের স্রোতে অচির, অরুন্তুদ,
মমতার জোট পাকায় এ-চরে, ও-চরে ।।
... ...
অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই ঃ
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই,
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী ।।

['প্রতীক্ষা', ঐ]

২. অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুজ্ঝটিক ঃ
অনুত্তাপ নাস্তির কিনারা ;
বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুম্বক ।।

['নৌকাডুবি', ঐ]

৩. একদা কত কী ভর করেছিল তাতে—
স্বপ্ন ও স্মৃতি, পর্বতপরিমাণ ঃ
মহার্ণবের দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে
কিঞ্চিৎও শেষে পায়নি পরিত্রাণ ।।

['ভ্রষ্টতরী', ঐ]

"দশমী"র প্রায় প্রতিটি কবিতা, 'প্রতীক্ষা', 'নৌকাডুবি', 'অগ্রহায়ণ', 'ভ্রষ্টতরী', 'তীর্থপরিক্রমা', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি, বিদ্যুতের মতো ইশারাময়, যেন শুধু ঐ নামগুলি উচ্চারণ ক'রেই কবি আত্মার গোপন স্থানে আলো ফেলেছেন।

৪

সারাজীবন যে-'শীত, শীত, নিখিল নাস্তির শীত' তাঁকে তাড়া ক'রে ফিরেছে, এতোদিনে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন তা কিছুতেই বলা যাবে না, উপরের উদ্ধৃতিগুলিই তার বিরুদ্ধতা করবে; কিন্তু এতোদিনে যেন তার সহবাসে ও কার্যকারণে মন স্বচ্ছ ও নির্ভার হ'য়ে এসেছে, কবিতার বহিরঙ্গ যতোই জটিল হোক কবির অনুভবে একরকম প্রৌঢ়িক প্রশান্তি ফ'লে উঠেছে: পশরার ফাঁকি আর বাকি হঠাৎ চন্দনগন্ধে উঠেছে ভ'রে, রাত্রির কুট্টিম অক্ষয় অশোকে বরকুচি হ'য়ে উঠেছে, পঙ্গু পাখা উঠেছে ব্যস্ত হ'য়ে, বিরহী শুক নিরুদ্দেশে ঘুরছে—এক কথায়, দেখা গেলো তমসা জ্যোতির্গামী। এতোদিনে অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাসের অভ্যাসে যেন তীব্র-তিক্ত-তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্বন্দ্ব উবে গেছে, তাপ ও জ্বালা গেছে নিভে, নীল জ্যামিতির পাকে ধরা পড়েছে আস্বচ্ছ জীবন, পরিপূর্ণ বর্তমান নাস্তিকেও তার অংশ ক'রে নিয়েছে।[৭] বৃক্ষ আর তরণী, বিহঙ্গ আর সমুদ্র সব-কিছুই কুয়াশা ও অর্ধ-আলোকের মধ্য থেকে অব্যর্থ প্রতীকের মতো একবার দেখা দিয়ে আত্মার উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে যায়।

চাতুরী ও মাধুরী

এক ফাঁকা, ফাঁপা ও ফোঁপরা সময়ের কথা বললেও সুধীন্দ্রনাথের কবিতা প্যাশান ও যুক্তির অন্বয়ে আশ্চর্য নমনীয় ও বলীয়ান;—অবশ্য কবিতা যুক্তিকে যতোদূর পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নেয়। এই যুক্তির চারু স্থাপনার জন্যেই কবিতার কনস্ট্রাকশনে এসেছে সৌম্য কঠিন স্থাপত্যলীলা, দেখা দিয়েছে এক ঝাঁক অব্যয়, 'জাতক' কবিতা যেন তার চূড়া ছুঁয়ে এলো। তাহ'লেও গদ্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যভাষার পার্থক্য প্রকট ও বিরাট: রচনার তলায়-তলায় চকি তুলে ব'য়ে চলেছে নখদন্তময় আবেগ, কবিতার আরক্ত আবেগ, কবির মুখ্য মূলধন আবেগ। বাংলা শিথিল কবিতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রদীপ্ত রচনাবলি যেন প্রতিবাদ; কেননা, আবেগ থাকলেই তো কবি হওয়া যায় না, মিটিঙে

বা মিছিলে আবেগের দাম যেমন বেশি বাণীশিল্পে তেমনি কম ; আবেগকে সংযমের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই কবিত্ব, নেহাৎ আবেগ কেবল অকাব্যের বেঢপ ভাণ্ডার হ'য়ে ওঠে। তাঁর মৌলিক কবিতায় ও অনুবাদে—অন্তত গড়নে—যত্নের অভাব চোখে পড়ে না কোথাও, আর সেটাই তাঁর চরিত্র ; 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাটি তার অন্য মূল্যের কথা ছেড়ে দিলেও—বিবিধ ছন্দের পরীক্ষায়, জটিল বৈচিত্র্যে ও সমমাপ অবৈকল্যে তিরিশের যুগের তুলনাহীন কবিতা ; এমনকি তাঁর স্বভাবের পক্ষে বিধর্মী 'বিরাম' কবিতাটি বা হাইনে-র অনুবাদগুচ্ছে যদিও সারল্য বিচ্ছুরিত তবু সেখানেও লুকোনো স্থাপত্য কেন্দ্রবাসী। অব্যয়ের ব্যবহারে, অনুপ্রাসের অবিরলতায়, শেষ কাব্যের লুকোনো মিলের ঐশ্বর্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য। বাংলা ক্রিয়াপদের দৈন্যের কথা মনে রাখলে তাঁর ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য—যার সম্যক প্রকাশে ও ব্যবহারে তাঁর গদ্য ধনী—বিস্ময়কর তাঁর কবিতায় এবং এ বিষয়ে তিনি কুণ্ঠাহীন ; নূতন ও পুরোনো সকলকেই তিনি নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আনেন ঃ

১. বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার ;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে ।।

['হৈমন্তী', অর্কেস্ট্রা]

২. লুপ্ত হল আধারবিন্দু বিশ্ব হতে ;
খিন্ন খসাল নাস্তি পুনর্বার ঃ
ভাগ্যরবি চলল ছুটে পাতালপথে ;
চতুর্দিকে আদিম অন্ধকার ।।

['অর্কেস্ট্রা', ঐ]

৩. একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,

['শাশ্বতী', ঐ]

৪. তবে কি দুর্মর মর্ত্য ক্রন্দসীতে ক্রন্দন বিথারে ;

['সৃষ্টিরহস্য', ক্রন্দসী]

৫. অজস্র ঐশ্বর্য মোরে অর্পিয়াছে সমুদার বিধি ;
ভুঞ্জেছি নিষ্কুণ্ঠ মনে সে-সকলই প্রাপ্য ভেবে আমি।
পেয়েছি অমিত সুধা আমন্থিয়া কালের বারিধি ;
করেছি তা আত্মসাৎ, শুধু বিষ কণ্ঠে গেছে থামি ।।

['অকৃতজ্ঞ', ঐ]

৬. শকুনির ক্ষুধানিবারণে
শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভ'নে

সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও
অপরের অপঘাত।
. .   ...
কিন্তু যেথা সপিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ
প্রমিতির বিষরক্ষে অমিতির অচিন্ত্য অভাবে ;
...
দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,

['প্রার্থনা', ঐ]

৭, বন্ধুরা ব্যঙ্গ মসে চাহে; প্রতিবাদ করে সমস্বনে ;
কেহ বা প্রকাশে উষ্মা; সকৌতুকে শুধায় কেহ বা—
কবিত্ব আমার ধর্ম, তাই বুঝি কৌমুদীজাগরে
পেচকীয় দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা ॥

['মাধবী পূর্ণিমা', উত্তরফাল্গুনী]

এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'অকৃতজ্ঞ' কবিতাটি।

তাঁর কোনো-কোনো কবিতার বাক্যগঠন একেবারে গদ্যের মতো—অবশ্য কবিতাকারেও তাদের কোনো ক্ষত আবিষ্কার করা যায় না, এবং সেখানেই কবির চাতুরী :

ভেলা আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো আজ এটুকুই আমার পরম পরিচয়। আমাকেও লক্ষ্যভেদী নিষাদের উল্লুণ উল্লাস উদাসীন নদীর উজানে দিয়েছিল অব্যাহতি মাল্লাদের গুণটানা থেকে। গাঁঠ গাঁঠ বিলাতী বস্ত্রের ভার, রাশি রাশি মার্কিনী গমের ভাবনা ও প্রতিযোগী ব্যাপারীর বাদ-বিসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল ঢুকে; এবং হঠাৎ অধোগতি অনুকূল স্রোতে হয়েছিল অবারিত।

['যযাতি', সংবর্ত]

জীবনানন্দ যেমন মুখের কথার ব্যবহারে কবিতার লক্ষ্যভেদ করেছিলেন, তেমনি সুধীন্দ্রনাথের উপচয় ছিলো পুরোনো শব্দ—এমনকি প্রাকবৈদিক শব্দেও তাঁর সংকোচ ছিলো না। কেননা তিনি জানতেন : 'রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরোনো শব্দও কাব্যের বাধ সাধে না।' এরকম শব্দখচিত কোনো-কোনো পংক্তি দীপ্তি ও ধ্বনির অন্বয়ে অপরূপ ৮ :

কক্ষের সংযত সজ্জা, হেমন্তের পক্ক পত্র-সম,
আত্মচ্ছবসন তব, দরদের বলি শুভ্র ভালে,

ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব মনে আছে; শুধু নিরুপম
অখণ্ড আননখানি সীমাশূন্য শূন্যে যে লুকালে ।।

['বিকলতা', অর্কেস্ট্রা]

২. মরণ, তুমি তো আসিবেই এক দিন,
এসো তবে আজ বেগে।
দশমীর চাঁদ আকাশে তন্দ্রাহীন
ভর ক'রে আছে বীতবর্ষণ মেঘে;
সুদূরের হাওয়া কোথা নারিকেলবনে
কার আহ্বান নিবিদ ভাষায় ভণে;
রজনীগন্ধা রয়েছে কী প্রয়োজনে
প্রচুর পরাগে জেগে;
শুধেছে বিধাতা চিরজীবনের ঋণ?
এসো, হে মরণ, এসো আজ দ্রুত বেগে:

['মহানিশা', উত্তরফাল্গুনী]

৩ তবুও নিশ্চয় জানি ওমরের তত্ত্ব নিরর্থক।–
মানুষ ক্ষীণায়ু, কিন্তু চিরস্থায়ী অবদান তার;
প্রস্তরিত পদচিহ্ন ধরা পড়ে উধাও নর্তক;
নিবিদ মর্মরে জ্বলে অঙ্গারিত আদিম কান্তার ।।

['সংক্রাম', সংবর্ত]

৪. কিন্তু তার
বক্র কেশে অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার,
সংহত শরীরে
দ্রাক্ষার সিতাংশু কান্তি, নীলাঞ্জন চোখের গভীরে
তান্হিল্যের দামিনীবিলাস;
গ্যেটে, হ্যেল্ডার্লিন, রিল্কে, টমাস্ মানের উপন্যাস
দেওয়ালের খোপে খোপে, বাখের সনাটা
ক্লাভিয়েরে, শতায়ু ওকের পাটা
তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে;
বায়ব্য অঞ্চলে
রক্ষিত মঙ্গলদীপ, অনাদি নগরী,
মালা জ'পে, কাটায় শর্বরী
স্বপ্নাবিষ্ট সভ্যতার নিশ্চিন্ত শিয়রে।–

['সংবর্ত', ঐ]

অবিশ্বাস না অভিমান?

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে আদ্যন্ত অবিরল ও উপর্যুপরি এক 'নিখিল নাস্তি'র ঘোষণা আমরা শুনতে পাই: ১৯৩০ সালে তাঁর কাব্যরচনার প্রথম সময়ে 'নিশ্ছায় অমিত শূন্য' মরুভূমি তিনি দেখেছিলেন, অনেক বাঁক ঘুরেও সে-দৃষ্টির কোণ একেবারে বদলে যায়নি, মৌল সমস্যাকে ছোঁবার চেষ্টা করতে গিয়ে ১৯৫৬ সালেও—তাঁর কাব্যজীবনের অন্ত্যকালে—ঐ একই উত্তর পাওয়া গেলো, 'নৌকা অচল, মাঝি বিকল।' অবশ্য, একথাও উল্লেখ করেছি, একস্তর সুধীন্দ্রনাথেরও 'নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে' লুকিয়ে জেগে ছিলো সারাক্ষণ অমৃতের জন্যে তৃষ্ণা, এবং প্রতিটি কাব্যে তারও নির্জন স্থাপনা। তত্রাচ, 'শীত, শীত, নিখিল নাস্তির শীত'-ই এই অসংলগ্ন, এলোমেলো ও ছিন্নমূল জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের পাল্কিতে চড়িয়ে ব'য়ে নিয়ে গেছে, যেন দুর্বোধ ও ঝাপশা কুয়াশার ভিতর দিয়ে বিশ্বাসের চিৎ ও নিষ্প্রাণ শবাধার টলতে-টলতে কারা খুব তাড়াতাড়ি ও নিঃশব্দে নিয়ে চ'লে গেলো চোখের সুমুখ থেকে।

জীবনানন্দ দাশের হীরকস্ফটিক প্রবন্ধসমূহে যে শব্দটির ব্যবহার নিরন্তর ও অবিরল, 'চেতনা', সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন তারই পরিপূর্ণ অধিকারে। তাঁর অন্বিষ্ট ও গন্তব্য ছিলো আত্মপরিচয় ও আত্মসন্ধিৎসা; ঐ গন্তব্যের পরিচ্ছন্ন আঁকাবাঁকা পথ হচ্ছে চৈতন্য, আর অভিজ্ঞতা তার মাইলে মাইলে সংকল্প ও স্টেশনের মতো, ঐ চৈতন্যের পশ্চাদ্ধাবনে যদি ফুটে ওঠে কোনো উপলব্ধি, আর তাকে যদি সৎভাবে ও শিল্পিতার সহিত উক্তির ভিতরে নিবিষ্ট করা যায়, তাহ'লেই নিবিড় সংকট ফেটে কবিতা উদ্‌গত হ'তে থাকে। কবি বারবার উল্লেখ করেছেন 'উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত' কথাটি;—তাই হচ্ছে সততা, ধৈর্য আর পরিশ্রম, তাই হচ্ছে উদ্যম, উন্মীলন আর অধ্যবসায়, পরবর্তী যুগের কবিযশোপ্রার্থীদের যার কাছে ফিরে আসতেই হবে। কবির উক্তি ও উপলব্ধির অবিচ্ছেদ যতোই ঘনিষ্ঠ হোক-না, তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে তাঁর প্রকাশভঙ্গির একটি অসামঞ্জস্য লক্ষ্য না-ক'রে আমরা পারি না: যিনি বারবার তুঙ্গী হাহাকার ক'রে উঠেছেন, তিনি কিভাবে রচনাকর্মে এতো সযত্ন ও নিষ্ঠাবান হ'তে পারলেন? যাঁর মনোরচিত ভুবন ভেঙে খান্‌খান্‌ হ'য়ে যাচ্ছে বাস্তবের সংঘর্ষে, তিনি একবারও ভেঙে পড়েন না কেন? তাঁর জীবনে বা রচনায় কেন সেই নাস্তিকেন্দ্রিক শতদলে পতন বা ছিদ্র পাই না,

যার সুবিধায় আমরা নিজেকেই তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতুম ? —এইসব সংগোপন ও রুদ্র জিজ্ঞাসার মোটামুটি একটি উত্তর অবশ্য অগত্যা আমরা নিজেরাই তৈরি ক'রে নিতে পারি ঃ প্রথমত, কবি নিজে যাই হোন-না কেন, শিল্প দাবি করে চরম অভিনিবেশ, যুগ বিশৃঙ্খল এই কৈফিয়তের সুযোগে রচনাধারা স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠলে শিল্পিতার অপমানই শুধু স্তূপীকৃত হ'য়ে ওঠে ; দ্বিতীয়ত, সুধীন্দ্রনাথের 'অবিশ্বাসে বিশ্বাস' ছিলো দৃঢ় ও সম্পন্ন, এবং এরকম একটি বিশ্বাস না-থাকলে তুচ্ছতম কাজের কড়ে আঙুলও নড়ানো যায় না ; অবিশ্বাস যখন ধূসর ও নামহীন চরমে উঠে যায়, তখন নিজস্ব সৃষ্টিও এতো ফাঁপা ও আত্মপ্রবঞ্চক মনে হয় যে তুলিকলম আর চলে না ; সত্যিকার অবিশ্বাসের সমাপ্তি মৌনতায় ও বন্ধ্যাত্বে ; অর্থাৎ 'অবিশ্বাসীতম শিল্পী' কথাটি হিরের রজতপিণ্ড মাত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি ঃ—লিয়োনিদ আন্দ্রেইয়েভ প্রসঙ্গে কলিন উইলসন বাঁকাভাবে বলেছেন, এই লেখক একবার অবিশ্বাসের কাছে গ্রেফতার হ'য়ে বিখ্যাত হ'য়ে যাওয়ায় সারাজীবন তিনি তারই ভজনা করেছেন ! সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেও কোনোদিন এরকম কথা উঠতে পারে। সেজন্যে এখানেই ব'লে রাখি যে, কোনো শিল্পীই আক্ষরিক অর্থে সৎ হ'তে পারেন না ; কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে, সৎ লোক কোনোদিন লেখক হয় না। আসলে তো শিল্পের সততা লোকপ্রচলিত সততা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ; 'নিজে যা বিশ্বাস করি না এমন একটি অক্ষরও কাগজের উপর বসাবো না'—একথা কোনো শিল্পীই বলতে পারেন না।[৯]

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ যে মন্তব্য করেছেন, তা আমি অত্যন্ত উপযুক্ত ব'লে মনে করি ঃ

> সুধীনের রচনাতে যে নিয়ম পাই, সেটাও দুর্নিবার। একধারে চরাচর বিশ্ব, অন্যধারে ছন্দ। একধারে কসমস, অন্যধারে ক্রাফট। দুটি নিয়মের সম্বন্ধ কি ?

> সুধীনের রচনায় সম্বন্ধের দুটি গুণ চোখে পড়ে। এক—দুর্নিবারতা, আর নৈর্ব্যক্তিকতা। এই মনোভাবকে সাধারণত 'অবজেকটিভ' বলা হয়। সুধীন কবিতাকে আর্টকে ইম্পার্সন্যাল করতে চায়। জাঁতাকলের চাপে হতাশাই উৎপন্ন হয়। হতাশা ফ্রাস্ট্রেশন নয়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও নয়, নঙর্থক নয়, সদর্থক। ত্রিশ দশকের মনোভাব ব'লে একে উড়িয়ে

দেওয়া চলে না। এটা বিষাদ, এবং এর সাক্ষাৎ প্রত্যেক ক্লান্তির মূলে পাওয়া যাবে।......

সুধীনের কবিতায়, গদ্যে অর্থাৎ তার বিষয়বস্তুতে, বৌদ্ধ-দর্শনের ছাপ পেয়েছি। সৌতান্ত্রিক কি বৈভাসিক ততটা নয়, যতটা মাধ্যমিক। দুটি প্রধান লক্ষণ, ক্ষণিকবাদ আর ডায়ালেক্টিক। 'শূন্যতা'ও খানিকটা। এবং পারমিতাবোধের প্রক্রিয়াও খানিকটা পেয়েছি তার শৈলীতে; যথা—পরিমাণ ও পরিণতিতে। রচনাকে সে পারফেক্ট করতে চায়, আর তার দ্বৈততা ও বিরোধ সংজ্ঞা পরিমাণদ্যোতক। তার ডায়ালেকটিক হেগেলীয়ান নয়, মার্কসিস্ট তো নয়ই। তার কাছে সিনথেসিস নেই, অতএব স্পাইরালও নেই। এখানে সুধীন মাধ্যমিক, সন্দেহ হয়। কিন্তু সুধীনের 'করুণা' নেই, বিষাদ আছে।

["মনে এলো," পৃঃ ১৩২-১৩৪; ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়]

আমেরু ব্যবধান সত্ত্বেও, জীবানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ, তিরিশের এই দু'জন প্রধান কবির কাব্যের ঋতু হেমন্ত : পশ্চিমে এই ঋতুতে যেমন পাতা ঝ'রে যায়, পাখি চ'লে যায় অন্য জীবনে, তেমনি বাংলাদেশেও এই ঋতু বিনষ্টির, হারানোর, শস্যরিক্ততার, উত্তরফাল্গুনীর, ধূসর পাণ্ডুলিপির। তবে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন না শুধু ইতিহাসের পুত্তলি, শুধু পারিপার্শ্বিকের দাস, এই দীর্ণ, জীর্ণ, গৈরিক সময়ে কবি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি যিনি করতে পারেন, তাঁর অন্বেষণ-যে অসীমের খাদ্যে ভরা তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না :

চিরকালের কীর্তিস্তম্ভগুলোকে ভেঙেচুরে সভ্যতার স্টীমরোলার আজ যখন তার অভিমুখে ধাবমান, তখনও দুঃসাহসে ভর ক'রে কবি আছে সৌন্দর্যের দরজা আগলে। তার মনে আশা নেই। সে জানে তার পরাজয় নিশ্চিত। সে বোঝে সে একা; যাদের জন্যে তার বিদ্রোহ, তাদের কাছে এই আসুরিক স্পর্ধা যেহেতু পাগলামিরই নামান্তর, তাই তার পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। তবু তার চেষ্টার ক্রটি নেই, বিরাম নেই তার গানে। সে গান হয়তো আনন্দের নয়। তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ। ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিয়ে সারা। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য; রাহুগ্রস্ত হ'লেও, সে আমাদের নমস্য।

['কাব্যের মুক্তি', "স্বগত", সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

কোনো-এক প্রবন্ধে বাংলাদেশের 'নূতন লেখকদের' সুধীন্দ্রনাথ 'অত্যাধুনিক ইংরাজ কবি অডেন্ বা স্পেণ্ডর বা ডে লুইস-এর সমপাঙ্‌ক্তেয়' ব'লে উল্লেখ করেছেন, একথা স্মরণীয়।

আপাতচক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মেরুপ্রমাণ ব্যবধানই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ মরপৃথিবীতে বারবার এনে দিয়েছেন সুন্দর-মঙ্গল-সত্যের ভীষণ সুসমাচার; তিনি বিশ্বাসী এক মৌল, গাঢ় ও সুধাংশু-শেখর সত্যে; প্রেমে, ঈশ্বরবিশ্বাসে, কল্যাণকামনায় পরিপূর্ণ মানব তিনি, অর্থাৎ পরম দেবদূত, এই মর্ত্যকেই ফোঁটায়-ফোঁটায় পান ক'রে গেছেন। পক্ষান্তরে, সুধীন্দ্রনাথ কেবলি রটিয়েছেন 'দেশ-কাল সংকলিত মলে'র সংবাদ, বলেছেন, 'ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য স্বপ্নমায়া সম আমার নন্দন বন', বলেছেন, 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী', বলেছেন, 'হয়তো ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ', প্রার্থনা করেছেন 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' ফিরে পেতে। কিন্তু সম্পূর্ণ ও অতিকায় দেবদূতের যেমন শেষ জীবনে হঠাৎ ফেঁশে গিয়েছিলো বিশ্বাসের বন্ধন, চিত্রপর্যায়ে ও রচনাধারায়, কোন কালো হাওয়ার আঘাতে দরোজা খুলে বেরিয়ে পড়েছিলেন বিধর্মী ও অচেনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; তেমনি সুধীন্দ্রনাথের তীব্র-দীপ্র মুখ-ফেরানো শয়তানে-পাওয়া ধ্রুব ভিত্তির উপর রুখে উঠেছে অন্য পরিচ্ছেদ, যাকে আমরা 'ভালোবাসা' নামেই চিহ্নিত করতে বাধ্য হই। রবীন্দ্রনাথকে যদি 'আধ্যাত্মিক' বলি, তাহ'লে সুধীন্দ্রনাথকেও আধ্যাত্মিক বাদে অন্য-কোনো উপাধি দিতে আমি অক্ষম, কেননা কবি মাত্রেই তাই, কবি মাত্রেই বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংঘর্ষের অতীত। তা নাহ'লে এটা তো আমরা জানি : প্রেম-যে বানানো জিনিস, মন-ভোলানো ব্যাপার ও ভঙ্গুর তাতে সাধারণের কোনো আসে যায় না; আধুনিক মানুষ-যে পূর্বজের মতো বিশ্বাস করতে পারছে না, এতে সাধারণ লোকের কোনো যন্ত্রণা নেই; ঈশ্বর আছে কি নেই, সাধারণ লোক মাথা ঘামায় না এসব নিয়ে;—এক কথায়, সাধারণ লোক কোনো কিছু বিশ্বাসও করে না অবিশ্বাসও করে না। আর সুধীন্দ্রনাথের প্রধান আচার ঐ প্রেম, ধর্মবোধ, কালচৈতন্য ও ঈশ্বর—আর এটাই প্রমাণ তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার, বিশ্বাস করতে চেয়েও তিনি-যে বিশ্বাস করতে পারছেন না, এটাই প্রমাণ অমৃতের জন্যে কী তৃষ্ণা তাঁকে অভিভূত ক'রে রেখেছিলো। 'আমারে ডরায় লোকে, জনসংঘ বিভীষিকা মোর', 'তবু বিশ্বমানবেরে একমাত্র সত্য ব'লে জানি'—আর এই বিশ্বমানবকে ভালোবাসার পথে আধুনিক মানুষের সুমুখে যে-সব বাধাবিঘ্ন মাথা তুলে

দাঁড়ায়, তিনি তার দ্বারাই কবলিত হয়েছিলেন, জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করছিলেন ঐ যুগের মতোই। আসলে হয়তো কবির জন্যে কোনো মধ্যপন্থা নেই। সাধারণ লোকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই করে না: শুধু একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাসের অখণ্ড মণ্ডলে জীবনভোর ভ্রমণ করেন, কি একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তিলতম, তুঙ্গতম অবিশ্বাসে ভ'রে ওঠেন। হয়তো আস্তিক আর নাস্তিক দুই উল্টো পথে একই শুদ্ধতম সত্যের দিকে অগ্রসর হ'য়ে যান, আর সেই হিসেবে আস্তিক ও নাস্তিকের দূরত্ব, সাধারণের সঙ্গে আস্তিক-নাস্তিকের দূরত্বের চেয়ে, অনেক কম। তাহ'লে কি অনিবার্য ও মরীয়া সূত্রটি এই যে, কবি হ'লেই ঐ দুইএর একটিকে আঁকড়ে ধরতে হবে, ভিতু, মধ্যবিত্ত, মধ্যপন্থা কবির চলবে না? কিন্তু এই দুইএর একটিকে যিনি বরণ ক'রে নিতে পারেন, তিনিই তো বীর, সন্ত, অসাধারণ;—কেননা, তাহ'লেই দুঃখ, সাধারণের একজন না-হ'লেই বেদনার পথ খুলে যায়, আর কেউ-কেউ স্বেচ্ছায় সেই পথ বেছে নেন ব'লেই তো যুগে-যুগে শিল্পীর জন্ম হয়। তাহ'লে, এতোক্ষণে এটি স্পষ্ট যে, এই অবিশ্বাসীর গভীর শততলে বাস ক'রে গেছেন এক ভাবুক, ঈশ্বরতৃষিত ও মরমী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আর এইদিক থেকে দেখতে গেলে, এই দুজন, রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ, পরস্পরের প্রতি পিঠ ফিরিয়েও, পাত্র ভ'রে তারই সাধনা ক'রে গেছেন, উপনিষদ যাকে বলেছেন 'অমৃত' বা 'আনন্দ'। ঐ সাধনার পথে প্রাথমিক যে-সব নখদন্তময় আকর্ষণ ও নম্য নিমন্ত্রণ তাঁর পথে বিঘ্ন হ'য়ে ছিলো, সুখের বিষয়, তারা তাঁর মুণ্ড ঘুরিয়ে দিতে পারেনি, পতিত হননি মৌনজ্ঞানে কি বস্তুগ্রাসে। কে জানে, হয়তো ওটা ছিলো তাঁর ছদ্মবেশ, যাদের জন্যে তাঁর বিদ্রোহ তাদের কাছেই এই আসুরিক স্পর্ধা পাগলামির নামান্তর ব'লে হয়তো ভিতরে-ভিতরে অভিমানী হ'য়ে উঠেছিলেন। আর, কে না জানে, যে-লোক মনে-মনে বিশ্বাস করতে চায়, তলে-তলে যুক্তিহীন ভুবন-ভাসানো ভালোবাসা দাবি করে, সে-ই অভিমানী হয়। আর, ঐ অভিমানই, ঐ চীৎকার ক'রে অবিশ্বাস ঘোষণা করতে গিয়েই ধরা প'ড়ে যান তিনি, ধরা প'ড়ে যান এমন একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাকে আমাদের চেনা, মনীষী, বহুভাষাবিদ, সৌম্য, যুক্তিবান, প্রাজ্ঞ ও সযত্ন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নামক ভদ্রলোকটির সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যাবে না। তাহ'লে তিনি, সুধীন্দ্রনাথ

দত্ত, বাংলা সাহিত্যে নৈরাশ্যবাদের প্রথম প্রবক্তা ?—হ্যাঁ, তাই ; একালের ভাষারহস্যের মহাকবি ?—হ্যাঁ, তাই ; এবং, সবার উপরে, রাজর্ষি ।।

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জন্ম, ১৯০১। কাব্য : তন্বী, ১৯৩০ ; অর্কেস্ট্রা, ১৯৩৫ ; ক্রন্দসী, ১৯৩৭ ; উত্তরফাল্গুনী, ১৯৪০ ; সংবর্ত, ১৯৫৩ ; দশমী, ১৯৫৬। প্রবন্ধ : স্বগত, ১৩৪৫, ১৩৬৪ ; কুলায় ও কালপুরুষ, ১৩৬৪। মৃত্যু, ১৯৬০।

২. ১৩৫২ সালে লিখিত এক প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন : 'তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা।......আধুনিক সাহিত্যের প্রায় বারো আনা তথাকথিত প্রাগ্রসর কবিতার চেয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বেশি প্রবীণ ; তাঁর নিজের এষণার কবিতালোকে তিনি আধুনিক প্রায় সকল কবির চেয়েই বেশী আন্তরিক নন কি ?' ['উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য', "কবিতার কথা", জীবনানন্দ দাশ]

৩. নিয়তিচৈতন্যে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সমকালীন বাংলাদেশের একজন কথাসাহিত্যিক তুলনীয় ; তিনি জগদীশ গুপ্ত। এই জগদীশ গুপ্তেরই সাম্প্রতিক আলোকিত বংশধর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যেন সুধীন্দ্রনাথের ভঙ্গুর, ফোঁপরা ও শূন্যময় মনোভাব কথাসাহিত্যে অবিরল ও নিরন্তরভাবে রাষ্ট্র ক'রে চলেছেন।

৪. "তন্বী" প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তাঁর প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে। তার একটি কারণ—তাঁর কাব্য অনেকখানি রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে—নিয়েছে নিঃসঙ্কোচে—অথচ তাঁর প্রকৃতি সম্পূর্ণ তাঁর আপন। তাঁর স্বকীয়তা চেষ্টা মাত্র করেনি অনন্যত্বের স্পর্ধায় যথাস্থান থেকে প্রাপ্তি স্বীকার উপেক্ষা করতে। এই সাহস ক্ষমতারই সাহস।' ['কবিতা,' পৌষ ১৩৪২ ; বুদ্ধদেব বসুর "কালের পুতুলে" উদ্ধৃত]

৫. বুদ্ধিজীবী কবি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির প্রবেশ বরাবর অত্যন্ত সংকুচিত। মানব ও নিসর্গ : কবিতার এই দুই আবহমান প্রোজ্জ্বল স্তম্ভের মধ্যে প্রথমোক্তই-যে বিজয়-নিশান তুলবে আকাশে, তার সময় আসন্ন। ফ্রান্‌ৎস্‌ কাফ্‌কা-র গল্প-উপন্যাসে তো প্রকৃতির বর্ণনা নেই, কেননা এই গভীরতর কবিরও সন্ধানস্থল ছিলো নিজস্ব আত্মার উৎস ; এবং ঐ গুপ্ত ও বেগানা ফোয়ারার আশে-পাশে নিসর্গের চিহ্নমাত্র নেই ব'লে আমাদের মানতেই হয়। এটা আশা করা যায়, নূতন পৃথিবীর কবিদের মন থেকে এই কুসংস্কার উচ্ছিন্ন হয়েছে যে প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কবিতা সম্ভব নয়।

৬. সুখের বিষয়, তিরিশের সব বুদ্ধিপ্রধান লেখকই শেষপর্যন্ত হৃদয়ের পথেই আত্মার উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে পড়েছেন, কেননা মনীষার মিনারে শুধু ঝকঝকে বন্ধ্যাত্বের রাজ্য, তাই সারাজীবন বুদ্ধির চর্চা করলেও না সুধীন্দ্রনাথ না ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাকে সর্বাঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন। এতোদিনে এটা স্পষ্ট যে,

রবীন্দ্রনাথই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিপ্রধান লেখক—অবশ্য উল্টোদিকেও রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র প্রতাপ—এবং তিরিশের মননজীবী লেখককুল তাঁর কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়েছিলেন ব'লে ঠিক রাস্তাটি বেছে নিতে অসুবিধা পোহাননি।

৭. ১৯৫৬ সালে সুধীন্দ্রনাথ এক বিজয়ী মুহূর্তে লিখেছিলেন: 'দিনে দিনে নিজেকে যত চিনছি, তত বুঝছি যে সংসার আমার বৈরী নয়, বহির্জগৎ সুন্দর ও অতিথিবৎসল।' ['পুনশ্চ', "স্বগত" : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

৮. এ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য: 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অভিষ্ট: আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী–বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক, শব্দও আচরণীয় কিনা, সে অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কোনও কবিতায় রয়েছে; এবং শব্দ ও ছন্দ উভয়ই যেহেতু পরজীবী, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন।' ['মুখবন্ধ', "সংবর্ত": সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

৯. তবে লিয়োনিদ-এর ব্যাপারে একটা মজার সন্দেহ আমাদের মনে উঁকি মারে। প্রথম জীবনে সম্পাদক-কর্তৃক লেখা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, এবং একবারও সফলকাম হননি। এখন আমাদের মনে হয়, এতোবার চেষ্টা ক'রেও তিনি একবারও সার্থকভাবে আত্মহত্যা করতে পারলেন না কেন? কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চায়, তাহ'লে সেটা ভালোভাবে করা উচিত নয় কি? একবার ধরা পড়লেও বারবার ধরা পড়েন কি ক'রে? সত্যি-সত্যি তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন তো?

শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ

১

কবিতা বিষয়ক প্রচ্ছন্ন কি প্রকাশ্য যে-কোনো প্রস্তাব কিংবা দূরবাণী বস্তুত নমনীয় ও ক্ষণভঙ্গুর ঃ ছক-কাটা অন্তর্গত টেবিল সামান্য হেরফেরে উল্টে প'ড়ে অত্যুৎসাহীর চোখেমুখে সাহিত্যস্বাধীন কালি ঢেলে দিতে পারে। তত্রাচ, ঐ ঘনঘোর প্রস্তাব কিংবা দূরবাণীর সার্থকতা এইখানে যে, তার একটিমাত্র লাইনও সাহিত্যব্যবসায়ীর বিপন্ন বিস্ময়ে কোনো-একদিন জ্বেলে দিতে পারে নির্মল আগুন, কিংবা কিছুক্ষণিক পথ্য জোগাতে পারে ন্যূনপক্ষে। আর, এমনও বলা চলে না যে দূরবাণীর সমস্তই ব্যর্থতার হাঁ-করা ক্ষুধার আহার্য হবে ; তা যেতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎজীবীর বাক্যে ; এবং সাহিত্যের নেপথ্যে স্থায়িত্বের পাথেয় লুকোনো থাকে। কিংবা প্রস্তাবও সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতা বরণ করতে পারে না—যেমন তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যও অসম্ভব—কেননা সগসময়ের সম্মতির পটেই তা রচিত হয় ;—এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্যও অসম্ভব এইজন্যে যে, সাহিত্য ভবিষ্যৎ-বক্তার কি প্রস্তাবকের কোনো পরোয়া করে না, তার নিজের মধ্যেই ঘনিয়ে আছে ঘোর অগ্রসরণের কড়াক্রান্তি ও বেগ। সাহিত্য স্বাধীন, অর্থাৎ শুধু নিজের অধীন, সর্বাংশে কোনো প্রস্তাব কিংবা দূরবাণীর ছাঁচে গ'ড়ে ওঠা তার পক্ষে মৃত্যুর শামিল, সম্ভাব্যতার পরপারে ও চিন্তার অতীত—আর যদি-বা সম্ভব হয় বুঝবো তার মধ্যে প্রাণের অভাব আছে, কেননা যান্ত্রিকতা সচল বটে কিন্তু প্রাণবান নয়, এবং প্রতিভা-যে কোনোদিন কোনো নিয়ম মানে না, এটাই তার প্রধানতম নিয়ম। আসলে অব্যবসায়ীদের অধিকার কেবলমাত্র চক্রবর্তী, রক্তহীন, কাব্যহীন অনুবর্তনে, ভীষণ সুসমাচার চিরকাল প্রেরিত একজন-দুজনের কাছে পৌঁছোয় ঃ অথবা যাঁরা অনির্বচনীয় খাটুনিতে উপার্জন করেন তার দাম পূর্বাহ্নেই তাঁদের নিকট অধিবাস করে।

২

কখনো ভাবি, আত্মতাড়িত কবিতা এখন পরোক্ষে। স্বপ্ন, নির্মাণ ও পরিকল্পনার মধ্যে হেঁকে যায় বিচ্ছেদ, বিকর্ষণ ও দ্বিধাপন্নতা; অকুল, চতুর, কুহকী ও নম্য মনোবিন্যাসের মর্মে প্রবেশের দৃঢ় চেষ্টার লাঙল অনায়াসে শস্যের বিপক্ষে থাকে: কম্পমান অগ্রসরমান কবিতার রাজ্যে সম্ভাবনার সমস্ত ছোটো-বড়ো আসন এখন বিজিত ও অধিকৃত: নিসর্গ ও মানব—কবিতার এই দুই পরিচিত পুরোনো মূর্তি আমরা কিনে নিয়েছি ইতিহাসচৈতন্যের সমগ্র দাম ক'ষে। অর্থাৎ, শিক্ষা ও জিজ্ঞাসা, জ্ঞানের তৃষ্ণা ও গেলাশ, সব আমাদের পরিচিত; চক্ষুকোণে নূতন কোনো সত্য—এমনকি পিঁচুটির মতো সত্য ফোটে না; অনাক্রমণীয় দেশবিদেশ নেই। তাহ'লে কবিতা কী করে? পুণ্যবিদ্ধ ও শান্তিলোভী সমগ্র প্রকাশ্য ও অন্তর্গত ইতিহাসভূমি স্পষ্ট না-হোক, অন্তত পঠিত, কবিতা এখন কোন পথে ছোটে? নম্যতমা কবিতা পুরোনো 'ভাবে'ই যাতায়াত করবে, কাছের পুরোনো নয় দূরের পুরোনোর নূতন নিমন্ত্রণে ও আক্রমণে ফ'লে উঠবে, না কি টেকনিকের আপাতরমণে মীমাংসা নেবে খুঁজে? আর, সবচেয়ে বড়ো কথা: বৈদেহী কবিতা, যার জন্মউৎস স্বভাবের গভীরতল, সে কি চতুর, কুশলী ও বদমাশ মানুষের মতো কোন-কোন সাম্রাজ্য জয় হয়েছে, জেনে নিয়ে নামবে তরুণ আক্রমে? কবিতা যদি স্বভাবের নিসর্গের গভীর গভীরতর শততল থেকে উৎসারিত হয়, তাহ'লে ঐ পূর্বাপরময় জ্ঞান কোন কাজে লাগে?—আধুনিক জাগ্রত কবির সম্মুখে এইসব প্রাথমিক বিপদআপদ নখদন্তে উদ্যত।

নূতন ও বলীয়ান একটি উত্তর আমাদের অগত্যাপরবশ তৈরি ক'রে নিতে হবে সময়ের মানদণ্ডে। কবির নিকট উজ্জ্বল পক্ষের অধিবাস আজ গেছে ফুরিয়ে, কবিমাত্রই মূলত স্বভাবকবি হ'লেও বিশুদ্ধ স্বভাব-সেবাব্রতের দিন ইতিমধ্যেই বিগত: নিরন্ত এখন কবি হ'তে হয় অনন্য, নিরুপায়, কৃত্রিম উপায়ে। স্বেচ্ছান্ধ অস্পষ্টতা থেকে একটি সত্য আমাদের ছেঁকে নিতে হবে তৃতীয় রাস্তার মতো: কবিবংশে চক্রবর্তী, নিরঞ্জন, অমিয় অভ্যাসের চাপে একালে 'জ্ঞান' হয়েছে 'অনুভূতি'। যেমন আমরা সাবালক হ'লে আমাদের অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতি লুপ্তিবরণ করে, আবার স্বভাব অনেক নূতন তারও চড়িয়ে দ্যায়, তেমনি ইদানীন্তন কবিতার 'অনুভূতি' আমাদের বাধা বা শায় দেয়ার অপেক্ষা না-রেখেই ধর্মপথ ছেড়ে গেছে,

চেষ্টাও অপচেষ্টা ব'লেই মনে করি; কেননা, গল্প তার সমস্ত কলাকৌশল নিয়েও শেষপর্যন্ত গল্প এবং কবিতা তার সমস্ত কলাকৌশল নিয়েও শেষপর্যন্ত কবিতা; যে কোনো গল্পরচনায় (কবিতার কথা পরে বলছি) বক্তব্যটিকে আমরা প্রধান ব'লে মনে করি: প্রবন্ধে চাই যুক্তিময় স্পর্শসহ পরস্পর বক্তব্য, কথাসাহিত্যে চাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্যোন্যশ্লিষ্ট কাহিনী—'তথাকথিত বাস্তব' না-হ'লে ক্ষতি নেই কোনো। গল্প ও কবিতা—এই দুজনকে মেলাবার চেষ্টা আধুনিক সাহিত্যে বারবার দেখা গেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত এদের চরিত্র যে আলাদা এবং এরা-যে দুই আলাদা 'ভাবে'র বাহন এ বিষয়ে সচেষ্ট লেখকেরা নীলিমাক্রান্তির আগেই তা বুঝেছেন।

প্রসঙ্গত, গল্পের ধরনে সজ্জিত একরকম কবিতা আছে, তার আলোচনা করা যেতে পারে; সাধারণ, এমনকি কবিত্বময় গল্পের থেকে, তার প্রভেদ দৃষ্টি-ও-শ্রুতির অধিকারী কবিতার অভিজ্ঞ পাঠক অনায়াসে ধরতে পারেন। কোনো গল্পরচনার উপর 'কবিতা' এই ছাপ মেরে দিলেই তা কবিতা হ'য়ে যায় না; যে কোনো কবিতা লিখতে হ'লে—এমনকি গল্পাকারে সজ্জিত কবিতাও—আগে হ'তে হবে ছন্দ, মিল, ধ্বনি, অনুষঙ্গ, প্রতিষঙ্গ ও অভিঘাতের কুশল জাদুকর, কবির গুণগুলি যে-কোনো অবস্থায়ই আয় ক'রে না নিলে কাজ চলে না; তা না হ'লে ছন্দমিলধারী অধিকাংশ রচনাই যেমন 'পদ্য' বা অকবিতায় অধঃপতিত হয়, তেমনি গল্পাকারে রচিত কবিতাকাঙ্ক্ষী রচনাও পর্যবসিত হবে নিছক গল্পে—কিংবা তাও নয়, গল্পেরও তো একটি চরিত্রপ্রকৃতি আছে, শক্ত মেরুদাঁড়ার অভাবে নির্বোধ পরম্পরাহীন শব্দের সংকলন হয় শুধু। কাজেই গদ্য ও পদ্যের মধ্যে কোনো-এক জায়গায়-যে অহংকৃত দেয়াল তোলা আছে, যার জন্যেই তাদের ভিন্ন নামকরণের দরকার হয়েছিলো—একথা আমরা না মেনে পার পাবো না;—এবং এতোক্ষণ ধ'রে আমি যা বলেছি তাতে একথা নিস্পষ্ট যে এই বিরোধ আকৃতিগত নয়, প্রকৃতিগত। 'গল্প পদ্যের মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ আজ অবধি আমি ধরতে পারিনি'—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তি, কোনো-এক দিক থেকে সত্য হ'লেও, এই কোণ থেকে তাই নিরর্থক ঠ্যাকে।

৪

'জীবন'কে যারা শততলে আচ্ছাভাবে স্পর্শ ক'রে থাকে, তারাই ভালো কবিতা লিখবে এরকম কোনো আইন চলবে না (কবিতা বিষয়ে কোন আইনই বা সর্বাঙ্গে সম্ভবঃ দেশপ্রেম বা সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রনীতি বা ধর্মপ্রচার এসবে কিছু যায় আসে না, কবিতা কবিতা), আইন চলবে না তার

অন্তিম শাশ্বত কারণ : স্বপ্ন সত্যি বা বাস্তব সত্যি কিংবা স্বপ্নই বাস্তব বা বাস্তবই স্বপ্ন—কে দেবতা নির্ধারণ করবে? শুধু কেউ-কেউ ক্ষণপ্রাণ বস্তুর মলিন ছদ্মবেশ আর ভঙ্গুর স্বপ্নের রঙিন মুখোশ টান মেরে খুলে ফেলতে চায়,—হয়তো তাদের মধ্যেই তিমিরবিদারী রহস্যময়ী কবিদৃষ্টি আছেন লুকিয়ে। এসব বিষয়ে স্পষ্ট কোনো লোকপ্রত্যক্ষ উপসংহার টানা চলে না : একথা সকলেই জানেন, তবু এখানেই স্মরণ করিয়ে দেয়া ভালো : নীলিমাকে হাতের মুঠোয় কেউ পেড়ে আনতে পারে না, কাব্যমীমাংসা আসলে একটি অসম্ভব দরোজা, যার চাবি কোন সরোবরে বা কৌটোয় লুক্কায়িত তা কেউ জানে না, অবশ্য ভিতরে প্রবেশের তৃতীয় একটি রাস্তা আছে : তা কেবল রসিয়ে-ওঠা পাঠকের জানা, কিংবা অন্য একজন কবির—যার বলে তিনি ঠিক অশরীর কবিতা সীমাসন্ধি-শুদ্ধ অনুধাবন করতে না-পারলেও এক-মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারেন : কোনটা কবিতা আর কোনটা অকবিতা। আধুনিক অনেক কবিই পরস্পরের রচনাও যথার্থ উপলব্ধি করতে পারেন না, কিন্তু সেটা মোটেই দোষের নয়, সেটাই অনিবার্য : রচনা 'বুঝে' উঠতে না-পারলেও তিনি ঠিক ধরতে পারেন কোন কবিতায় ভরা আছে অকায় অশরীর, আর ঐখানেও তাঁর শক্তির পরিমাপ হয় : তথাকথিত সমালোচকের চেয়ে কবির যে-কোনো সমালোচনা—তা হ'তে পারে মৌখিক, কথাচ্ছলে অলসভাবে হঠাৎ-রচিত বা গ্রন্থলব্ধ বিদ্যার বাইরে—কবির সমালোচনা অনেক উপরে উঠে যায়, কিংবা, বলা চলে, শতচূর্ণ বস্তুর বৈদেহী অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে দপদপে হৃৎপিণ্ড ছোঁয় হিরের ছুরির মতো, অর্ধছাগ সমস্যাগুলিকে এমুড়ো-ওমুড়ো কাটে।

কবিতার দুর্বোধ্যতার সুযোগ নিচ্ছে একালের অকবিরা, কাজেই আজ 'সততা' কবির গুণের অবশ্যঅংশ হ'য়ে উঠেছে। এই সততা বলতে কী বোঝায় তার বিশদ ব্যাখ্যা দিই। শিল্পীর সততা কিন্তু সাধারণের আদর্শিক ও অতিকৃত সততা থেকে ভিন্ন (একেবারে নীলিমা-পাতালের ক্রোশ-ক্রোশ ব্যবধান হয়তো নয়, কেননা আমি মনে করি : যথার্থ কবিকে কোনো-না-কোনো দিক থেকে নিরন্তর 'আদর্শবাদী' হ'তেই হবে;—এই 'আদর্শ' মানে লক্ষ্যের মহত্ত্ব ও উচ্চতা নয়, লক্ষ্যের একলব্য : পুনর্নির্মাণের পুনর্গ্রহণের নবতর, এমনকি উল্টো কিন্তু ফের ভাস্বর উদ্ধৃত 'একলব্য') একজন শিল্পী

বদমাশ-লোক হতে পারেন, হ'তে পারেন সংকীর্ণমনা (হয়তো সংকীর্ণমনা হওয়াই সংগীতকারের পক্ষে জরুরি ; আমার পূর্বোক্তি একথার বৈপরীত্য সাধছে না : 'আদর্শবাদী' মাত্রেই শেষপর্যন্ত সংকীর্ণমনা), একজন শিল্পী ব্যক্তিজীবনে পরিপক্ক ফাঁকিবাজ হ'তেও পারেন ;—কিন্তু তিনি হবেন অতিসচেতন, আসলে অতিসচেতনাই কবির সততা : নিজে কী করছেন ও তার প্রতিক্রিয়া কী সে সম্বন্ধে নিজস্ব অগুপ্ত আয়না থাকবে তার, নিজের সৃষ্টির প্রতি অক্ষরে-অক্ষরে সৎ থাকবেন তিনি, অবচৈতন্যের সততাও এর অন্তর্ভুক্ত, - আর এই কাজে একজন চেতনশিল্পী মোটেই বিঘ্নের সম্মুখীন হন না, কারণ লেখায় ফাঁকি দিয়েছেন কিনা সেটা কবির কাছেই প্রথম ধরা পড়ে।

স্বকীয় সৃষ্টির প্রতি আক্ষরিক 'সৎ' থাকতে হবে ব'লে-যে রচনা-মাত্রই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের ফাটলে 'অকৃত্রিম' হবে এবং পথপার্শ্বের খানা-ডোবায় পা পড়লেই অপ্সরী তার নীবীবন্ধ খশিয়ে আদ্যন্ত তলিয়ে যাবে, আমি এমন প্রচলনির্ভর কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মজালিয়াতিময় কথা বলতে চাই না। আসলে শিল্প তো জন্মপত্রেই কৃত্রিম, আদ্যন্ত কৃত্রিম, ফোলানো-ফাঁপানোর অতিকৃত অথচ নির্বিকার পরাকাষ্ঠা ; ছোটো শিল্পীর কৃত্রিমতা ধরা প'ড়ে যায় সামান্যচেতন পাঠকের হাতে ; বড়ো শিল্পীর লক্ষণই হ'লো, তিনি অন্তত কখনো কখনো অকৃত্রিমতার অভিনয় করতে পারেন, এবং সে-অলজ্জ অভিনয়ে এমন পারদর্শিতার সহিত উৎরে যান যে আমরা চাতুরী ও কুশলতা টের পাই না ;—তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই : মাধুরী বাঁকা ফুটো করা খেজুর গাছের দেহ থেকে চৈতন্যের সারারাত ধ'রে শৈশবের ভুলে যাওয়া আধো-আলো-জলা কলস ভরায় ঝ'রে-পড়া লুকোনো আদ্রর্তম আশরফির ভারে ভারে। বড়ো শিল্পী হচ্ছেন বড়ো ফাঁকিবাজ।

তথাচ, আমি এমন কথা মানি না : জীবনে যারা 'পাপী', কবিতায়—যদি কবিতা লেখে—তাদের সম্ভাবনা বেশি ; আমি বুঝি না : শিল্পের উপদ্রবউপভোগ কোন সময়ে হবে তাদের। কবি যদি পাপকর্ম করতে চান তাহ'লে শব্দের সঙ্গেই করা ভালো ; এ-বিষয়ে যিনি যতো আত্মতাড়িত ও অবাস্তবপীড়িত, ততো বড়ো। এলোমেলো আক্রমণ নয়, বীথি-করা মৌল আক্রমণ, আবেগের ভার ঝরিয়ে মৌল

উচ্চারণ, অন্তর্বিপ্লবের অর্ধচেতন বিশ্লেষণ, উন্মোচন, নিষ্কাশন। শব্দের পাপের সঙ্গে মেলাতে হয় কম্পমান অগ্রসরমান ভাবনা বেদনা; কেননা কেবল শব্দবিন্যাস অকবিতা, বিষয়ের উৎসঙ্গে অনিবার্য শব্দস্থাপনই অনিবার্য কবিতার জন্ম দিয়ে যায়, তা নাহ'লে শূন্য ও ভঙ্গুর পণ্য সৃষ্টি হয় মাত্র।

কবি সহবাসনিষিদ্ধ শব্দের সঙ্গমে পুরোহিত। কবিতার সবচেয়ে বড়ো উপকরণঃ শব্দ; কবিতার প্রত্যেকটি বিশিষ্ট স্থানের জন্য ত্রিলোকে যথাযথ একএকটি—একটিমাত্র—শব্দ আছে;—কবি ঐ শব্দটি মগজ থেকে মুঠোয় নির্বাচন করেন স্বর্গ থেকে; ঐ একটিমাত্র শব্দের পরিবর্তন, রূপান্তর বা অনুবাদ হয় না। অভিধানে একই শব্দের অনেক প্রতিশব্দ পাওয়া যায়; গদ্যে হয়তো একটির বদলে অন্য যে-কোনো একটি শব্দ বসিয়ে দিলে কাজ চ'লে যায়, সেখানে পাঠকের 'লক্ষ্য' থাকে 'অর্থে'র দিকে, 'অর্থ' মনের মধ্যে প্রতিভাত হ'লেই পাঠক এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, ভালো কবিতায় একএকটি নির্দিষ্ট স্থানের একএকটি নির্দিষ্ট শব্দ থাকে, ভালো কবি অবচৈতন্যের নৌকোয় চ'ড়ে ঐ শব্দটি ব'য়ে আনেন, কিন্তু অপরের পক্ষে তা সম্ভাব্যের পরপারে। কোনো-একটি শব্দের সকল প্রতিশব্দ ও তাদের বিভিন্ন বিচিত্র ব্যবহারও কণ্ঠস্থ থাকতে পারে বিদ্বান ব্যক্তির, কিন্তু কোন-বিশেষ স্থানে কোন-বিশেষ শব্দটি যোজনা করতে হবে, এবং তাহ'লে—তাহ'লেই কবিতার অভিজ্ঞ পাঠক তীরবিদ্ধ হবেন একথা তার জানার কথা নয়; কেননা চৈতন্য দিয়ে তিনি যা খুঁজছেন, ইন্দ্রিয়পারের বোধ দিয়ে কবি তা পেড়ে আনেন, তারও কারণ এই যে কবিতায় শিক্ষা, বিজ্ঞান বা দর্শন কোনোদিন প্রত্যক্ষ মর্মবাণীতে কাজ করে না। প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে না, কিন্তু কবিতার আড়ালে শিক্ষা, বিজ্ঞান বা দর্শন শিরার মতো অনুলাপে লুকিয়ে থাকে, টান ক'রে রাখে, থাকে ইশারার কঙ্কজার মতো অশরীরীভাবে। অবচৈতন্যের নৌকোয় চ'ড়ে কোনো-একটি নির্দিষ্ট শব্দ, কোনো-একটি 'প্রেরিত' শব্দ আনতে হয়তো শিক্ষা, বিজ্ঞান বা দর্শন বড়োজোর দাঁড়ের মতো কি পালের মতো কাজ করে, কিন্তু অবচেতন ঐ মাতাল নৌকোয় লুকোনো অর্ধপাগল কিন্তু আশ্চর্য কর্মপটু অধ্যক্ষ।

যে-কোনো শব্দই ডেকে আনতে পারেন কবি, কিন্তু এই আহ্বান হবে ঘোষকের মতো কি কর্মীর মতো নয়, হবে কবির মতো, এ বিষয়ে একমাত্র নির্দেশ দিতে পারেন কবিচৈতন্য, আর-কেউ নয়। গদ্যের কথা এই মুহূর্তে

অপ্রাসঙ্গিক, তবে কবিতায় কোনো শব্দই পুরোনো বা অব্যবহার্য হ'য়ে যায় না, যাকে আমরা 'পুরোনো' বা 'অব্যবহার্য' শব্দ বলি তাও সময়- ও ক্ষেত্র-বিশেষে কাজে লাগে। সেজন্যে যাঁরা মনে করেন চলতি কথা ও বুলিই সাহিত্যের—আধুনিক সাহিত্যের অপরিহার্য ও বিশস্তর বাহন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। উদাহরণত, কথায় আমরা 'গাছ' শব্দ ছাড়া অন্যকোনো প্রতিশব্দ ব্যবহারই করি না; কিন্তু কবিতায় তার যে-কোনো প্রতিশব্দ—অবশ্য সময় ও ক্ষেত্র-বিশেষে ব্যবহার করা চলবে না, একথা তো বলা অসম্ভব। তিরিশচেতন কবিরা অনেক শব্দ দরোজা থেকে ঘাড়ে ধ'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কখনো জোর ক'রে ফিরিয়ে, তন্মুহূর্তে দরকার ছিলো তার,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সমকালীন সমতল পার্থক্যরহিত কবিপ্রবাহের কবল থেকে আবহমান বাংলা কবিতাকে বাঁধ বেঁধে বাঁচাবার জন্যে তার তৎকালীন গদ্গদ সহযোগ ও দৌত্য ছিলো অবশ্যস্বীকার্য। বর্তমান মুহূর্তের কবিরা ঐসব তাড়িয়ে-দেয়া ভাগিয়ে-দেয়া করুণ রঙিন শব্দাবলিকে ফের ডেকে এনে ভোজে বসাতে পারেন। বস্তুত শব্দবিদায়ের কাজে তিরিশচেতন কবিদেরও পূর্ণ সার্থকতা ফলেনি, আর ফলেনি ব'লেই তাদের খাঁটিত্ব স্বয়ংপ্রকাশ, কেননা ঘোষিত কানুনের সঙ্গে কোনো শিল্পীই খাপে-খোপে মিলে যেতে পারেন না নিজস্ব মাশুল ঘুচিয়ে।

শব্দের পাপ বাঙালি কবিতার এই সময়ের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি ব'লে মনে হয়। তবে, একথা ভুলে যাওয়া অপরাধ যে, যে-কোনো সময়ে একজন কবিকে প্রথমে 'কবি' হ'তে হবে,—এবং এটাই প্রথম ও শেষ কথা। কবি—একমাত্র কবির জন্যেই মধ্যপন্থা নেই, যেতে হবে সকলের মধ্যে পথ ক'রে; একমাত্র কবিই চান সর্বাংশে ভালো হ'তে কি সর্বাংশে মন্দ হ'তে; যে একই সঙ্গে নিজেকে ঈশ্বরের উপর ঈশ্বর ও কুকুরের অধিক কুকুর ব'লে অনুভব না করবে, তার পক্ষে কবিতা রচনার বৃথা চেষ্টায় সময় হত্যা করবার কোনো দরকার নেই। স্পন্দমান অতিওয়ারিশ শিশ্নের হরষে ও ভুঙ্গ নিলোচনে যিনি বারেবারে মুগ্ধ হননি, তার পক্ষে এই শনির সময়ে কবিতা রচনা অসাধ্য ব'লে মনে করি। বিদ্যালয়ে 'sensual' ও 'sensuous' এই দুই শব্দের ভিন্নার্থ বালকেরা প্রাণপণে কণ্ঠস্থ করে; কিন্তু কবিতাসৃষ্টির গভীরতলে এরা একই স্বপ্নখানির

পদদ্বয়, একই জন্মউৎস এদের, অন্তত কোনো-কোনো কবির রচনায় এরা একই পরিপূর্ণিমায় লয় পায়, ফ'লে ওঠে সকল বিদ্রূপ-ভরা ব্যবধান নুইয়ে ও উড়িয়ে পাতার ফাঁকে-ফাঁকে নীলারুণ, স্ফুট, পরিপক্ক ফল। চিৎপুরে লাল-নীল-সবুজ তমসা ও আভা, পরিবর্তমান কম্পমান অগ্রসরমান, কখনো বুদ্ধির তলে, কভু বুদ্ধির বিজয়ে, হৃদয়ের টেলিফোনে কি বালুচরে, অলিভ বৃক্ষের শিরে রাঙা পাখি আর নাগলতা, তীব্র নিরর্থক বাতাস, উল্লাস, গ্লানির লাল গর্ত, পূর্বাপরময় বাঁকা নামহীন, যুক্তিহীন, বসনভূষণহীন মহাসাগর, চিৎপুরের অলিগলি।

কেউ-কেউ গোপন স্মরণ থেকে কিছুতেই নিস্তার পায় না—স্বপ্নে না, তন্দ্রায় না, জাগরণে না; টাকার, খ্যাতির, জ্ঞানের, নেশার, মেয়েমানুষের, ঘৃণার, ভালোবাসার,—কারো পিছনে ছুটেও সেই নিরন্তর, ভীষণ, পবিত্র, সুন্দর, নিষ্ঠুর, গোপন স্মরণ থেকে কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারে না—কবি হওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যেই বেশি; কবি—একাধারে জন্মান্ধ ও শতচক্ষু, চূর্ণ-চূর্ণ টেনশনের জন্মদাতা ও সন্তান, কশাইয়ের দোকানের বাঁকা চোখা শিকে ঝোলানো মাংসপিণ্ড ও মারাত্মক ছুরি, একদেশদর্শী ও সর্বদৃষ্টিময়, মমতায় মাতা ও নিষ্ঠুরতায় জল্লাদ, বিদ্যুৎবিদ্ধ কিশোরের মজ্জায় ও পরিপক্ক বৃদ্ধের বিমর্ষ গাম্ভীর্যে ভরা—একই সঙ্গে হাজাররকম বৈপরীত্যের ধারক। জনতার প্রতি কবি পবিত্র ঘৃণায় তীক্ষ্ণ, আবার মনে-মনে তিনিই জনতার প্রতি সবচেয়ে করুণাময়ঃ 'আমি তোমাদের ঈশ্বরের মতো ভালোবাসি বটে, কিন্তু আমার ধারে-কাছে এসো না হে, তোমাদের সঙ্গ সহ্য করবার ক্ষমতা আমাকে বিশ্বনাথ দ্যাননি। ওগো সমীচীন মানব, দূরে-দূরে থাকো, যদি আমার সর্বচরাচরগ্রাসী ভালোবাসাসংকাশ হারাতে না-চাও।'

৫

কবি, সকলের মতোই, সময়শাসিত। এক, দেড় কি বড়োজোর দু দশকে কবিতার প্রাক্তন ভাষা ছিন্ন হ'য়ে কিংবা ঈষৎ বদলে নূতন আকার ধারণ করে, নূতন কান্তি ও স্থাপনা; বিশেষ-কোনো সময়পুরুষের অন্তর্গত ছোটো-বড়ো সকল কবির ভাষাব্যবহারে একটি লক্ষণীয় সাদৃশ্য বিরাজ করে। বড়ো কবি ঐ ভাষারীতির ভিতরে স্বকীয় ভাষাচারিত্র্য ঢুকিয়ে ভাবনা, বেদনা ও লেখনীর আশ্চর্য সন্নিপাত ঘটান, সংযুক্ত ঐতিহ্যের সুবিধায়; আবার তার মধ্যেই প্রাক্তন ও সাধারণের অভিধান ছুঁড়ে ফেলে স্বরচিত

ও অন্যতন অভিধান কুড়িয়ে নেন : অভিধান— নিজস্ব শব্দ, ছন্দ, ধ্বনি, জ্ঞান, অনুভব, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ইত্যাদির সম্পূর্ণ নির্মাণে প্রত্যেকটি কবি একএকটি স্বতন্ত্র নিজস্ব অভিধানের রচয়িতা ; সেজন্যেই একই শব্দ দুজন কবির করতলে ভিন্ন অর্থের জন্ম দ্যায়, এমনকি সমারূঢ় পঙ্‌ক্তির একই ছন্দ দুজন কবির হাতে বিভিন্ন ছন্দের আকার নেয়, এবং সেখানেও কবিত্বের একটি নির্বচন অলক্ষ্য পরিমাপ দাঁড় করানো। এই শেষোক্তির উদাহরণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বলাকা"র ছন্দ ও জীবনানন্দ দাশের অধিকাংশ কবিতার ছন্দ ছান্দসিকের মানদণ্ডে এক, অথচ গভীরতর কবিতা-সমালোচকের চোখে নীলিমা থেকে পাতাল পর্যন্ত ব্যবধান জেগে আছে। গদ্যে শব্দার্থ পরিবর্তন-ভীরু ; একই অভিধানের নিচে চিরন্তনের ফসল মুড়িয়ে চলে ; তারও অবশ্য কোনো কোনো শব্দ ছিটকে পড়ে বিস্মরণে, ভঙ্গি যায় পাল্টে, যাকে বলা হয় 'গদ্যরীতি' তার মুখচ্ছবি বদলে যায়। পক্ষান্তরে, কবিতায় এই পরিবর্তন অতিক্রত, বিকাশ নিপট অন্তঃশীল, রীতি একেবারেই অনন্য। সাহিত্য, শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে পেছিয়ে আছে, এই মর্মান্তিক সত্যের বিরুদ্ধে একা কবিতা ঘাড় তুলে দাঁড়াতে পারে : কেননা কবিতার সূত্রপাত যেমন সাহিত্যের জন্মমুহূর্তেই, তেম্নি তার গন্তব্যও কায়মনোবাক্যের বাইরে, বয়সে সে যেমন সকলের চেয়ে বড়ো, তেম্নি তারুণ্যেও সে সাহিত্যের বহুভিন্ন প্রকরণের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর, বলীয়ান ও নমনীয়।

আবেগের চাপে অধিকাংশ বাংলা কবি এখনো ভাসমান—অপোচ্ছ্বাসে, শব্দস্রাবে। সাহিত্যব্যাপারে আবেগের দাম আমিও মানি ; কিন্তু, অন্তত একফোঁটা বস্তু না-থাকলে কোনো রচনা-যে মোটেই টেকে না, মূলধন-শুদ্ধু অকাব্য উবে যায়—তার অসংকুচিত প্রমাণ মাসিকপত্রের ম্যুজিয়মে রাখা। এমনকি জানোয়ারবাক্যেও বস্তুসত্য সংবদ্ধ, একথাটি অধিকাংশ কবি ভুলে যান ব'লে ছোট্টো একফোঁটা বক্তব্যও থাকে না, এবং বক্তব্যহীন কবিতা—সাম্প্রতিক অতিবাক্যশীল গল্প-উপন্যাসও বটে—হিমের রজতপিণ্ড মাত্র। আধারপ্রধান দূরগামী গন্তব্যে এই প্রথম শর্তটি যেন আমরা না-ভুলি : আবেগ দামি জিনিশ, কেননা তার আভ্যন্তর বিশাল চাপে তার নির্দিষ্ট অথচ নিরুদ্দেশ যাত্রা, কিন্তু অপোচ্ছ্বাস একমাত্র কর্দমে গেড়ে যায় স্পষ্ট কোনো বক্তব্যের অভাবে অনাথ।—অবশ্য যে-কোনো রচনা প্রকাশের

নিকষেই বিচার্য : যেমন ধনী-বক্তব্য প্রকাশের অবমাননায় ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়, তেমনি সামান্য হ'য়ে ওঠে গরীয়ান তার যথাযথ বৈভবে ব্যবহারে। এখন, প্রাক্তন প্রকাশভঙ্গি, তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হ'য়েও, পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী ব'লে অনুভব করি ; কারণ, ব্যবহৃত হ'তে-হ'তে তার প্রাচীন মলিন আয়ত প্রবাহ নব্য মৌলিকতার জন্ম দিতে পারে না। বিশেষত, প্রতি যুগে বলবার কথা মানস-সরোবরে এমন-কিছু নূতন জমে না, পুরোনো সর্বপরিচিত খবর নিয়েই নব্য সাহিত্যের তুমুল বাণিজ্য জ'মে ওঠে, প্রকাশ-ভঙ্গির নবত্বেই তার মৌলিকতা রাষ্ট্র হয়। প্রায় একই বলবার কথাকে ঘিরে-ঘিরে চিরসময়ের ছোটো-বড়ো শিল্পীসকলের আপনাপন আক্রম।—বাংলা কবিতার এখন একটি মোড় ঘোরবার সুসময় উপস্থিত ; এবং তা কোন্ অব্যক্ত পথে তা একমাত্র প্রেরিত কবিই জানেন, কিংবা তাঁরও অজ্ঞাত,—আমরা শুধু বাইরে থেকে দু-একটি সম্ভাবনা উচ্চারণ করতে পারি মাত্র।

এখানে আমার একটি নিজস্ব ধারণার কথা-বলি : আমার মনে হয়, প্রায় প্রত্যেকটি কবি পূর্ণতায় যতোদিনে পৌঁছোন ততোদিনে তার মধ্যে তাঁর সাহিত্যের প্রায় আবহমান কবিতার ইতিহাস রচিত হ'য়ে যায়, অর্থাৎ কবির বৃদ্ধির ইতিহাস ঐ সাহিত্যের কবিতার কোনো-এক সময়াংশ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয়বাহী সূচিপত্র। অবশ্য, এই সংক্ষিপ্তি দ্রুত অতিক্রম ক'রে যখন নবতর নক্‌শা সৃষ্টি করতে পারেন কবি বিদ্যুৎক্ষমতায়, তখনই তাঁর সার্থকতার সূচনা ; এবং পদ্যলেখক বা অকবিরা উপর্যুক্ত ইতিহাসের কোনো-একটি অংশে স্ফুরিত হ'য়েই ফুরিয়ে যান। তা নাহ'লে, একথা কিছুতেই বলা চলে না যে, কবি ব'লে একজনের অনুভবশক্তি অপরের চেয়ে বেশি ; অকবি, ছোটো কবি বা বড়ো কবি : অনুভূতি সকলেরই একরকম হ'তে পারে, এমনকি অকবি বা কোনো-একজন সাধারণ মানুষের বেশি হ'তেও পারে, কিন্তু তা দিয়ে কবিত্ব রটে না—তাহ'লে 'নীরব কবি'র অস্তিত্ব এতোদিনে সম্ভব হ'তো—কবিতা বলতে যেহেতু একটি শরীরী ব্যাপার বোঝায়, অতএব, অনুভূতি বা তার রূপায়ণই কবিতা, এবং ঐ কাজে যিনি যতো কুশলী ও গভীর 'কবি' হওয়ার সম্ভাবনা তারই বেশি। কবি ব্যাপারটি যে শুধুমাত্র বায়বীয় অনুভব নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বরদত্ত সম্পদ নয়, উপরের উক্তির প্রমাণেই তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত। অনুভূতি-বিন্যাস হয়তো প্রকৃতির প্রভাবিত ; কিন্তু কবিতা

লিখতে হ'লে শুধু অনুভূতি কোনো কাজে আসে না, মননচর্চা ভিন্ন গত্যন্তর নেই, অন্তত মননের রূপদ খেয়ালই অনুভূতির মুক্তিদ্বার। অতঃপর এরকম সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হ'য়ে ওঠে: প্রাক্তনীরা যাই বলুন না কেন: কবিতা চিরকালই মননভূমির শস্য, বুদ্ধির সন্তান।

৬

আমি মনে করি 'কবিতার অনুবাদ' কথাটি সোনার পিত্তলমূর্তি মাত্র। সাহিত্যে অনুবাদ ব্যাপারটিই উচ্ছেদ করা আমার মনঃপূত, একথা আমি বলতে চাচ্ছি না; কেননা অনুবাদের অনেকরকম উপকারিতা আছে: বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়সাধন ও কোনো বিশেষ লেখকের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করা, ইত্যাদি, তার অন্যতম; গল্প নাটক উপন্যাসাদি —যাকে 'কথাসাহিত্য' নামে অভিহিত করা হয়—তার অনুবাদ সম্বন্ধে আমার কোনো আপত্তি নেই, কেননা সেখানে 'কাহিনী', চরিত্র, ঘটনা এমনকি মনস্তত্ত্ব, এবং এইসবের সারাৎসার কোনো একটি কথাই জরুরি; —আর, এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় বক্তব্যের যাতায়াত ও সঞ্চার অনায়াস, এবং কোনো গদ্যরচনায় কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, মনস্তত্ত্ব বা যুক্তিপরম্পরাময় বক্তব্যের পশ্চাদ্ধাবনেই আমাদের মন অন্ধের মতো উজ্জ্বলভাবে নিযুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে, কবিতায় বক্তব্যটিকেই প্রধান ও একমাত্র ব'লে মানতে আমি অক্ষম। শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প, ছন্দ, ধ্বনি, ভাব ও কল্পনার সহযোগে যে-অর্কেস্ট্রার মুগ্ধ জন্ম, তার অনুবাদ বা রূপান্তর অসম্ভব: হয়তো শব্দ (এবং তার শরীরজড়িত প্রধান দুই জাদুকর: রূপ ও ধ্বনি) বাদে অন্য উপচয়গুলির অনুবাদ সম্ভব; কিন্তু শব্দই তো কবির স্বর্গবিজয়ের অস্ত্র, 'আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ', এবং শব্দের রূপ, ধ্বনি ও অনুষঙ্গসহ মূল রচনা ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ সম্ভাব্যতার সন্ধিসীমার ওপারে;—এমনকি একই ভাষার কবিতায় একটি শব্দের বদলে অন্য একটি একই অর্থবোধক শব্দকে বসানো যায় না। এটাই প্রমাণ করে যে, কবিতার অনুবাদ প্রচেষ্টাটি কী পরিমাণে হঠকারিতা। একটি কবিতা পৃথিবীতে এক ভাষায় একবার মাত্র লিখিত হ'তে পারে।

তাহ'লেও এই গ্রন্থের অনেক কবিই মৌল রচনা ছেড়ে কখনো-কখনো অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাদের মধ্যে শক্তিমান অনেক কবিও

আছেন। এসকল অনুবাদ অনেক সময়ই বন্ধ্যা সময়ের ফসল, খেলাচ্ছলে রচিত, শৌখিনভাবে, তাতে শারদ-অভ্যাস বজায় থাকে এবং কখনো কখনো হারানো-ছড়ানো প্রেরণা হঠাৎ বিশ্বম্ভর জাগরণে বেলা অতিক্রম করে, ফের তীব্র দীপ্র ভেলা ভেসে যায়। (কবি বাদে অন্যান্য যারা কবিতার অনুবাদ করেন, তাঁদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলাই বাহুল্য: দীর্ঘদিনের অভ্যাসে যাঁর শব্দ ও ছন্দের উপর অধিকার জন্মায়নি, স্বকীয় কবিতায় যিনি বারবার সংগে স্থাননি নিজেকে তাঁর পক্ষে অসম্ভব অপরের কবিতার অনুসরণ: জীবন ও শিল্প দৃষ্টিতে এক কবির সঙ্গে অন্য-এক কবির যতো পার্থক্যই থাকুক যে-কোনো দুই কবিচিত্তের জন্মউৎস একই সমতলে—দুঃখের সুখে বা সুখের দুঃখে।—আরো: আমি এমন কথা বলছি না যে কোনো কবিতায় এক কণা বক্তব্য—যা জীবনদৃষ্টিরই প্রসাদ—থাকবে না; আসলে তা তো হ'তেই পারে না: যে কোনো বক্তব্যরহিত রচনা ভঙ্গুর ও শূন্যময়, এবং আজকালকার অধিকাংশ কবিতাই লুটিয়ে পড়ছে বক্তব্যের কঠিন মেরুদাঁড়ার অভাবে: বরফ-আগুনের অন্তর্স্রোত নেই, ক্ষুরধার চিন্তাপ্রণালী নেই, অনুভূত চাঞ্চবিলাস নেই, অর্থাৎ এক কথায়, হায় বক্তব্যও নেই। তবু, সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণ ও বিভাগগুলিতে বক্তব্যই যেমন প্রধান রাজপথ, কবিতায় কখনো তেমন নয়; আমার মনে হয়, কবিতায় অনুভূতিই মুখ্য মূলধন এবং সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণসকলে অভিজ্ঞতাই প্রোজ্জ্বল রাজধানী।) অনুবাদকাব্যে তখনই সোনার ফসল ফলে, যখন কবি আক্ষরিক রূপান্তরের প্রয়াসে পণ্ডশ্রম করেন না, যখন কোনো কবিকে শিকড়ের মতো অবলম্বন ক'রে বেজে ওঠে তাঁর স্বকীয় ভাবনানদী, অর্থাৎ একজনকে ভ্রাতৃসম দাঁড় করিয়ে কবি তাঁর কাজ ক'রে যান, 'তাঁর কাজ', অর্থাৎ তাঁর মৌলিকতা। অবশ্যই পণ্ডিত বা সমালোচকের সন্তুষ্টি এরকম অনুবাদে মেটে না, কেননা আসলে এটি অনুবাদই নয়, এটিও বস্তুত মৌলিক কবিতা—মৌলিক ও নিজস্ব—অন্য-একজন কবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলনেই তার জন্ম। এজন্যেই এরকম শোষিত প্রাকার কালো সোনায় নিজস্ব ভাবনা-বেদনার বিচ্ছুরণ অবশ্য-ভাবী, তা না-হ'লে তা কবিতা নামেরই অযোগ্য হ'য়ে যায়। সুতরাং অনুবাদ-কবিতা সম্ভব নয়। এবং এই হিশেবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কাব্যের "প্রতিধ্বনি" শিরোনামা প্রচুর অর্থবহ: এবং 'অনুবাদ' নাম উচ্ছেদ ক'রে তার বদলে 'প্রতিধ্বনি'-কথাটি ব্যবহার করলে অনেকাংশে

সত্যরক্ষা করা হয়,—কারণ প্রতিধ্বনি ঠিক একতাল ধ্বনির অনুকরণ নয়, এমনকি তার 'অর্থ' কখনো বিরোধীও হ'য়ে ওঠে, হ'য়ে ওঠে অনুভাবনার অনুকূল,—যেমন অনুবাদ কবিতায় হ'তে পারে। দেখা যাচ্ছে, আমি যে ধরনের কবিতার অনুবাদ সমর্থন করি, আসলে তা 'অনুবাদ'ই নয়। ফলত, অনুবাদ-কবিতার সার্থকতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ বদ্ধমূল।

৭

কবিতা-বিষয়ে অনেক দিনের বিচ্ছিন্ন ভাবনা-বেদনা গেঁথে যাই, সুতোটি লুকোনো আছে কি নেই ভালো পাঠকের দায়িত্বমধুর কাজ সেটার সন্ধান। এসব বিষয়ে স্পষ্ট ও শেষ কথা বলা অনাবশ্যক; সাহিত্যে এরকম কেউ বলবে না বড়ো-বড়ো সিতাংশু আলোয় ও নীলাঞ্জন আন্দোলনে ছোট্টো ক্ষীণ চুড়োয় যখন থরথর কাঁপছে আসন্ন কবি; বরং অফুরান গোধূলিভাণ্ডে ভরা থাক। আদর্শ কেউ নেই, শুধু একটি স্মারক ইশারা সজীব, চঞ্চল ও অস্থির হ'য়ে ছিন্ন দেবদূতের ভাবনায় শব্দশূন্য অবেদ্য সংগীতের মতো চ'লে যেতে পারে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। যেমন শব্দের কেমিস্ট্রির ভিতর বিশ শতকের পক্ষে বড্ডো বেশিরকম কবি ডিলান টমাস পুরে দিতেন কবিতার জল, পাখি, পাহাড়, যৌনতার সারাংশ ও আমাদের কাঁপা বাঁকা 'নপুংসক স্বপ্নগুলি'। ভ্রূ-গাঁথা বিচারক যাই বলুন: কবির কাছে কবিতা একাধারে মাতা, কন্যা, পত্নী ও রক্ষিতা: কবি রোজ এদের সঙ্গে আড় হ'য়ে, চিৎ হ'য়ে, কাৎ হ'য়ে, কখনো বিরুদ্ধে এক বিছানায় শুয়ে থাকেন। তখন সম্ভ্রান্তির ভ্রান্তিময় সামাজিক বিচাররশ্মি এড়িয়ে চ'লে যায় কবির অন্তর্ময় তৃতীয় চক্ষু; সময়শাসিত কবি যতিচিহ্নরহিত আনন্ত্যে উড়াল দিয়ে চ'লে যান এক-মুহূর্তের শীর্ষে-শীর্ষে: সব উন্নতি আকাঙ্ক্ষা, নেশা, দিনানুদিনের দারুণ-তুচ্ছ নিষ্ঠুর-কাঙাল যুদ্ধ, এইখানে এসে ঝ'রে যায়, ম'রে যায়, তখন তাঁর চাউনি চারিয়ে যায় জীবনের সকল গভীরে সম্ভাব্যে ও আয়তনে, বাঁধা পড়ে স্বরচিত অভিজ্ঞ নিজস্ব চুক্তিতে, গেঞ্জিহীন লুঙ্গিহীন সায়াহীন ব্রাশিয়ারহীন পরিকল্পনার ভিতরে চ'লে যায়॥

উত্তরবৈবিক ক্যারাভান

১

পূর্বলেখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন আশ্চর্য লেখক। কথাটির সত্যতা, আমার মতো আরো অনেকেই অনুভব করেছেন,—তাঁরাও, যাঁদের কাছে নদীতীরবাসী এই মহাকবিটি কেবল অফুরানভাবে কমনীয়, ললিত, স্নিগ্ধ, শীতল, সুখদ, নিরঞ্জন ও শুভঙ্কর। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ উপরিস্তরে তাই: নিসর্গের অবিরল প্রেমিক তিনি; মানবের অপার কল্যাণকরতায় বিশ্বাসী; আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য—আমাদের পক্ষে আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য—স্নিগ্ধ, রমণীয়, নির্দ্বন্দ্ব, ধর্মময় ও আদর্শময়; দিবসরজনী নিরন্তর রচনাস্রোতে জাগ্রত রেখেছিলেন নিজেকে, উচ্ছ্বসিত বছরের পর বছর; আর শুধু রচনায় নয়—আলোচনায় ও কর্মে ভ'রে উঠেছিলো আশি বছরের আততি। আশ্চর্য না-হ'য়ে উপায় থাকে না আমাদের: অবাক হ'য়ে ভাবি, কী ক'রে সম্ভব হ'লো এই নিরলস উন্মোচন-বিশ্লেষণ-নিষ্কাশন-আক্রমণ, এই জীবনব্যাপী এক অধিজ্যতা, এই নিষ্পলক ধ্যান, আর ভাবনার অত্যধিক প্রজননেও ক্লান্তির পরিবর্তে দেবতাপ্রতিম প্রসন্নতা? বিস্মিত হই আমরা, প্রায় অমানবিক মনে হয়, এমনকি স্তম্ভিত সমালোচকের মনে লোকোত্তর-উপাধি উঠে আসে, কেননা এই 'কালের রাখাল' রচনায় অবিশ্বাস্যরকমে স্নিগ্ধ, কোমল, মেয়েলি হ'য়েও অনলস শ্রমে পরাক্রান্ত পুরুষ, নমনীয়, কিন্তু তলায়-তলায় কাজ ক'রে যাচ্ছে একটি বলীয়ান হাত, নম্য কিন্তু অনমনীয় রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত হাত—যা অঙ্কের মতো সুকঠিনভাবে শাসিত, আলস্যের পরপারে, ক্লান্তির অতীত, অতিসান্নিধ্যজনিত বিরক্তি বা তিক্ততার উপরে। কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো সেই দারুণ ঘটনা, প্রায় প্রাকৃতিক উত্থানের সমান্তর: যিনি বাংলা ভাষার অবিসংবাদিত

শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি তার সাহিত্যের আরো কোনো-কোনো শাখানদীতে স্বরচিত, প্রোজ্জ্বল ও কনকশিরস্ক তরণী ভাসিয়ে দিলেন, যেমন: প্রবন্ধ।

একজন কবি কী ক'রে উচ্চ প্রাবন্ধিক হ'তে পারেন, এটা কোনো-কোনো পাঠকের মনে প্রশ্নের আকার নিতে পারে। সত্যি, হঠাৎ মনে হয়, যিনি কবি তিনি কী ক'রে কোনো একটিমাত্র প্রসঙ্গ কেন্দ্র ক'রে, সাজিয়ে-গুছিয়ে, যুক্তির শিকল বেঁধে, তথ্য হেঁকে, আশরীর একটি রচনা 'নির্মাণ' ক'রে তুলবেন—নির্মাণ ও সৃষ্টি: ওরা দুজন যখন পরস্পরের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে আছে চিরকালের জন্যে? আরো: শিক্ষা ও শিল্প, তথা সাহিত্য, কখনো স্পষ্টত পরস্পরের সহোদর নয় আর ঐ যুগলের ফলশ্রুতি, অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ, মানুষকে দুদিক থেকে আকৃষ্ট ক'রে আনে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, একজন কবির পক্ষে সুনির্দিষ্ট মধ্যে ও যথাযথ শরীরের মাত্রা রেখে কোনো-একটি আলোচনা করা দুঃসম্ভব। হ্যাঁ, দুঃসম্ভব, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়, বরং এই পৃথিবীর সাহিত্যেতিহাস অবহিত হ'লে আমরা দেখতে পাই: কবির পক্ষেই সমালোচনার লক্ষ্যভেদ অনেক সময় আশ্চর্যরকমে অব্যর্থ হয়েছে। কেন? —এর জবাবে কএকটি কথা বলতে হয় বিশদভাবে—না, বিশদভাবেও বলা যাবে না, শুধু রেখায়-রেখায় যদি ধরা যায়, কেননা সাহিত্যের অন্দরমহলে সমালোচনা হচ্ছে বেগানা পুরুষ, তাকে দেখলে ঘর শূন্য ক'রে কে কোথায় লুকিয়ে পড়ে।

প্রথমত, স্বভাবকবির দিন ইতিমধ্যেই অবসিত, এখন প্রতিটি দায়িত্ববান লেখক সচেতন, হয়তো অতিসচেতন, শিল্পসাহিত্যের ক্রমান্বিত ইতিহাস তাঁদের রক্তের ভিতরে আবহমান: ফলত সাহিত্যশিল্প বা জীবন-বিষয়ক তাঁর মতামত স্বপ্নে বা কল্পনায় উৎপন্ন নয়—এমনকি কল্পনার পশ্চাতেও মননের শিরাউপশিরা অর্ধনারীশ্বর আয়তনে আপন্ন।

দ্বিতীয়ত, এবং এটাই বড়ো কথা, একমাত্র কবির পক্ষেই জীবন, স্ত্রীলোক বা সাহিত্যের জাঁহাবাজ মর্মে [illegible] করা সম্ভব, একমাত্র তিনিই এইসব উগ্র নগ্ন অসংলগ্নতার মধ্যে আনতে পারেন আত্মীয়তা, অসম্ভবের ভিতরে ব্যাকরণ—অবশ্য যে-ব্যাকরণ ঐ কবিকেই এড়িয়ে সূত্রাবলি রচনা করতে পারে। একমাত্র কবির পক্ষেই সম্ভব কারণ তাঁর আছে সেই বিখ্যাত চাউনি, অর্থাৎ যাকে বলা হয় 'কবিদৃষ্টি', যা যে-কোনো বস্তুর ছদ্মবেশ মোচন ক'রে সরাসরি তার দপদপে অন্তরাত্মায় গিয়ে

পৌঁছোয়, যেন কবির চোখে আছে রঞ্জনরশ্মি, অর্থাৎ বিজ্ঞান, যা সমস্ত কৃত্রিমতা উচ্ছেদ ক'রে নির্মলের উপর পতিত হয়।

এই 'কবির বিজ্ঞান'—আমি বলতে চাচ্ছি, তার বলেই যে-কোনো বিষয়ে সম্ভাব্যগভীর প্রবন্ধ রচনা করা একজন কবির পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। অপেক্ষাকৃত সহজ? কার চেয়ে? একজন প্রচলিত অধ্যাপক বা নিশ্চল পণ্ডিতের চেয়ে। কারণ, কবি কোনো একটি প্রসঙ্গ আক্রমণ করেন তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা, মিথুনকর্মে স্ত্রীলোকের মতো বিষয়ের একটি উচ্ছ্রিত অংশ গ্রহণ করেন নিজের ভিতরে, আবেগের চাপে নিজেকে বিলিয়ে দ্যান তার সঙ্গে, ধারণ করেন, নিঃশ্বসিত হন, তৃপ্ত ও বলবান, মিলিত হন। আর একজন পণ্ডিত বা অধ্যাপক বিষয়কে যেন জালের ভিতরে ছেঁকে নেন, চেপে-চেপে নিংড়ে নেন, শরীর থেকে খুঁটে-খুঁটে বের করেন তথ্য, ঘটনার উর্ণাজাল, প্রমাণের নুড়ি; কিন্তু তিনি, নীতিবিদ, বিষয়ের সঙ্গে কবির মতো কখনো সহবাস করেন না। অধ্যাপক বা পণ্ডিতের কাছে বিষয় যেন অফিসের কাজ—শাসিত ও মসৃণ, যুক্তিযুক্ত ও হৃদয়সম্পর্কহীন; আর কবির নিকট বিষয় যেন তার প্রেমিকা, তার সঙ্গ আসঙ্গ তাঁকে আনন্দ দেয়, তার সম্বন্ধে ভাবনায় আবেগ পুলক, তাকে নিয়ে লেখায় আছে চাতুরীর পরিবর্তে মাধুরী।

রবীন্দ্রনাথ হেঁকে গিয়েছিলেন এই তৃতীয় রাস্তাটি, কোনোরকম স্থির চেতনার দ্বারা কুশল নয়, নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে; আসলে তো তাঁর সকল রচনাই কবিতা, তাঁর ভাবনা বেদনা একমাত্র কবিতায় অনূদিত হ'য়ে সাহিত্যের নানাবিধ প্রকরণে প্রশ্রয় পেয়েছে, আর সেজন্যেই তাঁর রচনা তরঙ্গের মতো অদ্যাবধি আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনানুদিনের সীমান্ত ভেঙেচুরে। প্রবন্ধ—যেখানে বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের অনেক কুশলতা যাবতীয় জোড়ের মুখে প্রতীক্ষা করে, সেখানে কবিতা, সঙ্গীত ও চিত্রকলার আচার তথা জীবনানন্দোক্ত মাধবীর আরশি তাঁর রচনার সামান্য লক্ষণ এবং বঙ্গসাহিত্যে অভিনব। তাঁর আগে, ঊনবিংশ শতাব্দী ভ'রে বাংলা ভাষায় অযুত নিবন্ধ রচিত হয়েছে; সেইসব প্রাবন্ধিকের সহিত তাঁর বৈপরীত্য বিপুল বলা চলে, যদিচ তাঁর মনোদৃষ্টিতে তাঁর সমকালের সারাৎসার সংকলিত।

প্রথমত, তাঁর সমকালীন লেখকদের মতো রবীন্দ্রনাথ সামাজিকভাবে একএকটি প্রসঙ্গকে বিচার করেননি, তিনি অবলোকন করেছেন তৃতীয়

নয়নে, যদুনাথ সরকার-নির্দেশিত একক স্বকীয় দৃষ্টিতে অর্থাৎ তা ব্যক্তিগত রঙের রঙ্গভূমি। ফলত, 'বিশুদ্ধ সাহিত্যে'র উচ্চারণ তাঁর কণ্ঠেই প্রথম উদ্‌গীত হ'লো বঙ্গসাহিত্যে।

অনন্তর, তাঁর রচনায় 'ধর্ম ও আদর্শবাদ' একালে আমাদের চক্ষে সুস্পষ্ট ও সুপ্রচুর মনে হ'লেও, তখনকার মতো প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে সমাজকল্যাণ ও দেশহিতৈষণার বকযন্ত্রে মীমাংসায় পৌঁছোননি তিনি। আমরা উপলব্ধি করি, 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই শ্রেয়োভাবনা রবীন্দ্রনাথেরও প্রধান বক্তব্য; শুধু পার্থক্য এই—এবং পার্থক্যটি নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ : বঙ্কিম যেখানে সরাসরি সামাজিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেখানে সাহিত্যেরই স্বয়ংস্বতন্ত্র অন্তরাখ্যানে রবীন্দ্রনাথের মীমাংসা এবং যেহেতু আধ্যাত্মিকতাই প্রতিটি লেখকের শততলনিবাসী অপরূপ বেহালা, অতএব রাবীন্দ্রিক মীমাংসার অতিমাত্র উপদেশে না-ভুললেও আমরা ভিতর থেকে খুশি হ'য়ে উঠি। উপর্যুক্ত মীমাংসার যাত্রাপথ এতোসব নব-নব জাগর শিহরের মধ্য দিয়ে অলংকৃত, এতোসব সূক্ষ্ম, শতমুখী ও রীতিহীন প্রেমে-তাপে-রসে বিকীর্ণ যে শিশির-চ্ছুরিত চাঁদের স্পর্শ যেন মনে উৎসবের সুরঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে যায়।

এখানেই ব'লে নেয়া ভালো যে, খাঁটি প্রবন্ধের বিচারে রবীন্দ্রনাথের স্খলন-পতন-ত্রুটি অজস্র, অর্থাৎ তিনি প্রবন্ধের প্রচল মানেননি; অথচ সমস্ত এড়িয়ে একথাও প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকে অনিবারণীয়ভাবে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার। এমনকি যে-নিরাসক্তি প্রাবন্ধিকের প্রাথমিক শর্ত, সেখানেও তিনি নিঃসক্ত থাকতে পারেননি;— কিন্তু, একথাও কি সত্য নয়, ব্যক্তিগত রুচি অরুচিকে কোনো আদর্শই অতিক্রম করতে পারে না, অন্তত সৃষ্টিশীল রচনায়? তাহ'লে তো বোঝা যাচ্ছে, তাঁর প্রতিভা এমনই সর্বচরাচরগ্রাসী যে সাহিত্যের একটি নির্দিষ্ট কানুন ভেঙেও তাঁর প্রবন্ধ দারুণ ও বিজয়ী হন্তারকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ ঐ প্রতিষ্ঠায় মতো-না পুরুষালি বলীয়ান ব্যবহার দ্রষ্টব্য, ততোধিক লক্ষণীয় নমনীয় মেয়েলি আচার, বিস্রস্ত কল্পনা ও অর্ধোচ্চারিত উদাহরণসমুচ্চয়। তাঁর যাবতীয় রচনার মতোই, তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছও, অফুরান গোধূলি-দ্বারা আক্রান্ত, কিংবা বলা চলে, তা বস্তহননের মুখচ্ছদ মাত্র। অবশ্য, বিপরীত উদাহরণ সরবরাহেও তাঁর ক্লান্তি নেই, তাহ'লেও এটা সাধারণ সত্য যে, তাঁর সকল রচনা অমর্ত্য গানের মতো, গোপন জলের মতো।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বা ঈষৎ-উত্তরকালীন সমালোচকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনাপন স্বকীয়তা প্রতিপাদিত করেছেন। তাহ'লেও ব্যঙ্গপ্রবণ প্রমথ চৌধুরী, অতিভাষী মোহিতলাল, খেয়ালি অথচ গূঢ়চারী অবনীন্দ্রনাথ এবং ইন্দ্রিয়-ও যুক্তি-জাগর বলেন্দ্রনাথ মূলত ভাবনা বেদনা-বিশ্বাসে রবীন্দ্রীয় মণ্ডলের অধিবাসী। এবং সমালোচনা-রীতিতে রবীন্দ্রনাথ থেকে এঁদের পৃথকতা পৃথুল হ'লেও নবীনতায় উদ্দীপ্ত নয়; বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-সমালোচনার ধারা তখনও উত্তরকালের অপেক্ষা করেছে।

অনন্তর, বাংলা সাহিত্য যখন রবীন্দ্র-করতল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করছে, বিজন ও ঘোষিত কারো-কারো করপ্রসারে, তখন, 'কল্লোলে'র সেই হৈ-চৈ-য়িক ও উন্মাদক অধ্যায়ের মধ্যে শোনা যেতে লাগলো কারো-কারো উজ্জ্বল নির্দেশ, কারো-কারো স্থির মনীষা মিছিলটিকে একটি পরিচ্ছন্ন বিভূতি দেবার জন্যে কাজ ক'রে যেতে লাগলো। বাংলা কবিতার জন্মান্তর হ'লো, কথাসাহিত্যের পুনর্জন্ম, আর সমস্তই যখন একটা বড়ো মোড় নেবার জন্যে অস্থির ও চঞ্চল ও সংরক্ত হ'য়ে উঠেছে, তখন একা মননজীবীদের সাধ্য কি চুপ ক'রে বসে থাকেন, তাঁরাও পাল্টে যাবার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হ'লেন, কিংবা বলা চলে, অমন, অন্তঃপ্রেরণা নিহিত ছিলো তাঁদের রক্তচাঞ্চল্যেই; অপিচ, সুখের বিষয়, দেখা গেলো কবিতা ও কথাসাহিত্যকে যাঁরা নবত্বে দীক্ষা দিলেন তাঁরাই দীপ্র-তীব্র রাখী পরিয়ে দিলেন সমালোচনার হাতে। আসলে এটাই স্বাভাবিক ছিলো; কেননা যদি শুধু তিরিশের কবিতা পরিবর্তিত হ'তো অথবা শুধু কথাসাহিত্য, তাহ'লে আজ মস্ত একটা শূন্যোপস্থিতি টের পাওয়া যেতো তার অন্তরে; সমস্ত বাংলা সাহিত্যেই ছিলো তখন পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী, সুতরাং কবিতা-কথকতার সহিত আলোচনা-সমালোচনাও নবীনতায় স্নান ক'রে উঠলো স্বাভাবিকভাবে। 'কল্লোল' তার অভীপ্সিত সার্থকতা পায়নি সত্য, কিন্তু যতোটুকু পেয়েছে তার জন্যে অকপট অন্তঃপ্রেরণার তাগিদই দায়ী নয়, কারো-কারো মননের আত্মস্থতাও তার অংশভাক: যে-সময়ে অতিবেল 'কল্লোল' এসে পড়েছে সেই সময়েই প্রয়োজন ছিলো স্থিরচিত্ত 'পরিচয়ে'র, কেননা কেবল স্রোতোজীবী হ'য়ে দীর্ঘকাল চলে না, মানব-সন্তানকে বাঁচতে হ'লে কঠিন-নিটোল ডাঙা আঁকড়ে ধরতেই হয়।

তিরিশের প্রধান পাঁচজন কবির পক্ষে—তাই—স্বভাবকবি হওয়া অসম্ভব ছিলো, এমনকি শুধু কবিও নয়, সমকালকে অনুধাবন করবার জন্যে রবীন্দ্রবলয় থেকে বেরোবার জন্যে মননের রাস্তা আবশ্যিক হ'য়ে দাঁড়ালো। অর্থাৎ তাঁরা কেউ শুধু কবি নন, তাঁরা সমালোচকও বটেন, নিজের ও সময়ের ব্যাখ্যাতা, স্বপ্ন ও বস্তু ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে পরস্পরের দিকে আমগ্নভাবে তাকিয়ে থাকলো। ফলে, কবি হ'য়ে উঠতে হ'লো এঁদের প্রত্যেককে কৃত্রিম উপায়ে; মনন ও হৃদয়ঃ কবিতার এই দুই প্রত্ন প্রতিদ্বন্দ্বী তুলকালাম সহবাসে বিদ্ধ করলো একে অপরের দেহ। এছাড়া আর কোন উপায় ছিলো বাংলা তিরিশের কবিতার, তাঁদের? ছিলো একদিন, যখন 'কবিতা' ও 'কৃত্রিমতা' ছিলো বিপরীতার্থক, কিন্তু আজ তারা সমভূমিতে এসে উপস্থিত, একজন কবির পক্ষে এর চেয়ে দারুণ দুঃসময় আর কী হ'তে পারে? কিন্তু, যিনি কবি, তাঁকে যেহেতু প্রাণপণে চয়ন ক'রে নিতেই হয় একটি প্রকাশপথ, অতএব যে-'জ্ঞান'-কে সে একদিন দুয়ার থেকে প্রায় ঘাড়ে ধ'রে ফিরিয়ে দিয়েছিলো তারই হাত ধ'রে রাজার প্রাসাদে ঢুকতে হয় আজ। তজ্জন্য কবিতার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয় সেটা আপাতত অপ্রাসঙ্গিক, এখানে শুধু লক্ষণীয়ঃ তৎসঞ্জাত কবির কাব্যসমালোচনা হৃদয় ও মননের সঙ্গমে তৃতীয় একটি আয়তন পেয়ে যায়। এবং এই কারণেই, রবীন্দ্রনাথোত্তর বাংলা কবিতা যাঁদের হাতে নবকৌলীন্য লাভ করলো, তাঁরাই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে অন্তরিত তন্ত্রমন্ত্রের মতো ধারণ করলেন। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে—নব্য সমালোচনারীতির সুপ্রসর স্বাক্ষর পড়লো তিরিশের এইসব প্রধান কবিরই করাঙ্গুলি থেকে; চলিষ্ণু জঙ্গম ভাবনা-বেদনা সায়ন্তনের ঝরনা থেকে চিরন্তনের নদীতে আবার ফিরিয়ে আনলেন এঁরাই। হয়তো এঁদের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো সমালোচনার তীব্র লক্ষ্যভেদ। বস্তুত, সমালোচনা তো নির্মাণ নয়—সৃষ্টি, বিজ্ঞান নয়—শিল্প; অতএব সে কবিতার বলা যথাযথ হবে না, কবির অনুভূতির অব্যবহিত।

আকাডেমিক সমালোচনাধারা ও প্রবন্ধগুচ্ছকে আমরা অনায়াসেই উপেক্ষা ক'রে যেতে পারি এবং উপর্যুক্ত পাঁচজন বাদে আর যাঁরা নূতন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে বাগীশ্বরী দ্যোতনায় ভ'রে দিলেন,

তাঁদের নাম এখানেই উল্লেখনীয়ঃ অন্নদাশংকর রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লেখিতেরা যেমন তিরিশের কবিতার প্রধান, এই দুজনও তেমনি রবীন্দ্রনাথোত্তর বাংলা উপন্যাসকে নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, এই সাতজনই মৌলিক রচনার প্রতিভায় অসামান্য।

নামোল্লেখযোগ্য আরো অনেকে আছেন, কিন্তু আমার মনে হয়ঃ প্রধানত এই সাতজন লেখকই তৈরি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, ফলিয়ে তুলেছেন উত্তররৈবিক সমালোচনা-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সমালোচক, এই সনাতন সত্যটি অঙ্গীকার ক'রে নিয়েও বলা যায়ঃ সাহিত্য যেহেতু কম্পমান অগ্রসরমান, অতএব বিভিন্ন মনীষার মাধ্যমে-মাধ্যমে তার যাত্রাপথ সূচিত। এই সাতজন পরস্পর-অজ্ঞাত যৌথ দায়িত্বে ভাবনা-বেদনার সপ্তক স্বরগ্রামে ধ'রে রাখলেন এই সময়কে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে সন্তস্নাত তথাচ প্রত্যেকের চক্ষুর্দ্বয় দুর্বৃত্তের মতো স্বাধীন।

২

অন্নদাশঙ্কর রায়

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর উত্তরজীবী হিশেবে তাঁকে চিহ্নিত করা হ'লেও, মূলত উদ্বর্তনে নয়, অনুকম্পা ও নূতন রীতির সমালোচনা-রাজ্যে তাঁর অধিকার স্বতঃস্ফূর্ত, একালের শ্রেষ্ঠ হিন্দু-মুসলিম মিলন-সাধনার সাহিত্যিক পুরোহিত তিনি, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের প্রবাদ-প্রখ্য সংঘর্ষে জোড়ের মতো তাঁর করুণা অপেক্ষা করেছে যেন। শুধু হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নেই নয়, অন্নদাশঙ্কর ভাবনা-বেদনা-চেতনায় রবীন্দ্রো-চিত বিশ্বম্ভর। তারুণ্যের নিশান উড়িয়ে, নারীর সমানাধিকার নয় স্বাধিকার গেয়ে, যৌনতাকে অস্পষ্টতায় না-রেখে এবং সর্বোপরি সাহিত্যকে বিপুলা পৃথ্বীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপনায় অন্নদাশঙ্কর প্রমাণ করেছেন তিনি এই আধুনিক জগতেরই বাশিন্দা। রহস্যাঙ্কিত কণ্ঠে তিনি-যে বলেছেন তিনি নবীনদের মহলে প্রবীণ ও প্রবীণদের মহলে নবীন—এই কথাটি তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য ব'লে মনে হয়। তাঁর মনোদৃষ্টি একাধারে সন্ততন ও সনাতন। অবাধ গ্রন্থবিহার, ভুবনবিখ্যাতদের অবিরল নামোচ্চারণ ইত্যাদি সমকালীন লেখকদের সানন্দ মুদ্রাদোষগুলি থেকে তিনি যেমন

মুক্ত, তেমনি প্রবীণের রক্ষণশীল মনোভাবও তাঁর কেউ নয়। একালের লেখকদের মতো অন্নদাশঙ্করও রাবীন্দ্রিক নির্দ্বন্দ্বের উত্তরাধিকার পাননি বটে, কিন্তু তাঁরও লক্ষ্য সেই অমৃতের উৎসার; তিনি জানেন সেই ধ্রুবকে, সেই সত্যকে, সেই অবিচল নক্ষত্রকে এবং তাঁর লেখা ঐ অভিসারে নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ। অর্থাৎ তাঁর সব প্রবন্ধই আসলে ব্যক্তিগত; এবং ব্যক্তিগত ব'লেই সহৃদয় পাঠকের অমন মর্ম স্পর্শ করে, এবং তাঁর সব রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খে জারিয়ে যায় তাঁর স্বকীয় দর্শন। অন্নদাশঙ্করের রচনায় তথ্যের প্রাচুর্যের বদলে জ্ঞানের সারাৎসার স্বাক্ষরিত, মননাবর্তে চক্রবর্তী হ'লেও মনোলৌল্যে স্থগিত হয়নি, ব্যক্তিগতের অন্তর্ব্যূহে আশ্রিত এবং ফলত কবিতার সঙ্গেও তার সম্পর্ক সুদূর নয়। যদি অন্নদাশঙ্করকে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবী হিশেবেই শুধু দেখি, তাহ'লে মস্ত ভুল করা হবে। কেননা 'ভাব' ও ভাষার যুগল ক্ষেত্রেই তিনি ঐ দুই প্রাতঃস্মরণীয়ের প্রভাবমুক্ত। ক্লাসিকের প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ: রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, গ্যেটে তাঁর আরাধ্য দেবতা; হয়তো তাই তাঁর দৃষ্টির সর্বকোণ সংযমসুযত। আর ভাষা-ব্যবহারে—সত্যকে যেহেতু তিনি সরাসরি স্পর্শ করতে চান, তাই—সবরকম অলঙ্কার-পাশ থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন, 'অলঙ্কার যে মাঝে প'ড়ে মিলনেতে আড়াল করে'—রবীন্দ্রনাথ এ কথা বললেও তাঁর ভাষায় অনুরূপ সন্ন্যাসের লক্ষণ দুর্লভ, আর প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলি বাক্যের খেলায় এমনই মাতাল যে দিক্‌ভ্রান্তি তাঁর চারিত্র্যে পৌঁছেছে; শব্দোচ্ছ্বাস ও শব্দোক্রীড়া—এই দুই অতিরঞ্জনের বহির্ব্যূহ থেকে আদ্যোপ্রান্ত অন্নদাশঙ্কর বেরিয়ে এসেছেন।—শ্রেষ্ঠ কথাটি সাহিত্যের যে-কোনো আলোচনায় পরিত্যাজ্য হ'লেও তাঁর উপর ঐ উপাধি আরোপের লোভ হয়।

৩

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ সবুজ-পত্রীদের একজন এবং সঙ্গত কারণেই প্রমথ চৌধুরী-দ্বারা অতিমাত্র প্রভাবিত: বহুমুখী জ্ঞানানুশীলনে, খেয়ালখুশি পুস্তক-বিহারে, শ্লেষাশ্লিষ্ট ভাষাব্যবহারে ও অহংকৃত ব্যক্তিস্বরূপের স্থাপনে। তাহ'লেও মননের জগতের অধিবাসী এই লেখকের অবশ্য নিজস্ব ও

স্বোপার্জিত একটি চারিত্র্য আছে ঃ সমাজের বহুবিভিন্ন স্তরগুলি অবলোকন ক'রে গেছেন তিনি, লক্ষ্য করেছেন অর্থনৈতিক সঙ্কোচন প্রসারণ এবং পরিবর্তমান পুরুষার্থ—তাঁর সাহিত্যবিচারও এই শোভাপটভূমিকায় দ্রষ্টব্য। অন্নদাশঙ্করের মতো স্বচ্ছ ও নির্ভার নন তিনি, বরং গ্রন্থপীড়িত; কিন্তু একটি দিকে উভয়েরই সাযুজ্য আছে ঃ আদিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো এঁরাও বিশ্বাসী ছিলেন মননের নয়—শেষাবধি হৃদয়ের পথেই মুক্তি-মীমাংসা। ধূর্জটিপ্রসাদের গদ্যভাষা ছোটো-ছোটো আপাতবিচ্ছিন্ন বাক্যে গড়া, বিষ্ণু দে-র কাব্যভাষার সহিত তুলনীয়। সেজন্যেই যুক্তিপ্রদীপিত নয়, বিজ্ঞানসম্মত নয়। খেয়ালি রম্য ব্যঙ্গপ্রবণ তাঁর রচনা, অবশ্য জনসমাদৃত লঘিমার সঙ্গে এর দূরত্ব মেরুপ্রমাণ। অন্নদাশঙ্করের মানবিকতামার্গ এই উচ্চভুরু তার্কিকে অলভ্য।

৪

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু জীবনের যে-কোনো প্রতিবেশ থেকেই ছেঁকে তোলেন আনন্দ, বস্তুত যা তাঁর আত্মার আপনকার উৎসরণ-নিঃসরণের আনন্দ; তাঁর নিজের ভিতর থেকে এমন দীপ্র ফোয়ারা শতধারে উচ্ছ্বসিত সারাক্ষণ যে মনে হয়, বহির্জগৎ তার ভীষণ সব মারাত্মক আকর্ষণকারী গলিঘুঁজি নিয়েও তাঁকে কখনো কেন্দ্রচ্যুত করতে পারবে না। আর তার কারণ, সাহিত্যে এবং একমাত্র সাহিত্যেই তিনি আমুণ্ডনখাগ্র সংলগ্ন; এমনকি সাহিত্যের ত্রয়ী সুহৃদ—দর্শন, সঙ্গীত ও চিত্রকলা—তাদের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব অন্ধকারপ্রচ্ছাদিত; ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি থেকে উন্মুক্ত তিনি; 'যাক, বাংলা সাহিত্য এতোদিনে তার শরীর থেকে জ্ঞানের ধর্মের উপদেশের উচ্ছিষ্ট ঝেড়ে ফেলতে পারলো', তাঁকে অবলোকন ক'রে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসচেতন পাঠক এরকম কথা ব'লে উঠলে অন্যায় হয় না। অবশ্য, পূর্বজ রবীন্দ্রনাথেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের ঐ অভিরাম ঘোষণা বেজে উঠেছিলো ক্রমান্বিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস দীর্ণ ক'রে; কিন্তু সেই অতিকায় পুরুষ স্বয়ং এমন আতত দায়িত্বভার মেনে নিয়েছিলেন যে, বিপ্রতীপ নিদর্শন তথা কল্যাণ-মঙ্গল জাতীয় শুভবোধেরও পরম প্রচারক হিশেবে তিনি অনবরত দাঁড়িয়ে থাকেন। বুদ্ধদেব নানাদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক, তত্রাচ ব্যক্তির প্রচ্ছায়ে তাঁকে যেহেতু সামাজিক

মুক্তির সদুপায় খুঁজতে হয়নি, অতএব বিশুদ্ধ সাহিত্যে তাঁর অতুলন ভক্তি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য, নিজের স্বভাবধর্মে আস্থা ভালো, তবে কেবলি তার ঘোষণা ও পক্ষপাত আমার নিকট বিরক্তিকর বোধ হয়। যিনি বড়ো শিল্পী, কোনো-রকম মতবাদেই তিনি আশরীর বিশ্বাসী ও নিবিষ্ট হ'তে পারেন না, হয়তো নিজের বিরুদ্ধতা ক'রে তলে-তলে প্রতিদ্বন্দ্বীকেই সমর্থন ক'রে বসেন; অন্তত তাঁর উন্মুখিতা এমনই সর্বব্যাপী হয় যে কোনোটিকেই তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না, তাই তাঁর কৃতজ্ঞতাও অনায়াসেই ভুবনবিসারী হয়, অনায়াসেই এমন-সব ছোট্টো-তুচ্ছ-খণ্ড বিষয়ের প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞ হয়, যার উল্লেখ করতে সাধারণের অভিমানে বাধে। কথাপ্রসঙ্গে অনেক দূর চ'লে এসেছি, এ রকম তিরস্কৃত সিদ্ধান্তে আমি উপসংহার টানতে চাই না;—বরং বুদ্ধদেবের ন্যায্য পুরস্কার যেখানে পাওনা তার সামনা করাই ভালো। মুখোশের অন্তরালে যে-অসংবদ্ধ ব্যক্তিমানুষ লুক্কায়িত, তারই স্বতশ্চল তমসা ও আভা রাঙিয়ে দিয়ে যায় বুদ্ধদেবের রচনাবলি; সেজন্যেই তা অমন নিষ্কুণ্ঠ, আত্মমুগ্ধ, খুশির সাহসে কখনো স্বর্গের উচ্চারণ এসে জেঁকে বসে, আর মেদিনীর কোন গোপন মৌচাক থেকে কেবলি ক্ষরিত হয় ক্ষীণ, অলক্ষ্য ও বধির মাধুরী। ব্যক্তিমানুষ বুদ্ধদেবের লক্ষ্যের কেন্দ্রভূমি হ'লেও তিনি এড়িয়ে গেছেন সেই গহ্বরকে, যার সম্মুখে এসে সুধীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল নিঃশব্দ থাকতে হয়েছিলো; তার কারণ সুধীন্দ্রনাথই নির্দেশ করেছিলেন একদাঃ বুদ্ধদেব মানবচিত্তের জটিল, কুটিল ও আত্মবিলোপকারী স্রোত-গতি ও ঘূর্ণির কথা জানেন বটে, কিন্তু তিনি তার সহিত ভেসে যান না, সমস্ত ব্যাপারটিকে তিনি সুদূরের দ্বারা অনূদিত ক'রে নেন; ফলত, মানবচিত্তের ছোটো-বড়ো ক্ষান্তিহীন দ্বৈরথ সমরে ও টান-জোগানের বিবরণে তিনি বিশদ নন, তিনি তদন্ত চারিয়ে দ্যান না স্মৃতি, আক্রম ও প্রতীক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খে। তার মানে এই নয় যে, তাঁর নিরন্তর ধ্যানের উন্মীলনে বিচিত্রের সত্য ধরা পড়ে না। স্বভাবজ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার পিপাসায় বহুবিপ্রতীপ অনেক জিনিশ ক্রমশ তাঁর মানসিক আশবাবে পরিণত হয়েছে; অপিচ সমস্তেরই চরিত্রান্তর হয়েছে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের সহবাসেঃ হয়েছে 'স্বচ্ছ, রোগা, ঝকমকে আর মেকি।' সমালোচকের এইমতো বাচনভঙ্গি হয়তো নিন্দার ছদ্মবেশ, তবে কথাটা ঘুরিয়ে বললে সুরঞ্জন স্পর্শ ক'রে যাবে।

মননচর্চায় বুদ্ধদেব যদিচ অক্লান্ত, তবু যাবতীয় জ্ঞান তাঁর আকারেই মুক্তি পায় এ জন্যে যে, হৃৎভূমিই তাঁর চিৎপ্রকর্ষের প্রধান আসন। সেজন্যেই মননজীবীর কুয়াশা, ইশারা ও পৌনঃপুনিক উল্লম্ফন তথা দুরূহতার বদলে তাঁর রচনার ক্ষিপ্র-তীব্র প্রাঞ্জলতা আমাদের অধিকার করে। আলোচ্য সাতজন সমালোচকের মধ্যে তাঁর সমালোচনাই সবচেয়ে জনপ্রিয়, পরবর্তী সমালোচকগণের উপরে সর্বাধিক প্রভাবশালী। তাহ'লেও তারল্যের সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পর্ক সন্নিকট নয়; এবং ইংরেজি সাহিত্যে এজরা পাউণ্ডের অনুকম্পায় যেমন অনেক অধিরাজ অঙ্গীকৃত হয়েছিলেন, তেমি বুদ্ধদেব বসুর নিরন্তর প্রবর্তনায় বাংলা সাহিত্যে প্রথমবারের মতো আধুনিক কবিতা যূথবদ্ধ আকার পায়।

৫

জীবনানন্দ দাশ

শুধু কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক দুশ্চর আলোচনায় যিনি নিজেকে মুদ্রিত ক'রে গেলেন, এ যুগে তিনি সংযমের এক মৌল নিদর্শন। কবিতার আত্মার অন্তর্ঘাত-বহির্ঘাত প্রসঙ্গে স্রোতোতাড়িত স্বষ্টিপ্রেরণায় যেন তিনি সমালোচনারই এক নবতর উজ্জ্বলতর দিগন্তের সম্মুখীন ক'রে দিয়ে যান আমাদের, যেখানে কবিতা ও কাব্যালোচনা যেন একই অবার্য প্রত্নপরিষদ থেকে জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে। ফলে সমালোচনার অনেক রূঢ়মূল কানুন ভেঙে যায় সত্য; কিন্তু আত্মাকে আবিষ্কার করবার ইচ্ছা-চেষ্টা-স্বপ্ন থাকলে এটাকেই অনন্যপন্থা ব'লে নিতে হয়। আর জীবনানন্দ ছিলেন এইমতো অহংবিচারের যোগ্য সূত্রধার; কেননা তাঁর শ্লোকসমুচ্চয় হৃদয়বাহিত হ'য়েও কবিতার কানুন অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছিলো, তেমি মনন কাব্য-সমালোচনার ঐ বিশেষ মুহূর্তে প্রধান ভূমিকা থেকে স্থগিত হ'য়ে গেছে। তাঁর কবিতার মতোই বাক্যের শিথিল ছড়ানো ও বিস্তারিত ভঙ্গিতে নানা আঁকাবাঁকা রঙিন গলিঘুঁজির মধ্য দিয়ে তিনি সেই অন্তর্গত যাত্রাপথটিকে চিহ্নিত করতে চাচ্ছিলেন, চিরকাল যে-রাস্তা বেয়ে মানবচিত্ত কবিতায় কথা ক'য়ে উঠেছে, অথচ সমালোচনার কলকব্জা যার কাছে এসে হাঁটু ভেঙে লুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে। কবিতার আত্মা ও শারীররেখায় যে তদন্ত চারিয়ে দিয়েছিলেন তিনি শব্দের ও স্বজ্ঞার দ্বারা, তা কখনো-

কখনো ঈশ্বরপ্রতিম সেই ধাঁধার ভিতরে এক সুচিন্তার মতো ঢুকে পড়েছে এবং তার ফলশ্রুতি হয়তো নির্মল নয়, কেননা 'হৃদয়' নাম্নী সেই ফলাফল এখনো বিজ্ঞানের বাইরে রহস্যময়। প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা প্রমুক্ত যে-বাণীকে খাঁচার ভিতরে ধরতে চাচ্ছিলেন, একালে জীবনানন্দ যেন তৈরি ক'রে তুললেন তারই একটি নবপর্যায়, তারই পুনর্জন্ম হ'লো ; এবং তিনি আরো দেখিয়ে দিলেন কবিতাকে খাপে-খোপে পুরতে গেলে সে দম আটকে মারা যায়, তাকে তথ্যে নয় মর্মের ভিতরে অনুধাবন ক'রে নিতে হয়। জীবনানন্দ তাঁর কাব্য ও কাব্যালোচনায় যেমন একদিকে সমকালের ধারক, তেমনি তার প্রতিবাদীও বটে ঃ তাঁর কাব্য ও কাব্যালোচনা এই বিংশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে যেন এক নমনীয় ও অমর্ত্য স্থাপত্যের প্রতিবাদ ঃ নিজের ভিতরে ভেসে গিয়েছেন তিনি, মননের বিরুদ্ধে যুক্তির বিরুদ্ধে ভেসে গিয়ে যেন তাঁর তুমুল মুণ্ড রুখে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের পার্থক্য বিপুল ; কিন্তু একটি উল্লেখনীয় সাযুজ্য এই ঃ দুজনেই হৃদয়ের সন্তান, অনুভূতির সাক্ষাৎ বরপুত্র এবং উভয়ের সমালোচনা এক-ধরনের না-হ'লেও সমালোচনার রীতি মানে না। উভয়ের সমালোচনারীতির পার্থক্য এই ঃ রবীন্দ্রনাথ যেখানে নানাবিধ উপমা-উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটিকে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর ক'রে তোলেন, জীবনানন্দ সেখানে সরাসরি নির্ভর করেছেন ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরে। জীবনানন্দের গদ্যভাষায় হয়তো খানিকটা মোহিতলালের ঋণ ধরা পড়ে। হয়তো সমালোচক ও পাঠকের মনোভাবনার সন্নিপাত বিরল সময়েই সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সেখানেই রচনার ঊনতা একথা বলা চলে না, কেননা এর নিরিখ হচ্ছেন একজন পরিপ্লুত অথচ নিশিত মনোজ মল্লিনাথ।

৬

অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তীর রচনা অস্থির ও কম্পিত, ভাষা বন্ধুর ও জটিল ; চৈতন্যে আদ্যন্ত এক অটল, অনাক্রান্ত ও অপাপবিদ্ধ শুভবোধ কাজ ক'রে যায়, যে-শুভবোধ বৈদিক উত্তরাধিকার, যা আমাদের পক্ষে সর্বদা মেনে চলা অসম্ভব। তাঁর রচনার অন্তরঙ্গ নব্যতন্ত্রে কেমন-এক অধ্যাত্ম মেঘেলা সুদূরতা বিরাজ করে ; ব্যাকরণের নিজস্ব ও সুন্দর ভুলচুক যেন দ্রুত শব্দবৃষ্টির জন্যে কিংবা অন্যমনস্কভাবে গ'ড়ে উঠেছে—এই অপরূপ ঔদাস্যই অমিয়

চক্রবর্তীর ভাষাচারিত্র্য, তা যেমন সর্বথা সাহিত্যিক কনভেনশনের পরপারে তেমনি বিশুদ্ধ অনুভূতির গভীরতল থেকে আশ্চর্যরকম সরলভাবে উৎসারিত। তাঁর সম্বন্ধে সারল্য-অভিধার প্রয়োগে কোনো-কোনো পাঠকের আপত্তি হ'তে পারে, কারণ আপাতচক্ষে তাঁর লেখা দুর্বোধ্য, কিন্তু একে সারল্য ছাড়া আর কী বলা যায়?—যখন প্রকাশের কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তিনি দুরূহ কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভূতির ঝরনাধৌত দৃষ্টি তাঁর। সেজন্যেই আশ্চর্য লাগে, কিন্তু সেজন্যেই তাঁকে গভীর কবি ব'লে চেনা যায়ঃ চৈতন্যে যিনি অমন 'আধুনিক', তিনি কী ক'রে একালের দ্বন্দ্বময় আসবরক্তিম মানসের উর্ধ্বে? অমন সারল্য তাঁর এই পিচ্ছিলতার রাজ্যে কী ক'রে আসে? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো অমিয় চক্রবর্তীর জীবনযাত্রার মধ্যে নিহিত, যদি তিনি জীবনানন্দ দাশের মতো নিবিড় আত্মজীবনে বাস করতেন তাহ'লে ফল হ'তো উল্টো ঃ বরং তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বহুভঙ্গিম জীবনবিস্তারে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজেকে ঃ দীর্ঘকাল ছিলেন পরবাসে, ছিলেন তুমুল আমেরিকান জীবনে, অথচ তার স্নায়ব উত্তেজনা তথা বৈকল্য তাঁকে যেন স্পর্শও করতে পারেনি,—বাদে কাঁপা-বাঁকা এলোমেলো ভাষা, যেন তাঁর শিকড় বাংলা দেশের কোনো ছায়াশীতল পাড়াগাঁর মাটির তলা আঁকড়ে-কামড়ে আছে। মানুষ যখন কোনো বস্তুর বিবরে প্রবেশ করে, তখনই তার আধ্যাত্মিকতার উৎস খুলে যায়। অমিয় চক্রবর্তী শিল্পজিজ্ঞাসার মধ্যে কোনো-কোনো ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, সেখানে আনন্দ-বেদনা পরস্পরভেদী, একই অর্থবহ। তাঁর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে ঃ ঈশ্বরের সঙ্গে অবিরল সান্নিধ্যের কথা তিনি বলেন না, বরং বহু মানুষের যোগে যে-বিপুল ছড়ানো পার্থিবতা—তার মধ্য থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিকতা উন্মীল হ'য়ে উঠেছে; সেই স্নেহদৃষ্টি তাঁর, যা তাঁর পূর্বে বঙ্গদেশে ছিলো আরেকজনের, যে-চোখের ভিতর দিয়ে দেখলে দেখতে পাই 'জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।' —এখানে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন তুলি। জঁা জেনে, যিনি 'আত্মরতির মহাকাব্য' রচনা করেছেন ব'লেই বা রচনা করা সত্ত্বেও, জঁা পোল সার্ত্র তাঁকে 'সন্ত' উপাধি পরিয়ে দ্যান;—তখন? একজন চোর বা সমকামী, হন্তারক বা নারীধর্ষক সন্ত হ'য়ে উঠলে খুব আশ্চর্য হবার কথা নয়, কেননা ঐ-সব মারাত্মক মঞ্জুল ও ভদ্রলোকের আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মধ্যেই বিপরীতভাবে অপেক্ষা করেন কুশলী জগন্নাথ, ঐ-সব

ভয়াবহ পথের উপান্তেই সেই অবিচল রাজার প্রাসাদ, যেখানে সর্বাতিশায়ী এক অভিভব খেলা করে।—অমিয় চক্রবর্তী কিভাবে এড়িয়ে গেলেন ঐ দারুণ্যের পথ, যখন ''গীতাঞ্জলি''র উড্ডীয়মান কবিকেও একদা ''কড়ি ও কোমলে'' কণ্ঠ সাধতে হয়েছিলো?—অবশ্য কবিতা-প্রসঙ্গেই প্রধানত এইসব বিক্ষোভ সূচিত হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর গদ্যও তো ঐ একই ব্যক্তিতার শস্য, অতএব জিজ্ঞাসাটি একেবারে আত্মবিজ্ঞাপন নয়। তত্রাচ, এই শনির সময়ে নিবিষ্টতার পরম উদাহরণ তিনি। উদাহরণত, তাঁর সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত এমনই অন্তর্ভৌম যে পাস্টেরনাক প্রসঙ্গে তাঁর মতামত আশ্চর্যরকম লক্ষ্যভেদী মনে হয়। এ কালের অপ্রতিরোধ্য উগ্রতা ও তীব্রতা—যার জন্যে গ্রহ-ব্যাপী ইজম-বিলাসীদের প্রাদুর্ভাব—তা থেকে তিনি দূরে অনাথ দ্বীপের মতো অবস্থিত ঃ জ্ঞানের বেদনা জীবনযন্ত্রণা বা অহঙ্কারের অতীত। চেতন-অবচেতনের ভাষাব্যবহারে তাঁর সাফল্য বঙ্গদেশে অভিনব।

৭

বিষ্ণু দে

ভবিষ্যতের এক বিশুদ্ধ সমাজের স্বপ্নকল্পনায় বিভোর বিষ্ণু দে, যেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য লুপ্ত হ'য়ে মানসবিন্যাসই প্রধান রূপ পায়, যেখানে সামাজিক সম্পন্নতা অনেক সংঘট্ট ও সংস্কারের গ্রন্থিমোচন করে। তাঁর চৈতন্যে এসে মিলেছে একদিকে নানা জ্ঞান, অপরদিকে মার্কসীয় মানদণ্ড। সুখের বিষয়, মার্কসবাদী বিচারে গোঁড়ামির চেয়ে তাঁর সাহিত্যিক আততি স্পষ্ট। তাই রবীন্দ্রনাথের অঙ্গীকারে তাঁর যেমন বাধে না, তেমনি দেশজ পেশীর সচ্ছলতা খুঁজতে গিয়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রে তাঁর উৎসাহ। অবশ্য বঙ্কিম-বিচারে তাঁর তিরস্কৃত সিদ্ধান্ত আমার কাছে উদ্ভট না-হ'লেও অসঙ্গত ঠেকে। তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্য খশিয়ে যখন তিনি মিলতে চান লোকজীবনে ও জনসাহিত্যে তখনও কিন্তু মিনারে চত্বরে এক দূরত্ব দুর্মরভাবে থেকে যায়; বরং অন্নদাশঙ্করের প্রাতিস্বিকতায় উভয়ের সম্মিলন অনেক সহজ-সচ্ছল।

৮

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শুধু রবীন্দ্রনাথোত্তর সমালোচনাধারায় নয়, আসমগ্র বাংলা সাহিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি বিশেষ স্থান আছে, কেননা সমালোচনাকে তার

আদিম মানদণ্ডে তথা বিজ্ঞানের পেশল বুনটে তিনিই প্রথম উপস্থাপিত করলেন। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সমালোচনায় প্রবন্ধের সংজ্ঞা ভেঙে তৈরি ক'রে ও মেনে নিয়েছিলেন নিজের নিয়মাবলি; প্রমথ চৌধুরী চাতুরীর মোহে প'ড়ে মাধুরীর মর্ম বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছিলেন; মোহিতলাল স্বাবলম্বনের জ্যোতি ফোটালেও অচিরেই বিস্তালয়িক গহ্বরে পতিত হয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,—এই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুরও নাম আসে,—কাব্য ও বিজ্ঞানের বহুপ্রসারী বহুস্তর সঙ্গমে জন্ম দিলেন সেই সমালোচনা, যা বিশ্বসাহিত্যে অঙ্গীকৃত, যার একাধারে সৃষ্টিশীল অথচ তথ্যনির্ভর হ'তে বাধা নেই। সেজন্যে সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার ও সৃষ্টি করেছেন অজস্র পরিভাষা। যে-'কবির বিজ্ঞানে'র কথা আমি বলেছি, সুধীন্দ্রনাথের স্থাপত্যোৎকীর্ণ রচনাবলি, তারই আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছে: এখানে কাব্যের আবেগ তলায়-তলায় চকি তুলে চলেছে কিন্তু বিজ্ঞান যেন দেয়াল তুলে বেঁধে ফেলেছে তাকে এবং ঐ সঙ্গতির ভাস্কর্য বাংলা ভাষায় বিস্ময়কর, হয়তো সংস্কৃত আর ইংরেজির বর্ণসংকরে গঠিত ব'লেই সেটা সম্ভব হয়েছে। বস্তুত, কখনো মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যে বুঝি গদ্যেরই চর্চা ক'রে গেছেন, অন্তত তাঁর গদ্য-পদ্য-যে একই পরীক্ষার শস্য তা বুঝতে দেরি হয় না। তাঁর গদ্য-পদ্য, উভয়েরই সামান্য লক্ষণ: পরিভাষার ব্যবহার, অব্যয়ের প্রাচুর্য, ক্রিয়াপদের সচ্ছলতা প্রভৃতি। তাঁর গদ্যভাষার প্রতিটি বাক্য পরস্পরসমন্বিত, প্রতিটি প্রস্তাব যুক্তির সযত্ন সজ্জায় স্থির এবং এদিক থেকে বিষ্ণু দে'র একেবারে বিপরীত। মনে হয়, এই কবি-সমালোচক ইএট্স-নির্দেশিত বিপরীত স্বভাবের দিকে বড়ো বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন। স্বভাবজড় বঙ্গদেশে সুধীন্দ্রনাথই বোধহয় এমন বিস্তারিতভাবে তাঁর সমকালীন বিশ্বের লেখকদের বিচারে নেমেছিলেন এবং নবপর্যায়ে বঙ্গদেশে বিশ্বের মানদণ্ড রচিত হ'লো প্রধানত তাঁরই মানদণ্ডে। অপিচ, রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ পৌরোহিত্যেই বঙ্গসাহিত্য দর্শনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে।

৯

উত্তরভাষণ—এক

এই সাতজন লেখক পরস্পরের অজ্ঞাতসারে যেন হাত ধরাধরি ক'রে উত্তররৈবিক প্রবন্ধধারাটি ব'য়ে নিয়ে এসেছেন সমকাল অবধি।

তদানীন্তন কবিতার মতো হয়তো সমালোচনা অতিরৈবিকতায় জর্জরিত হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু তাহ'লেও সমালোচনা খুঁজছিলো নূতন দৃষ্টির কোণ, পুরোনো ফাটিয়ে নবীনের আবির্ভাব, সমগ্র বঙ্গসাহিত্যই তখন একটা মোড় ফেরার জন্যে প্রাণপণ প্রতীক্ষা করছিলো। রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এঁদের পরে নবীনের বুঝে নিতে হ'লো আত্মচিকিৎসা; যেহেতু নবীনতা শুধুমাত্র কবিতা ও কথকতায় সংক্রান্ত হ'তে পারে না, তাকে আসতে হয় সাহিত্যের শিরাউপশিরাময়, অতএব স্বাভাবিক কারণেই সমালোচনারও পূর্বোক্ত প্রতিকৃতি খ'শে গিয়ে ফ'লে উঠলো নবপর্যায়। রবীন্দ্রবাহিত চতুর্ধারব্যাপী বাংলা কবিতা পরবর্তীকালে যেমন কএকজনের স্বরূপের স্কন্ধে ভাররক্ষা করেছিলো, তেমনি সমালোচনা একজন মহাবল রবীন্দ্রনাথের পরে এই সাতজনের ভিতরে পূর্বাপর রক্ষিত হ'লো। রাজাধিরাজ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বঙ্গসাহিত্য স্খলিত হ'য়ে পড়েনি, এটাই তার গৌরবের একটি মানদণ্ড, কবিতায় যেমন সমালোচনাঙ্কিত শিল্পমাধ্যমেও নব-নব পথচারী ক্লৈব্য ও শৈত্যের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে। এঁরা সকলেই সূর্যের ছেলের মতো; এঁরা সকলেই সাহিত্যিক প্রতিভায় ধনী এবং সমালোচনা নামক পরধর্মে ব্যবসায় বিস্তার বাদেও আপনকার সৃষ্টিশীল স্বাক্ষরে কীর্তিমান। এবং সেজন্যেই তাঁদের চরিত্রানুযায়ী সমালোচনাকর্মেও অকপট মননচর্চার পরিবর্তে আপনাপন ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রা অনায়াসে চিহ্নিত করেছে।

১০

উত্তরভাষণ—দুই

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মক্ষণে সাময়িকপত্রে যে-প্রবন্ধ রচনার সূচনা হয়েছিলো তা খবর-কাগুজে রচনার সমান্তরে দীর্ঘদিন জীইয়ে রেখেছিলো নিজেকে; ততোক্ষণ, যতোক্ষণ-না সৃষ্টিশীল প্রতিভা হাতে তুলে নিয়ে বিদ্যুত্বান গহনামালা পরিয়ে দিয়েছিলো তার সর্বাঙ্গে। ফলে তথ্যের পঞ্জীকরণে আর সে সন্তুষ্ট থাকেনি, কাব্যের পরশে যেন অন্ধকার ঘরের আশবাবগুলি আলোকিত হ'য়ে নূতন হয়ে উঠলো এক-মুহূর্তে। হ'লো একই সঙ্গে পেশল ও নমনীয়, অর্থাৎ বহু বিভিন্ন ভাবনা-বেদনাকে ধারণ করতে শিখলো; নির্মাণ আর রইলো না, হ'য়ে উঠলো সৃষ্টি।

এখনও, আকাডেমিক খাতে বইছে যে-সমালোচনা, তার মধ্যে নিরঞ্জন তথ্যের বিস্তার ও সরলে সমর্পিত ভাষার বুনট প্রধান লক্ষ্য হ'য়ে আছে।

সেকালে, এমনকি পদ্যেও লিখিত হয়েছে প্রবন্ধ, আগে ও পরে ঈশ্বর গুপ্তের হালকা কবিতা অবধি তার পরোক্ষ অভিসার, কিন্তু কবিতা-দ্বারা দুঃস্পৃষ্ট র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয় এমনকি পরবর্তীকালেও অনেকদিন অবধি। পক্ষান্তরে লক্ষণীয়, এ-কালের প্রবন্ধ মৌল যুক্তি বুদ্ধি-জ্ঞানের মেরুদণ্ডে, যদিচ সুস্থির, তথাচ কবিতাক্রান্ত। অন্নদাশঙ্কর যাকে বলেছেন 'নিশ্চিতি', বিষ্ণু দে 'জীবনপ্রত্যক্ষ', আর আমাদের সাধু সমালোচকেরা 'জীবন-দর্শন', লেখকে-লেখকে তার অচ্ছেদনীয় ভিন্নতা সত্ত্বেও, দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্র-পরবর্তী সমালোচনা অল্পবিস্তর কবিতার আক্রমণে বিত্তবান, যেন মননজীব মেরুদণ্ডটিকে সজীব, রমিত ও নিঃশ্বসিত ক'রে তুলছে প্রতিবাসী কবিতা। কিন্তু এটা বোধহয় বাহুল্য উক্তি;—কারণ বঙ্কিমের সুবিন্যস্ত অনুচ্ছেদবিভক্ত 'রমণীয়' গদ্য, বিশালভারি রবীন্দ্রনাথ, স্পন্দিত-প্রতিস্পন্দিত এয়াকুব আলি চৌধুরী ব্যঙ্গপরায়ণ প্রমথ চৌধুরী, ইন্দ্রিয়পর বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাডেমিক মোহিতলাল অথবা প্রাকৃত-চিত্রল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাউকেই এই তালিকা থেকে ছেঁটে দেবার উপায় নেই, যেমন উত্তররৈবিক ঐ সাতজন মননজীবীকেও বাদ দেয়া চলবে না।

সুতরাং—সুতরাং কোন দিকে, কোন দিকে-দিকে আমাদের প্রবন্ধ রুদ্ধশ্বাস আকাডেমিক আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে, তার একটি কল্পিত নকশা ছ'কে তোলা যায়,—কিন্তু একেবারে আকল্পনা নয়, সাম্প্রতিক প্রবন্ধের ঝোঁক ও লক্ষণ তার ভিতরে টায়ে-টায়ে নিহিত।

বুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞান, এতোকাল যেগুলি ছিলো প্রবন্ধ রচনার প্রাথমিক ও অন্তিম শর্ত, সেগুলি যেন মহাজনদের অতিবাক্যময় ব্যবহারে-ব্যবহারে-ব্যবহারে নিঃশোষিত; যেন ঐসব শৃঙ্খলবদ্ধ পুরোনো অস্ত্রে মরচে প'ড়ে গেছে, তা দিয়ে খুব বেশিদূর যাওয়া যাবে না, চেতন-অবচেতনের দ্বৈতাদ্বৈত থেকে শূন্য হস্তে ফিরে আসতে হবে। একালের সমালোচনা ধ'রে রাখতে চাচ্ছে সেই অন্তর্লোকের বহুলাঙ্গ সংঘট্টসমূহকে, বুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞানের সাধ্য নেই যে-অজায়মান, অঘাতনীয়, অনাক্রমণীয় অপরিচয়কে শনাক্ত করে; আহিম, সদ্যঃপাতি, দুর্দমনীয়, দুঃসম্প্রাপ্ত, নীরেখ ও পরিবর্তমান স্তরগুলিকে সমালোচনার প্রাক্তন সাঁড়াশি দিয়ে তুলে আনা যাবে না আর—চেতনশীলের

কাছে একথা আজ আর অজ্ঞাত নেই। সমালোচকদের দূরে যেতে দিতে হবে, ভিতরে, এই মনোভাব থেকেই এমনকি এরকম সাহস হয়েছে প্রবন্ধের মৌল ও জরুরি উপচারগুলিই ঝেড়ে ফেলার। বদলে সে তুলে নিয়েছে যুক্তিহীনতা, পারম্পর্যহীনতা, স্বপ্ন, সঞ্চার, অবচেতন ও প্রকল্পনাকে,—যেগুলি নূতন ও সনাতন সৃষ্টিশীল সাহিত্যের প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

হয়তো য়ুরোপের পরিত্যক্ত আন্দোলনগুলি এক-লহমায় অতিক্রম করতে চাচ্ছে নূতন বাংলা সমালোচনা; হয়তো তাকে যেতে হবে সেই গতাসু দাদাবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, নিহিতার্থবাদ বা আর কারো কাছে, অর্থাৎ অবচেতনায়, অর্থাৎ নূতনের, এবং সেখানে দেখা যাবেঃ হঠাৎ একালের সেই আশ্চর্য কবি, নিঃশব্দ জীবনানন্দ এসে দাঁড়িয়েছেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁকে—শুধু কবিতা নয়, সাহিত্যের অপর এক প্রোজ্জ্বল শাখারও প্রথম পথিকৃৎ ব'লে মেনে নিতে হবে তথা অবচেতনার সমালোচনার প্রথম নিষ্ণাত রূপকার।

অনন্তর, এই সমালোচনারীতির সঙ্গে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সম্বন্ধপাত না-করলে অন্যায় হবেঃ কবিতা ও কথকতা, সম্প্রতিকালের, এরই সম্ভ্রমসঙ্গত পরিপার্শ্বে নির্ধারিত, স্রোতগ যাত্রার সহচর। সমালোচনার এই শৈশবার্জন, এই কৈশোরাচ্ছন্নতা আমূলপ্রোথিত সব পুরুষার্থের শিকড়ে আঘাত হানলেও বস্তুত সে কিন্তু কৈশোরিক নয়, ওটা তার ছদ্মবেশ, আসলে পরিণত পরাক্রান্ত পুনরুত্থানের পূর্বে স্বসমুখ উচ্চারণ। হয়তো এই মুহূর্তের বাংলা নূতন সমালোচনারীতি অতিব্যক্তিগত ও আত্মক্রীড় হ'য়ে পশ্চাদ্-ও সম্মুখবর্তী অনেক অন্ধকার ও অশুদ্ধতা ক্ষালন ক'রে নিতে চাচ্ছে; অন্তত তাই হোক, অন্তত তাই আমরা চাই—নবীনতায় অবগাহন যেমন আমাদের কাম্য তেমনি চাই সে একদিন পিতৃলোকপ্রদত্ত চিরকালের পুরাতনের দীপ্যমান অঙ্গুরী ধারণ করবে তার স্মারকে আঙুলে। এই মুহূর্তের মননশীল আলোচনা-সমুচ্চয় আঁদ্রে ব্রেতোঁপ্রোক্ত 'ভাবনার যথার্থ পদ্ধতি' অনুধাবন করতে গিয়ে ঈষৎ অস্থির ও জঙ্গম হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু বাংলা সমালোচনা আবার স্বস্থ উদ্ধারে ফিরে আসবে মনে হয়, উপর্যুপরি আঘাতের অন্তিমে দেখা যাবে নিজেকে সে পুনর্জাত সরলে সঁপেছে॥ [১৯৬৫]

আধুনিক সাহিত্যের মূলসূত্র

এজরা প্যাউণ্ড-এর 'চেতাবনী' অনুসারে কএকটি গঠনতান্ত্রিক কানুনের জন্যে বা কএকটি সংজ্ঞার উপযোগী হওয়ার জন্যে (যেগুলি সম্বন্ধে সম্ভবত লেখক নিজেও অবহিত ছিলেন না) ক্লাসিক ক্লাসিক নয়; বরং তা ক্লাসিক চিরন্তন ও দুর্মর সজীবতার জন্যে। আধুনিক অভিধাটির প্রসঙ্গেও অনুরূপ কোনো সত্যের শাঁস ছেঁকে তোলা দরকার: হয়তো আধুনিকতা ঐ সহগ চিরন্তন সচলতা ও দুর্মর সজীবতা অর্থেই একমাত্র ব্যবহারযোগ্য,—নতুবা কেবল সময়ের মানদণ্ডে আধুনিক শব্দটির প্রয়োগ চলতে পারে না; কারণ, সময় মূলত অনচ্ছতা হটিয়ে কাল্পনিক বিভাজনমাত্র; কারণ, সময় পরিবর্তমান অগ্রসরমান। অবশ্য, প্রথমেই স্বীকার্য, যেমন সময় প্রসঙ্গে তেম্নি আধুনিকতা বিষয়েও মূল অনচ্ছ সারসকে ত্রস্ত মানসসরোবর থেকে কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। সাধারণভাবে 'আধুনিক' কথাটিকে 'সাম্প্রতিক' অর্থে ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু, বলা বাহুল্য, আধুনিক ও সাম্প্রতিক শব্দযুগের অর্থব্যবধি মেরুপ্রমাণ: সাম্প্রতিক কেবল সমকাল সম্পর্কিত এবং আধুনিক চিরসময়ের জন্যে, সাম্প্রতিক মূলত ক্ষণিকা এবং আধুনিক চিরন্তনী। আধুনিক অভিধার এই অর্থব্যাপ্তি কিছু ভুল-বোঝার ভেলকি নিমন্ত্রণ ক'রে আনলেও শেষ-পর্যন্ত অমন সম্বন্ধপাতই সম্ভ্রমসঙ্গত লাগে। আবার, আধুনিক কথাটির ভিতর সমকালও প্রদীপিত হ'য়ে আছে; সুতরাং আধুনিক কথাটিকে ভেঙে 'ঐকাহিক' ও 'আধুনিক' এই দুই অর্থে ব্যবহার চলতে পারে। ঐকাহিক সাহিত্যের মধ্যে আধুনিকতার কুললক্ষণ তিরস্কৃত না-হ'লেও তা আসলে ক্ষণস্থায়ী এবং চিরকালের সাহিত্যমাগে উন্নয়ন তার পক্ষে সম্ভাব্যের পরপারে; পক্ষান্তরে, আধুনিকতা সাহিত্যে অঙ্গীকৃত হয় দীর্ঘসময়বিসারে। ঐকাহিক সাহিত্য ভীষণরকমে ক্ষণভঙ্গুর, সেজন্যে

সংবাদপত্রের চেয়ে দীর্ঘায়ু হ'লেও প্রায় তারই সমান্তর এবং স্থায়িত্ব—এই ব্যাপারটি সাহিত্যের তথা আর্টের পশ্চাতে অভিস্নাত। অপিচ, আধুনিকতা যতোক্ষণ পর্যন্ত সচল সৃজনীতে প'ড়ে সাহিত্যে জয়ী ও সার্থক না-হয়েছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে মূল্যহীন। এই গ্রহের সাহিত্য কবে থেকে এই আধুনিকতায় আলিখিত হ'তে থাকলো, তার স্পষ্ট সময়-সীমা নির্ধারণ সম্ভব নয়; কিন্তু এ তথ্য সন্দেহের পরপারে যে তথাকথিত প্রাচীন সাহিত্যে শুধু সুপ্তই ছিলো না আধুনিকতার প্রাণবল্লী বীজ, প্রাচীন সাহিত্যেও ঢের আধুনিক—খুঁজে দেখলে, আজকালকার কুখ্যাত ও ভীষণ ভীষণানাং বিষয়বস্তুর জিনিশও পাওয়া যাবে। উপরের উক্তির শোভাভূমিকায় অতঃপর এরকম সিদ্ধান্ত করা যায়ঃ সময়ের সহিত আধুনিকতার কোনো গূঢ়চারী সম্পর্ক নেই সম্ভবত, যদিচ আধুনিকতা মোটামুটি একালেই সৃষ্ট ও নির্দিষ্ট।

অনেক অনচ্ছতা নিরাকৃত ক'রে আধুনিক সাহিত্যের শবলিত লক্ষণ-প্রচয় স্পষ্টভাবে মর্যাদাজাগ্রতভাবে রেখায়িত হ'লো, পূর্ণের পত্রাবলী ছড়িয়ে পড়লো, যখন কবিতায় শার্ল বোদলেঅর ফোটালেন "ক্লেদজ কুসুম" এবং কথাসাহিত্যে ফিওদর দস্তএভস্কি রচনা ক'রে দিলেন "ভূতলবাসীর আত্মকথা"। আধুনিকতার পুরোভাগে স্বাধিষ্ঠিত হ'য়ে আছে এই রচনাদ্বয় - যদিও, বলা হয়তো বাহুল্য, শিল্পসাহিত্যে রাতারাতি কিছুই ঘটে নাঃ দেখা যায়, বিশ্বসাহিত্যে আরো-অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবি-কথকের মধ্যে আভাসিত হ'য়ে উঠেছিলো সেই লক্ষণপ্রচয়, যাকে আধুনিকতা ব'লে শনাক্ত করা হয়েছে—সেই লক্ষণপ্রচয় দেখা দিলো এঁদের রচনায়ঃ স্বীকারোক্তি, আত্মসমীক্ষণ, মরণরহস্য, চেতনাস্বামী, নাগরিকতা, নাস্তির শারীররেখা, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি। এইসব, যেগুলি আধুনিকতার অবার্ধ ও অনিবার্য লক্ষণ ব'লে স্বীকৃত, হয়তো এই সকলের সাচীকৃত লক্ষণটিঃ ব্যক্তিতা; ফলত আমরা দেখলাম, কবি বোদলেঅর ও কথক দস্তএভস্কি আপনাপন রচনার মধ্যে শিহরিত শিকড়ের মতো প্রবেশ করেছেন, ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন শিরাউপশিরাময়, আপনাপন রচনার মধ্য থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন বা উচ্ছিন্ন করা অসম্ভবেরই নামান্তর; ব্যক্তিতাঃ এটাই হচ্ছে সেই আদি আত্মা—যার প্রত্ন-নব্য কোলে সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বিলম্বিত, এমনকি আধুনিকতার বিচিত্রমুখ আন্দোলনের মূলে সে-ই একমাত্র মৌলিক অগ্নি। বাংলা সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিলে

কথাটি স্পষ্টতর হবে। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে কবি তাঁর পরিচয় দিতেন কাব্যের প্রথমে (কোনো-কোনো সাহিত্যে কবিপরিচয় দেয়া হ'তো কাব্যের অন্তিমে)। অতঃপর বাংলা সাহিত্যে যখন আধুনিকতার সূত্রপাত হ'লো, তখন কবি তাঁর পরিচয় আলিখিত ক'রে রাখলেন রচনার আস্তন্ত শরীরে, অর্থাৎ আত্মায়ঃ মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্যে" কবিপরিচয় এক সপ্তস্তন আবরণীর আধার, একথা অনেক সমালোচক জানিয়েছেন এবং তাঁর পরবর্তী "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে ঐ আবরণী সরিয়ে কবি বেরিয়ে এসেছেন প্রকাশ্যের চতুষ্কোণ জ্যামিতিতে। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে সেই প্রাথমিক কবিপরিচয় কেবল বংশতালিকা জন্মভূমি কাব্যরচনার কারণ ইত্যাদি বহিরঙ্গবর্ণনায় ফুরিয়েছিলো এবং আধুনিককালে কবি তথা লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয় সমগ্র রচনাশরীরে চারিত্র্যের নামে মুদ্রাঙ্কিত ব'লে সেখানে কবিকে আমরা গভীরতরভাবে চিনে নিতে পারি।

বিশ্বসাহিত্যে আধুনিকতার স্বপ্নোত্থান এই রচনাযুগের প্রথম প্রকাশকাল প্রায় একসঙ্গেঃ 'ভূতলবাসীর আত্মকথা", ১৮৬৪; "ক্লেদজ কুসুম," ১৮৫৭। "ভূতলবাসীর আত্মকথা" আত্মবিশ্লেষণে ও আত্মনির্মোচনে যেন কালো ঝড় বাজাতে-বাজাতে উপস্থিত হয়েছিলো পৃথিবীতে একদিন; "ক্লেদজ কুসুম"-ও তাই, সেখানেও এক তুমুলগাঢ় নাস্তির নিরালোক সাম্রাজ্যঃ কিন্তু বস্তুর একেবারে অন্তরাত্মায় প্রবেশ করলেও কবিকে যেন কিছুই স্পর্শ করে না, কবিতা যেহেতু অনাবিদ্ধিয়ের তড়িন্ময় অতএব কবির যেন মাটিতে পা পড়ে না, যেন তাঁর বিষণ্ণতম ভাবনা মধুরতম সঙ্গীতে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। সুতরাং বোদলেঅর-কে যে-অনাক্রমণীয় দূরত্ব বজায় রাখতে হয়েছিলো সনেটের কেলাসিত রূপবন্ধে ও কবিতার অনিবারণ আইনে—সেখানে দস্তএভস্কি গদ্যের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন দেশে বিস্তার ক'রে দিলেন তাঁর গম্ভীর যুযুধান ও আত্মক্রীড় ভাবনা-বেদনাকে, এবং ব্যাপ্তভাবে ধ'রে রাখলেন সেই অন্তঃপ্রদেশকে, যা হিংস্রভীষণ চেতনদেহলীর গদ্‌গদ ক্ষরণে নিরত। এই পুস্তকের নামহীন নায়ক আপনকার বিকৃত ব্যক্তিত্বের ও অনুভূতির এরকম বিশ্লেষক, যা নিষ্ণাত শল্যবিদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিশেষে, এই আত্মব্রত চব্বিশ বছরের যুবাটি উপলব্ধি করেঃ তার আপনকার স্বভাবের মূল বৈপরীত্য আসলে প্রবৃত্তি ও যুক্তির বিরুদ্ধতাজাত ; তাহ'লেও অন্তর্গত উপপ্লবের মীমাংসা অসম্পাদ্য থেকে যায় এবং সে ফিরে

আসে নিজের সেই বহুলাঙ্গ জগতে এবং সকলের প্রতি ভীষণ আক্রোশে জ্বলে। এই ক্ষমাহীন উপন্যাসটিতে মানুষের বিচার-শক্তি-শূন্যতার প্রতি দোষ প্রতিপাদনে তৎকালীন দস্তএভস্কির নিজস্বই প্রতিফলিত। এই উপন্যাসটির নায়ক, যার নাম পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়, শুধু দস্তএভস্কি-রই পরবর্তী দ্বন্দ্বপীড়িত ভাবনার রাস্‌কল্‌নিকভ্‌ বা আইভান কারামাজভ্‌-এর উপর প্রভাবসম্পাতী না বরং অদ্যাবধি পৃথিবীর সকল আধুনিক সাহিত্যে। "ভূতলবাসীর আত্মকথা"-র সূচনাংশ এইরূপ:

> আমি একজন অসুস্থ লোক......আমি একজন ঈর্ষাপরায়ণ লোক। আমি একজন অনাকর্ষণকারী লোক। আমার মনে হয়, আমার যকৃতের রোগ আছে। অবশ্য, আমার রোগের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আর জানিনা কী আমাকে যন্ত্রণা দ্যায়। এর জন্যে আমি কোনো ডাক্তার দেখাইনি, যদিও ওষুধ আর ডাক্তারের উপর আমার শ্রদ্ধা আছে। তাছাড়া আমি ভীষণভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন......(কুসংস্কারাচ্ছন্ন না-হওয়ার মতো ভালোভাবে আমি শিক্ষিত যদিও, তবু আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন।)

"ভূতলবাসীর আত্মকথা"-র প্রথম খণ্ডে নায়কের ভাবনা বেদনার উৎসরণ-নিঃসরণ কেবল শায়িত; দ্বিতীয় খণ্ডে চরিত্রটির মনের ও মননের ঘর ছেড়ে খানিকটা বাস্তব জগতের পরিচয় মেলে: এই নির্গোল কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর হৈচৈয়িক ও ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের রাজ্যে পরম বিস্ময়কর—অবশ্য কেবল আশ্চর্য-জ্ঞাপনেই নিঃশেষিত নয়, শিল্পোৎকর্ষেও পরাক্রান্ত; বুঝে নিতে দেরি হয় না যে এটি খেয়াল, বিলাস বা শৌখিনতার শস্য নয়, লেখকের ব্যক্তিস্বরূপের বহুলাঙ্গ স্বতোৎসারে বহুস্তর দ্যুতির বিচ্ছুরণে মনের মৃত্তিকার মধ্য থেকে উত্থিত। ডায়েরির ভঙ্গিতে রচিত এই উপন্যাস "ক্লেদজ কুসুমে"রই সহোদর: সেখানেও বোদলেঅর-এর শিল্পসারে তাঁকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায় যন্ত্রণার সন্তানরূপে, সেখানেও মানবাত্মা সেই যাতনার রঙ্গভূমি যার উপর ঈশ্বর ও শয়তানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে, উভয়েরই জাগর চৈতন্য দ্বৈরথ সমরে একা মায়াবী-ভীষণ আরশির মতো দণ্ডায়মান, প্রত্যেকটি বহির্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার চলছে অন্তর্দেশে, যেন উভয়েই ধর্মমন্দিরে স্বীকারোক্তি দিতে বসেছেন—এমন মনে হয় আমাদের এবং বুঝতে দেরি হয় না এঁদের জন্যে পাত্র ভ'রে প্রতীক্ষা করছে ঈশ্বরের করুণা। দস্তএভস্কির উপন্যাসে প্রথম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে সেই চিরকালের ভাবনায়-পাওয়া জ্ঞানঋষিরা যা ব'লে থাকে, তেমনি ভাবে বলা হয়েছে:

'মোটকথা, ভদ্রমহোদয়গণ, কিছুই না করা ভালো! চৈতন্যের নিষ্ক্রিয়তাই ভালো'। বোদলেঅর-এর কাব্যেও অনুরূপ প্রতিবেদন প্রতিধ্বনিত।

এই স্বীকারোক্তির সাহস তথা চৈতন্যের নিরঙ্কুশ বিবৃতিরচনা আধুনিক সাহিত্যের জগচ্চিত্রে বিজয়ীর স্বাক্ষর রেখেছে, এবং মনে হয়, এরকম অকুণ্ঠ ও নির্নিগড় স্বীকৃতি তথা চৈতন্যের অনুধাবনেই অপাবৃত হ'তে পারে মানবাত্মার সেই স্তরগুলি যেগুলি অপ্রকাশের গর্ভাঙ্কে লুকিয়ে থাকে। ফ্রানৎস কাফ্‌কা-র উপন্যাসের নায়ক কেবল 'ক' চিহ্ন-দ্বারা শনাক্ত; লক্ষণীয়, কাফ্‌কা-র নামের আদ্যক্ষরও তাই; মার্সেল প্রুস্ত-এর "হারানো দিনের সন্ধানে" উপন্যাসের নায়কের নাম মার্সেল।—এগুলিকে কি নিতান্তই আপতন বলা চলে? এই আত্মচৈতন্যই আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে অবচেতনলোকের উচ্চাবচ খোড়লে-খোড়লে প্রবেশাধিকার দিয়েছে; কবিতায় যখন চেতন-অবচেতনের দ্বৈতাদ্বৈতে পশ্চাদভ্রমণ করেন কবি, তখনও তুঙ্গ, গোপন ও হাড়হিম নিজেকেই পরিপূর্ণভাবে রূপায়ণের ইচ্ছা তাঁর থাকে। নিহিতার্থনিষ্ঠাবাদ, দাদাবাদ, প্রকাশবাদ প্রভৃতি বৈদেশি ক্ষণিক-রঙিন আন্দোলনসমূহের মূল লক্ষ্যই ছিলো অবচেতনলোকের সত্য আহরণঃ চিত্রশিল্পে এই তিমিরাভিসার স্বাভাবিকভাবেই অনেক অলোকসামান্য ফসল ফলিয়েছে এবং ভাষা-সাহিত্যে অমন উচ্চল-উজ্জ্বল সার্থকতা না-পেলেও একেবারে বৃথায় যায়নি—নিঃসূর্য দ্বীপহীনতার দিকে তরণী নিয়ে ভেসে পড়ার দিক দেখিয়েই তার কাজ ফুরোয়নি, বিভিন্ন পরোক্ষদীপ্ত বাণীনির্মাণ তারই ফলশ্রুতি। স্বীকারোক্তির এই সাহসের বলেই ইংরেজি কাব্যের একালের তিনজন নবগ্রহের অন্যতম উইলিঅম বটলর ইএট্‌স্‌-এর উত্তরকাব্য সংরক্ত হ'য়ে উঠলো তীব্র-দীপ্র যৌনতায়। আর প্রয়তাত্মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁর মুখচ্ছদ ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ নিপুণতা সম্ভবত একদিন কোনো-এক সমালোচক ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখাবেন—তিনি বৃদ্ধ বয়সে এমন-সব রহস্যময় চিত্র অঙ্কন ক'রে দিলেন, যার মধ্যে একজন উইলিঅম আর্চর পেলেন ফ্রয়েড-এর উন্মাতাল লিবিডোকে। আর, হেনরি মিলার, যাঁর রচনাবলি একালে সম্ভবত সবচেয়ে বেশিবার আইনে দণ্ডিত হ'য়ে জীবনের শোভা দেখেছে, তাঁর লেখাবলি তো 'একটি অসমাপ্ত আত্মজীবনী মাত্র'; তিনি নিজেই বলেছেন,

'আমার পুস্তকগুলি যৌনসংক্রান্ত নয়, কিন্তু আত্মমুক্তিসম্পর্কিত।' লরেন্স ডারেল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে হেনরি মিলার একদিন ব্লেক বা হুইটম্যান-এর মতো প্রাতঃস্মরণীয়ের পর্যায়ে পৌঁছোতে পারেন, সেটা মোটেই অদ্ভুত মনে হয় না। কারণ স্বীকারোক্তির সাহসবিস্ফারেই মানুষের দোষ স্খালন হ'য়ে তার অগ্রসরতার পথ খুলে দেয়।

টমাস মান এর কোনো-এক উপন্যাসের কোনো-এক স্বসমুখ চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করেছিলো যে, সাহিত্য 'আমন্ত্রণ নয়, অভিশাপ'। বর্তমান ও অনুপস্থিত চিরসময়ের শিল্পসাহিত্যে তার মুহুর্মুহু সাক্ষ্য ছড়ানো; প্রতিটি শিল্পীজীবন নরকাভিসারী, কেননা নরকেরই বুকের ভিতর ধারাবাহিক বহুদূর চ'লে গিয়ে স্বর্গ তুলে আনতে হয়, হু-হু জ্যোৎস্নার মধ্যে অতিরিক্ত আলো ফেলে চ'লে যেতে হয় আত্মহননের পথে; অথবা অমন আত্মহননই শিল্প একএকজনের নিজের জন্যে। বস্তুত প্রতিটি লেখকই ভূতগ্রস্তভাবে অসীমের পশ্চাদভ্রমণে অভ্যস্তঃ নিজে সর্বাংশে ম'রে গিয়ে, অন্যসব জায়গায় প্রায় স্বেচ্ছাকৃত পরাজয় মেনে, চৈতন্যকে একটিমাত্র অনাথ দ্বীপে কেন্দ্রীভূত করেন শিল্পী, তাই তাঁর চরম শিল্পচেষ্টা তাঁরই মৃত্যুর ওতপ্রোত শস্য মুক্ত ক'রে রাখে মর্ত্যের আসল বিছানায়। উপর্যুক্ত অন্তর্বিপ্লবের স্বর্গ নরকের সমঞ্জস আলোকে শিল্পজীবন রচিতঃ শিল্পীর বৈপরীত্যের কাছে তাই সাধারণ ভয়ানক পর্যুদস্ত, একাধারে অমন মমত্বময় নিষ্ঠুরতা তার কল্পনাকে অতিক্রম করেঃ জন্মদুষ্ট, স্বেচ্ছানীচ কেবলি সম্ভাব্য কিন্তু কখনো সিদ্ধার্থ নয়, নিরন্তর পরাজিত ও অনুক্ষণ সচেষ্ট। তাই টমাস মান-এর মতো দেবোপম ও বুর্জোয়া ঘরের সন্তানের তীব্র আকর্ষণ দেখি অবক্ষয়ের প্রতি তাঁর গল্প-ও উপন্যাসগুচ্ছে। অবক্ষয়ের চিত্রণে স্বভাবতই কাব্যের চেয়ে কথকতা অনেক তুমুল ও তীব্র হ'তে পারে—এ প্রসঙ্গে দুজন আমেরিকান লেখক উল্লিখিত হ'তে পারেনঃ উপন্যাসে উইলিঅম ফকনর ও নাট্যে ইউজিন ও-নীল—কেননা কাব্যের ক্ষেত্রে মৃত্যু বা ঈশ্বর হচ্ছেন সেই ধ্রুবা, সেই বাঞ্ছিত পরম যার ভিতরে নাস্তির পাহাড় যেন মেঘের ভিতরে লীন হ'য়ে যায়। অপর একজন জর্মান, রাইনে মারিআ রিলকে, যিনি লক্ষ্য করেছিলেন 'নিজের ভিতরেই প্রত্যেকে/বহন করে তার মৃত্যুকে' স্পষ্টত ঈশ্বরের অভিভবে রমিত ছিলেন। একই মৃত্যুচেতনা কথকতা ও কাব্যের ক্ষেত্রে কী বিপরীত ফসল ফলায়,

টমাস মান ও রাইনে মারিআ রিলকে-র শিল্পপরিসরে তা বিধৃত ঃ কথকতা তীব্র, অস্থির ও অবিশ্বাসী ; কবিতা উদাস, বিমুগ্ধ ও সমর্পিত।

বস্তুত, জীবন ও মৃত্যু, মানব ও নাথ ঃ এই সব চিরকালীন প্রহেলিকা-সমুচ্চয় একালের সাহিত্যেরও উপজীব্য বটে। হেনরি মিলার বলেছেন, লরেন্স জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং প্রুস্ত ও জয়স মৃত্যুর। ডি. এচ. লরেন্স, একালের উল্টোনো ক্রাইস্ট, যেন অনেকানেক শিল্পীর তথা এই বিধ্বংসী সময়ের অন্তরিত জিজ্ঞাসার উত্তর ব'য়ে নিয়ে এলেন তাঁর আদিম দেহধর্মের প্রত্যয়বাচ্যে। এই প্রসঙ্গেই ব'লে রাখি, জেম্‌স্‌ জয়স-কে খানিকটা বাঁকাভাবে 'কথা, কথা, গান নেই' ব'লে আক্ষেপ করেছেন ই. এম. ফর্স্টর ; কিন্তু জন কীট্‌স্‌-প্রোক্ত সত্য-সুন্দরের অন্যোন্যসম্পর্ক আজ অবিশ্বাস্য মনে হয় ; বিংশ শতাব্দী নিশ্চয় প্রমাণ করেছে ঃ সাহিত্যের লক্ষ্য সৌন্দর্য নয়, সত্য। এই সত্যসন্ধিৎসাই ছিলো জয়স-এর উপজীব্য ঃ তাঁর "য়ুলিসিস" অনুলাপ মাত্র নয়—যেমন একজন সমালোচক বলেছেন, বরং একালীন জীবনেরই মহাকাব্য এবং এই উপন্যাসের অন্তিমে মিসেস মারিআন ব্লুমের বহমান যতিচিহ্নরহিত ভাবনাপ্রবাহে 'yes' শব্দোব্যবহারে সম্ভবত জীবনের ইতিবাচক দিকের প্রতিও লেখকের তর্জনীনির্দেশ অগুপ্ত নয়। লরেন্স অবশ্য তাঁর চেয়ে বড়ো শিল্পী, স্বাভাবিক শক্তিতে আরো অনেকের চেয়ে বড়ো এবং মহৎ এবং একালের সাহিত্যের এক প্রধান প্রতিনিধি ও দিক্‌নির্দেশক। বস্তুত জয়স মননজীবী এবং লরেন্স হৃদয়জীবী ; উভয়েই তাদের রচনাকে আপনাপন বক্তব্যপৃষ্ঠে স্থাপন করেছেন, আদর্শায়িত করেছেন ; জয়স-এর জগৎ গ্রন্থময় ব'লে ঈষৎ নীরক্ত ও পাংশু এবং লরেন্স-এর নায়ক-নায়িকা মৃত্তিকার সন্তান ব'লে সজীব ও প্রাণবান। জয়স ও লরেন্স ঃ এই দু'জন যেন মৃত্যু ও জীবনের উপচারে আধুনিক সাহিত্যের চতুর্ধারব্যাপী তিলকরেখা টেনে দিলেন এবং দেখিয়ে দিলেন তারও উপচার সমগ্র জীবন।

দস্তএভস্কি-র ভূতলবাসের পরবর্তী পর্যায় বুঝি রচিত হ'লো ফ্রানৎস কাফ্‌কা-র 'রূপান্তর' নামক গল্পে। গল্পের নায়ক গ্রেগর সাম্‌সা একদিন ভোরবেলা নিজেকে পতঙ্গ ব'লে আবিষ্কার ক'রে বসলো। ঘরের ভিতর স্বেচ্ছাবন্দী এই ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি চাকরি থেকে অচিরে খারিজ হ'য়ে গেলো এবং ক্রমশ তার অস্বভাবী জগৎ থেকে সুব্যবহিত হ'য়ে পড়লো তার আব্বা-আম্মা-ভাই-বোনের ভালোবাসা এবং সে মৃত্যুকে বরণ করলো।

এই অতিসাধারণ অপিচ অনন্যসাধারণ গল্পটি এই সময়ের এক ভয়নীয় প্রতিচিত্রণ। তাঁর অপরাপর রচনাগুচ্ছে যুক্তিহীনতার প্রতি প্রবল পক্ষপাত দ্রষ্টব্য, যেখানে মানুষেরা যেন দাবার ছকের হাতি-ঘোড়া-বোড়ে যাদের উপর ক্ষমাহীন নিয়তিআয়ুধ নেমে আসে। যেন অর্ধোচ্চারিত হাতে লেখা তাঁর রচনাবলি; রিলকে-র লেখাও তাই; পাউণ্ড-এর কবিতায়ও অবচেতনের সলিল থেকে জাগ্রত একটি-কি-দুটি বোধ্য লাইন ভেসে উঠে আবার সব কোন নিঃশব্দায়মান সমুদ্রে তলিয়ে যায়। চেতন-অবচেতনের উঁচুনিচু দেশে অভিযান পাঠিয়ে এঁরা কতোগুলি প্রমিতির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন—এই তথ্য এড়িয়ে যাওয়া চলে না। কবিতার ক্ষেত্রে অজায়মান অনাবিক্রিয়ের রক্তচাঞ্চল্য এমনভাবে অনুভাব্য হয়েছে যে উনিশ শতকের ঋত বাস্তবতা এর সম্মুখে হাঁটু ভেঙে কাৎ হ'য়ে পড়ে। প্রাগ্বর্তী শতকের বাস্তবতা ছিলো বহির্জগতের ভূগোল-ইতিহাসের জল-জলে মানচিত্রে মেলা, বর্তমান শতকের বাস্তবতা অন্তর্জগতের কুটিলাক্ষর-কীর্ণ। সেজন্যে কখনো-কখনো প্রকল্পনার মাউথঅর্গানে সংসারসীমা রূপান্তরিত হ'য়ে যায়, কখনো কবিতার রাখালিয়া হস্তক্ষেপে নমনীয় হ'য়ে ওঠে: চেতন-অবচেতনের সত্য সন্ধান আধুনিক সাহিত্যে যেখানে লক্ষ্য না হ'য়ে গদ্যে কবিতার সহবাসই লক্ষ্য হয়েছে, সেখানে ঐ নিরর্থক সহবাসে সে তার লক্ষ্যকেন্দ্র হারিয়ে বিচ্যুত ও অসার্থক—কথাটি এজন্যেই বলে নিতে হ'লো যে কেউ-কেউ আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হ'য়ে আধুনিকতার এই মুদ্রাদোষ আঁকড়ে ধ'রে আছেন। প্রকল্পনা ব্যবহারের এই সাহসিকতায় দু'জন লেখকের নাম এই মুহূর্তে উল্লেখনীয়: আশ্চর্যভাবে একই বছরে জন্মমৃত্যুবরণকারী জেম্‌স্ জয়স ও ভর্জিনিয়া উলফ। কখনো বর্ণনায়, কখনো নাট্যে, কখনো অনুলাপে, কখনো কেবল জিজ্ঞাসায়, কখনো যতিচিহ্নহীন ভাবনাপ্রবাহে সংকলিত জেম্‌স্ জয়স-এর "য়ুলিসিস" এক হিশেবে যুক্তিহীনতার পরাকাষ্ঠা বটে—যদিচ পূর্বকথিত যুক্তিহীনতার সঙ্গে এর পার্থক্য বিশদ—এখানে সংগীতের তলায়-তলায় কামড়ে আছে কঠিন গণিত। এই উপন্যাসে জড়পদার্থ কথা ব'লে যায়; উপন্যাসের নায়ক লিয়োপোল্ড ব্লুম হঠাৎ—একেবারে হঠাৎ হ'য়ে যায় আস্ত-সমস্ত এক মেয়েমানুষ। আর, ভর্জিনিয়া উলফ, পুনর্জাত স্যাফো. 'গ্রানাইট ও রামধনু'কে মেলালেন যিনি অক্ষরের অক্ষয় ধাঁধাগ্রাফে, "অর্লাণ্ডো" নামক অসম্ভব অপিচ সুস্বাদ আত্মজীবনীতে তো

অনুরূপ স্বাক্ষরই রেখেছেন। অর্লাণ্ডোকে প্রথম আমরা দেখলাম বালক-রূপে, কবিতা লেখে সেঃ তার একটি কবিতার নাম 'ওকগাছ', নাটক লেখে, সাহিত্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। পরে তার বিয়ে হ'লো মাতা-পিতার পরিচয়হীন একজন জিপসী ও নর্তকী রোজিনা পেপিটার সঙ্গে। আর তারপর—তারপর হঠাৎ, উপন্যাসের প্রায় মাঝামাঝি এসে অর্লাণ্ডো এক মায়াবীর আরশিতে মেয়েমানুষে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। পরে সে বিয়ে করে একজন পুরুষকে এবং তার একটি সন্তানও হয়!

শিল্পসাহিত্যের আধুনিকতাকে, এক কথায়, অন্তর্বয়ন অভিধায় শনাক্ত করা যায়; অন্তর্বয়ন হচ্ছে মনোধারা প্রকাশের পদ্ধতি, চেতন, অবচেতন ও অর্ধচেতন তরঙ্গ, বেগ ও ঘূর্ণির বিন্যাস, এবং ফলত লেখকেরা প্রত্যেকেই প্রতীকী নিদিধ্যাসনের মনোনায়ক। সাহিত্যের আয়তনে দুটি জরুরি প্রতিবাসী চিরকাল সুরঞ্জন স্পর্শ ক'রে আছেঃ সমাজ ও দর্শন। বহিঃপৃথিবীর, দেশজ স্বাস্থ্য ও দেশোত্তর-পেশীর সচ্ছলতায় সাহিত্যের সমাজ গঠিত; কথাসাহিত্য তার সার্বত্রিক প্রাবল্যে ভাস্বর; কালচিত্র বা ঐতিহাসিক দলিল হিশেবে সাহিত্য সংরক্ষিত হয় তারই প্রভাবে, আবার সমাজকে তরুর মতো অবলম্বন ক'রে সে যেতে চায় সান্দ্র ও স্পন্দমান চিরকালের জ্যোতির্দৃষ্টিময় সাহিত্যকৈলাসে। পক্ষান্তরে, দর্শন উদঘাট করেছে অন্তর্জগতের দ্বার, যুক্তি ও প্রবৃত্তির, কল্যাণ ও অশুভের, আমিষ ও আত্মার দ্বন্দ্বের মণ্ডপ; কবিতা তার নগ্নকঠিন ক্রিয়াকাণ্ডের রঙ্গভূমি। অবশ্য, এখানেই ব'লে নেয়া ভালো, সমাজ ও দর্শন, এই উভয়ের সংক্রান্তি চিরকালের সাহিত্যে কমবেশি দ্রষ্টব্য; সাহিত্যে সমাজ ও দর্শনের উদ্যোগ-প্রয়োগের প্রধান ক্ষেত্রসমূহের নির্দেশনাই এখানে আমার লক্ষ্য। এবং এই পূর্বলেখের অনন্তরে লক্ষণীয়ঃ আধুনিক সাহিত্যে সমাজচেতনা স্বাভাবিকভাবেই আরো তীব্র, সান্দ্র ও প্রসারিত; কিন্তু দর্শনের প্রভাবপ্রতিপত্তি ব্যাপকতর, সে আজ শুধু সংস্পর্শের রাখাল হ'য়ে নেই, আধুনিক সাহিত্যের জীবনতরণী হ'য়ে উঠেছে সে, আধুনিক সাহিত্যের প্রধানতম ঘটনা এটা এবং উপপ্লবের সমপর্যায়ী। বলা অবশ্য বাহুল্য, সাহিত্যে দর্শন যেখানে সাহিত্যিক পরিসরে জয়ী হয়েছে, সেখানেই তার সার্থকতা সূচিত। এই দার্শনিকতার অনুবর্তী হ'য়ে এসেছে কবিতা, সাহিত্যের সর্বমুখে কাব্যের সংক্রাম অপরিহার্য ও অনিবারণীয় হ'য়ে

উঠেছে, যেন একালের কাব্যভূভাগ পুনর্বার জেগে উঠে তার সেই একদিনের হারানো রাজ্য পুনরাধিকারের চেষ্টা করছে।

সুখের বিষয়, বাংলা উপন্যাসের প্রথম পথিকৃৎ এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঔপন্যাসিককে 'অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান' হ'তে হবে। পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "চোখের বালি" প্রথম বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, যেখানে চরিত্র, ঘটনা ও পরিপার্শ্ব মনের কারখানাঘরের আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তির মতো জেগে উঠেছে। আর আশরীর মনস্তত্ত্বময় ছোটো-গল্প তো একালের আগে জন্মই নিলো না; স্বাভাবিক সমাপ্তি ও বিস্ময়-বোধক উপসংহার: ছোটোগল্পের এই যুগল ধারার উৎসে পৌঁছোলে আমরা বুঝে নিতে পারি 'মন' ব্যাপারটিই তার জরুরি আয়তন। এই মনস্তত্ত্বের আক্রমণেই আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্র থেকে নাটক একরকম বিচ্যুত হ'য়ে পড়লো, কারণ আমাদের মৌখিক উক্তিপ্রত্যুক্তির সঙ্গে মনোধারার সম্পর্ক মেরুদূর, কিংবা বলা চলে, আমরা মনের কথা মুখে প্রকাশ করি না ব'লে! বস্তুত, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক ইতিমধ্যেই মৃত এবং মরণান্তিক উত্তরণপরম্পরায় নাটক হ'য়ে উঠেছে রূপকীকৃত বা প্রতীকী কিংবা সরাসরি কাব্যনাট্যের আরক্তশীতল ও শতমাত্রিক ছায়াআতপে সমর্পিত ও বিসর্পিত।

কিন্তু, পেরেক দিয়ে সংগীত গাঁথা যায় না, অতলে প্রবেশ ক'রে নামহীন স্বরগুলি তুলে আনা প্রায় অসম্ভব; ফলে, অনিবার্যভাবে সাহিত্যের সর্বমুখে দেখা দিয়েছে দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা। তত্রাচ, দুর্বোধ্যতা বা কালশরীরের বিক্লবতা আধুনিকতার লক্ষণ নয়, আধুনিক সাহিত্যের কএকটি সামান্য লক্ষণ দেখা দিলেও কএকটি ক্লিশে বা ধরতাই বুলির সমাহৃত রূপের নামই আধুনিকতা নয়; সাহিত্য যে-কোনো সময়েই মতবাদোত্তর, বহুপল্লবগ্রাহিতা তার সয় না, স্ববিকাশে তার একমাত্র নির্ভর এবং সর্বোপরি আধুনিকতা কোনো স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়, তা জীবনেরই অপর উৎসারণ। একই কারণে, আধুনিকতার কএকটি সামান্য লক্ষণ দেখা দিলেও, বক্তব্য, মতামত ও উপস্থাপনায় আধুনিক লেখকেরা পরস্পর থেকে ভিন্ন, প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতায় চারিত্র্য ও ব্যক্তিস্বরূপ উপার্জন প্রত্যেক সৎলেখকেরই আরাধ্য। আধুনিকতা

যাঁদের হাতে নিরর্থক শব্দবাহী কিংবা একতাল ওঙ্কার কিংবা শূন্যজীবী ফানুশ, আধুনিক সাহিত্যের ধনুর্ভঙ্গে তাঁরাই দায়ী। আধুনিকতার অন্তঃপুরীণ অভিসারে লেখকেরা যাচ্ছেন দেবদূতেরাও-যেতে-ভয়-পান-এমন-সব রক্তের, চৈতন্যের ও অস্তিত্বের বহুস্তর অলিগলির দেশবিদেশে, যাচ্ছেন মাংসের হরষে, যাচ্ছেন বেগনি সর্বনাশে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই আধুনিকতার নিবিড়গভীর সারাৎসার যেন একএকটি হীরকসন্নিভ, বিশ্রব্ধ ও বায়বীয় আয়তনে পরিপূর্ণ, যার ঈশ্বরপ্রতিম লোকোত্তর শ্লোকসমুচ্চয়ে নারী, নাথ ও নিসর্গ একাকার। সযত্ন বিস্রস্ততার মধ্যে পরানিষ্ঠা আধুনিক লেখকের একমাত্র অবলম্ব, তাঁরা প্রত্যেকেই বেরিয়েছেন শিকড়ের অন্বেষায়, তাঁরা জানেন এই যন্ত্রযানক্রেঙ্কারের মধ্যে যিনি ধ্যানী একমাত্র তাঁর হাতেই উঠে আসতে পারে একালের মর্মবাণী—যা হয়তো এখনো অতলে লুকিয়ে আছে। এই অভিসারে আধুনিক সাহিত্য আরএকবার প্রমাণ করেছে, গণসাহিত্য-কথাটি উচ্ছেদনীয়, সাহিত্য মূলত নীলরক্তবান।

তাহ'লে কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যে আধুনিকতা ধারাবাহিকতা-বিচ্যুত কিছু নয়—যা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে হঠাৎ, সর্বাঙ্গীণ জীবনের শিকড় খুঁজতে গিয়ে তার কএকটি সামান্য লক্ষণ দেখা দিয়েছে মাত্র। সে বেছে নিয়েছে স্বীকারোক্তির পথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উচ্চারণে, 'বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্র অবৈকল্য আর অকপটতা।' বিশ্বসাহিত্য স্থূলতা থেকে ক্রমশ সূক্ষ্মতার দিকে এগিয়ে চলেছে; সেজন্যেই আজ মনোবাস্তবতা হ'য়ে উঠেছে প্রধান আরাধ্য। ফলত, অন্তর্বয়নের অভিসারে সে হ'য়ে উঠেছে জটিল ও মদিরেক্ষণ; কিন্তু দুর্বোধ্যতা আধুনিকতার লক্ষণ নয় তাই ব'লেঃ দুর্বোধ্যতার সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক আপতিক মাত্র; আলবেআর কাম্যু-র মতো স্বচ্ছ অপিচ দূরগামী লেখককে আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব'লেই মনে করি। আরোঃ সময়-যে আধুনিকতার মানদণ্ড নয়, তার একটি প্রমাণ উল্লেখ করিঃ আত্ম-বিলোপকারী জীবনানন্দ, উন্মাতাল নজরুলের আগে জ'ন্মেও নজরুলের পরেকার আধুনিকতাই বহন ক'রে এনেছিলেন। তারপরে, এমনকি প্রেম-কল্যাণ-শ্রেয়োসংবিত ইত্যাদি পুরুষার্থ (values) পরিবর্তমান; তার দরুণ অবক্ষয়ের দিকে কৃষ্ণ সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন লেখকেরা, মুখ ফেরাচ্ছেন। তাই এমনকি সভ্যতার প্রতিমুখে লেখকদের

হাতে উঠে আসছে যুক্তিহীনতা, অসম্ভব, প্রকল্পনা প্রভৃতি; কাব্যে আধারের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ব্যাকরণভঙ্গ আর আধেয় চেতন-অবচেতনের ওপারে ঈশ্বরতৃষ্ণা। বিশ্বসাহিত্য প্রমাণ করেছে, সত্যিকার জীবনদর্শনের বিপর্যাসে কোনো সাহিত্যিক মানদণ্ড তৈরি হ'তে পারে না। এ বিষয়ে বাংলাদেশ আশ্চর্য ব্যতিক্রম, তার পশ্চাদগমন অবিসংবাদিত ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে সত্যিকার ফিলসফি নিয়ে কোনো লেখক দেখা দিলেন না বাংলাদেশে, সামান্য ব্যতিক্রম যাঁরা আছেন তাঁদের আয়তনে অধীত বিদ্যা আপন্ন মাত্র। অথচ, বিশ্বসাহিত্যের প্রত্যেক প্রধান আধুনিকের রচনায় জীবনদর্শনের দৌত্যে সাহিত্যিক আততি দেখা দিয়েছে। সম্ভবত, এখন পর্যন্ত তীব্রতম সাহিত্যিক শম্পার সাক্ষাৎ পাই অস্তিত্ববাদে। সোরেন কির্কেগার্ড-বাহিত অস্তিত্ববাদের তিন প্রধান পুরুষ ঃ জঁ'া-পোল সাত্র্, আলবেআর কাম্যু ও মিগুয়েল হ্য উনামুনো। মার্টিন হাইডেগার যাঁকে কোনো দার্শনিকই নয় বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, সেই জঁ'া-পোল সাত্র্-কেই কিন্তু অস্তিত্ববাদের সাহিত্যিক প্রবক্তা ধরা হয়। সে যাই হোক, অস্তিত্ববাদে আধুনিক মানবজীবনের এমন কতোগুলি আত্মিক সমস্যা খচিত যে, তার শরণ আধুনিক সাহিত্যে নিশ্চিত ও দুর্ধর্ষ হ'য়ে উঠেছে। অনন্তর, যে-সব 'ভুল আধুনিকেরা' মনে করেন ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের কিছুমাত্র যোগ নেই, তাঁদের জানা দরকার ঃ ধর্মের বহিরঙ্গ নয় বটে কিন্তু ধর্মের সারাৎসার আধুনিক সাহিত্যের উপজীব্য ; তাঁদের জানা দরকার ঃ প্রাচীন সাহিত্য নৈতিক তথা ধার্মিক এবং আধুনিক সাহিত্য আধ্যাত্মিক— (ধন্যবাদ, জনাব আলবেআর কাম্যু!) ॥

[১৯৬৬]

রবীন্দ্রনাথ ঃ তাঁর শিল্পসাহিত্যতত্ত্বের ত্রিবেণী

১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ এই উচ্চারণ উৎকীর্ণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মনোলোকে ভেসে ওঠে এক দীর্ঘ, বিশাল, গভীর, ভাস্বর, বিশ্রব্ধ, আদর্শান্বিত ও সদাসক্রিয় চৈতন্যলোকের ইতিহাস—যা ষাট বৎসরাধিক কাল ব্যেপে বাংলা সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্র থেকে বিচিত্রসচ্ছল ফসলরাশি তুলেছে। কিন্তু এ-কথা নূতন ক'রে বর্ণনা করার দরকার নেই আর, কেননা এ আজ ইশকুলে-পড়া বালকও জানে;—এখন, যা বিশেষ দ্রষ্টব্য, তা হচ্ছেঃ তাঁর শিল্পসাধনার এই দীর্ঘবিসারী জগৎ শুধুমাত্র 'সৃষ্টিপ্রক্রিয়া'র কুল-ভাঙা বান-ডাকা আনন্দেই অবসিত হয়নি, তাঁরই সঙ্গে তাঁর উৎসে ও প্রসারে পাই 'নির্মাণ'-এর শালপ্রাংশু মহাধ্বজ লীলা, সঙ্গীতের পিছনে নিয়মের কঠিন জ্যামিতির বদ্ধমুষ্টির মতো। সাহিত্যে তাঁর সেই প্রথম দংশন থেকে যদি উত্তরণপরম্পরার অন্তিম পর্যন্ত এক-লহমায় অতিক্রম ক'রে আসি, তাহ'লে দেখবোঃ তাঁর গভীর ও বিস্তারিত বিহারনাথ, নিসর্গ ও নরনারীর ত্রিলোকের বিমিশ্র এক স্বকীয় জয়স্তম্ভ রচনা ক'রে দিয়ে গেছে। তাঁর ভারতীয়তা, তাঁর য়োরোপার্জন, এবং কোন ব্যাখ্যাতীত স্বর্গের চক্রান্তে জাগ্রৎ তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের জলদর্চিরেখাঃ এইসব—এইসবই তো একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ তাঁর শিল্পসাহিত্যতত্ত্ব বিচারেও তাই আশরীর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বিচ্ছুরণে ও নিমজ্জনে যুক্ত ও লগ্ন হ'তে হয়, যদিচ রবীন্দ্রনাথের স্থাপনা সাতাশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলি'র পরপারেও বটে। তবে, এখানেই ব'লে রাখিঃ তাঁর বিরাট ব্যক্তিতার অতিমর্ত্য আহ্বান শিল্পবিচারের প্রতিকূল ব'লে, যথাসম্ভব নিজেকে সংদমিত রেখে, শান্ত, স্থির ও স্তব্ধ মনীষায় অগ্রসর হ'লে, যেমন রবীন্দ্রনাথেরই অনুসৃত ও ব্যবহৃত আবেগঘনিল শিল্প-

সমালোচনা এড়ানো যায়, তেম্নি নিরপেক্ষ তরফ থেকে তাঁকে শনাক্তি-করণেও সুবিধা।

২

সাহিত্যের লক্ষ্য: সত্য ও সুন্দর, ফলশ্রুতি: আনন্দ ও কল্যাণ—এক কথায়, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সারাৎসার। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ—এই সংযুক্ত ত্রিবেণী শুধু তাঁর সমগ্র সাহিত্যের অন্তরে মৌলিক অনলের মতো কাজ ক'রে যায়নি, যে-মহাজীবন তিনি যাপন করেছেন, তার ভিতরেও এই তিন ধারণা ও চেতনা অনুস্যূত;—অর্থাৎ, জীবনে ও সাহিত্যে উভয়ত্র, তিনি সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের দিকে তথা শিল্পের নিপট উৎসাহের প্রতি চালিত ও ধাবিত হয়েছেন।[১] এইজন্য য়োরোপীয় এবং সংস্কৃত নিবিড় আলঙ্কারিকেরা যে-ভাবে সাহিত্যতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের শরীর ও আত্মাকে কোনোদিন অনুরূপভাবে খোপে-খোপে বিভক্ত ব্যাখ্যা করেননি, তাঁর বিচাররশ্মির ধরনটি স্বাধীন ও স্বকীয়, বঙ্কিম ও গতিবিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক; রিচার্ডস্‌ বা জগন্নাথের আলোচনা স্বয়ং সাহিত্য এ কথা কেউ বলবে না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাও তাঁর আলোকপ্রাপ্ত হ'য়ে প্রায়শ সাহিত্য-লোকে উত্তীর্ণ: সব রচনাই কবিতার কুশলতা—অর্থাৎ উপমা, চিত্রকল্প, ধ্বনি, শব্দক্রীড়া, স্বেচ্ছাবিহার, অনুষঙ্গ ইত্যাদি—কুশলতার দ্বারা তুমুলভাবে আক্রান্ত; তাঁর শিল্পসাহিত্যতত্ত্বের এই বিচাররশ্মি মুখ্যত তাঁর কএকটি প্রবন্ধগ্রন্থে, কিছু শবলিত ছিন্নপত্রাবলিতে প্রত্যক্ষভাবে বিকীর্ণ এবং তাঁর সমগ্র রচনাবলিতে পরোক্ষপ্রতীকে কীর্তিত। স্মরণীয়: তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব তাঁর জীবনদর্শনেরই সহোদর এবং তাঁর মতো জীবন ও রচনাকে অভিন্ন প্রদীপাধারে নিষ্কম্পভাবে শিখায়িত করেছেন—এরকম কীর্তিমান পুরুষ যেমন এই গ্রহেই বিরল, তেম্নি সেই অতিপ্রাথমিক সাহিত্যযাত্রা থেকে শেষ জীবনাবধি পৃথিবীলোক সম্পর্কিত এক সচল দর্শনের তন্ময় ধারক ছিলেন তিনি—যা তাঁর প্রাকৃতিক উত্থানের আগে ও পরে অন্তত কোনো বাংলা লেখকে মেলে না। 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ' এই রবীন্দ্রোক্তি-যে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশেই নিবেদিত হ'তে পারে, এখানেই তার কারণ নিহিত।—আমার এই আলোচনায় তাঁর

নন্দনতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক-ও আলোচনা-গুচ্ছই অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাঁর জীবন ভ'রে উৎসিত সৃষ্টিলোকী সমুদয় রচনাই আমার বক্তব্যের সপক্ষে আমি স্বীকার ক'রে নিয়েছি; কেননা তিনি তো বিশুদ্ধ কান্তিবিদ্যাবিৎ নন বরং বিশুদ্ধ সাহিত্যরসস্রষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের সত্যের ধারণা সুন্দরে কল্যাণে আনন্দে অর্ধনারীশ্বর; বা বলা চলে, তাঁর সত্য-সুন্দর-কল্যাণের চেতনা পরস্পরের ভিতরে প্রবিষ্ট। একদিকে বিচিত্রবিধ প্রসঙ্গে তিনি জন কীটস্-এর সত্য-সুন্দরের অন্যোন্য-সম্বন্ধজাগর প্রবাদপ্রখ্যাত কবিতার পংক্তিটি 'Beauty is Truth, Truth Beauty'—উদ্ধৃত করেছেন, কখনো যথাযথ, কখনো সাচীকৃত; অপরদিকে প্রাথমিক "প্রভাতসংগীত" কবিতাগ্রন্থে সেই-যে হৃদয়স্থ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'লো তা ক্রমশ এক মানবরচিত সৃষ্টিসমুদ্রের আকারে ব্যাপ্ত হ'য়ে যায়, এমনকি "শেষ লেখা"র সর্বান্ত্য কবিতায়ও সেই বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের 'সত্যেরে সে পায় আপন আলোক-ধৌত অন্তরে অন্তরে।' একটি দীর্ঘ রেখায় যেন তিনি মৃত্যুকে তাঁর আশি বছরের আত্মবাহী মানচিত্রে অঙ্কন ক'রে দিলেন: রেখাটি মানবস্বভাবের মতোই একেবারে সরল নয়, অঙ্কের মতো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এসে একটি অতিনির্দিষ্ট ফল প্রসব করে না: তাই তো "প্রভাতসংগীতে" তাঁর হৃদয় খুলে গেলেও তারপর আবার "কড়ি ও কোমলে" আত্মরত হ'য়ে আসে, এবং আত্মরচিত ভুবনে বাস ও তার থেকে বৃহৎ জগতে বেরিয়ে আসা—এই দ্বন্দ্ব তাঁর সারাজীবনের নিত্যসহচর ছিলো, কোনো-এক পত্রে যাকে তিনি একই সঙ্গে বিরহমিলন পরিপূর্ণ সংসারের প্রতি টান ও নিরুদ্দেশলোকের আহবান ব'লে শনাক্ত করেছেন; এই দ্বৈরথ ঈষৎ রূপান্তরিত হ'য়ে তাঁর উত্তর-জীবনকে যেন দু-টুকরো ক'রে ফেলে ছিলো—যথাসময়ে আমরা তা নির্দেশ করবো। কিন্তু লক্ষণীয়: সারা জীবনের লুক্কায়িত ও উচ্চারিত এই দ্বন্দ্বময় কবিকাহিনীর ভিতরেও মোটামুটিভাবে তাঁর চেতনদেহলী-যে নির্দ্বন্দ্ব লাগে, এমনকি তাঁর সায়ন্তন ঈষৎবিদীর্ণ পর্বেও, তার কারণ: নিসর্গপ্রকৃতিতে তাঁর নিরন্ত মুগ্ধতা, কখনো ধুলোমাটির মানবের জয়গাথায়, কোনো-কোনো অধ্যায়ে ঈশ্বরের নিদিধ্যাসনে। তবে, একথা যেন আমরা বিস্মৃত না-হই যে, সকল শিল্পীর মতোই রবীন্দ্রনাথের জগৎও আমাদের এই পৃথিবীর ও মানুষের নির্বিকার ও অবিকল প্রতিরূপ নয়, তা বহুলাংশে স্বরচিত, কবি-কর্তৃক গদ্যে-পদ্যে

বহুবার কথিত 'হৃদয়ের পথ' দিয়েই তাঁর যাবতীয় ভ্রমণ সম্পন্ন হয়—গ্রন্থপীড়নে নয় কখনো। তাঁর অজস্র রচনার প্রায় যে-কোনো স্থান থেকে কএকটি উৎকলন তাঁর এই সত্যসুন্দরসন্ধিৎসার, সত্য ও সুন্দরের অন্যোন্য-সম্বন্ধপাতের সাক্ষ্য দিতে পারে ঃ

১. সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। ["সাহিত্যের পথে" ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২. আধুনিক কবি বলিয়াছেন ঃ Truth is beauty, beauty is Truth। আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং Beauty মূর্তিমতী। উপনিষদও বলিতেছেন ঃ আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌-বিভাতি। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই Truth এবং beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম।
সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য।
['সৌন্দর্যবোধ,' "সাহিত্য" ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

'পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ', প্রথম-যৌবনের কোনো কবিতায় তাঁর পক্ষে বিধর্মী সংরাগদীপিত এই ঘোষণা করলেও, তখনই, সমকালেরই একটি চিঠিতে পাই তাঁর স্বস্থ সমীকরণ ঃ 'যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত—'। অধোরেখ অংশে যে-ইন্দ্রিয়াতীত সুন্দরসমীক্ষা প্রকাশিত, তা তখনই তলে-তলে কবির রক্তের ভিতরে প্রবাহিত, এবং কবির প্রথম কাব্যশিখর, "মানসী"র,—'সুরদাসের প্রার্থনা' নামক গীতাগ্নিতে অপাবৃত ও প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। 'কড়ি ও কোমল"-এর ক্ষণিক শারীররতি শমিত হ'য়ে গেলে যে-সুরদাস 'আত্মার জানালা' (লেওনার্দো-র শিল্পোচ্চারণে) চক্ষুর্দ্বয় উপড়ে ফেলতে চায়, সে যে ইতিহাসপ্রোক্ত সুরদাস নয়, বরঞ্চ তার ছদ্মপ্রাবরণীতে স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই তথ্য একটু নিবেশেই ধরা পড়ে। অনন্তর, অপরিসীম মমতায় তিনি-যে এই কল্পমূর্তিকে আঁকড়ে থাকলেন সারাজীবন—সর্বদা হয়তো সমান্তরালভাবে নয়, ঈষৎ বেঁকে-চুরে—তার বিস্তর উদাহরণ রবীন্দ্ররচনাবলির লাইনে-লাইনে অমেয়-

ভাবে পরিকীর্ণ। একই কারণে, কলাকৈবল্যবাদের উদ্‌গাতা তেয়োফিল গোতিয়ে-র কোনো-একটি নভেলবিন্যাসের প্রতিপাদ্য যেহেতু সৌন্দর্যের টান ও আকর্ষণ সংসার থেকে মানুষের মনকে স্বতন্ত্র ছিনিয়ে নিতে চায়, অতএব রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তের একদেশদর্শিতাকে স্পষ্ট ধিক্কার জানিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর অদ্বিধান্বিত মত, 'সৌন্দর্যবোধের যথার্থ পরিণতভাব কখনোই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ চিত্তের অসংযমের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে টিকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।' রবীন্দ্ররচনাবলির অধিকাংশে এইসব উক্তির সমর্থন মেলে; কিন্তু কোনো কোনো গল্প-উপন্যাসে বা একেবারে অন্ত্যজীবনের কোনো কোনো রচনায় তাঁর এই আদর্শিক সৌন্দর্য চেতনা চিড় খেয়ে গিয়েছিলো, কোনো-কোনো রচনাংশ হ'য়ে উঠেছিলো আরণ্যিক —আমরা যথাসময়ে তা চিহ্নিত করবো।

তাঁর সত্যচৈতন্যের একটি অংশ যেমন সুন্দর, অপরাংশ তেম্নি আনন্দ ও কল্যাণ। 'আনন্দই তাহার (সাহিত্যের) আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।' রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের সন্তান, এবং বাংলাদেশে ঐ শতক দেশহিতৈষণা, সামাজিক উন্নয়ন ও জাগরণের অনবচ্ছিন্ন কর্মে উন্মুখর—রবীন্দ্ররচনায়ও এই কল্যাণ-ও মঙ্গল-ভাবনার প্রচুর সাক্ষ্য বর্তমান, প্রায় যে কোনো জায়গায় হাত দিলে উদাহরণ উঠে আসবে: তাঁর গদ্যরচনায় তো বটেই, কবিতায়ও কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো বা ইশারাপাতে। নব্য লেখকদের প্রতি উপদেশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শুভঙ্কর সাহিত্যচর্চারই সূত্র ধারণ করেছিলেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' কিংবা প্রাগুক্ত শতাব্দীশোভন সেই প্রযত বাণীবিভূতি: সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধরা মহাপাপ। রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বঙ্কিমোক্ত এই সব সর্বতোভদ্র ধ্যানধারণারই সহগ, কেবল উভয়ের পার্থক্য এইখানে: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ক্ষেমঙ্কর ভাবনাবেদনার অনুযায়ী ক'রে সর্বাংশে নিজেকে গ'ড়ে তুলেছিলেন; আর অধিকাংশ সময়ে এই শ্রেয়োসংবিতে চালিত ও অধিকৃত হ'লেও কখনো-কখনো উল্টো কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁর সাহিত্যকৃতির ঈষদংশ অন্তত ঐ শ্রেয়োভাবনাকে

আমল দ্যায়নি। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ যেমন সার্বত্রিক জাগরণের কাল, তেম্নি তার সাহিত্যও নির্মাণের পটসন্ততি মেলে ধরেছিলো ; প্রায়-সমস্ত লেখক কোনো-না-কোনোভাবে দেশ-সমাজ-মানবের মঙ্গলভাবনায় নিঃসরণ ক'রে গেছেন, তৎকালীন ও তৎস্থানিক বাঙালি-মুসলমানের সাহিত্যচর্চায় সংবাদ যারা রাখেন, তাঁরা জানেন দেশসমাজের আতশী ফলন কোন মুগ্ধবোধে ও আয়তনে আধৃত ছিলো ;—অবশ্য এর মুখ্য দায় দেশজ পেশীর বাংলাময় ইতিহাসসীবনেরই নিশ্চয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শ্রেয়োভাবনায় আমুণ্ডনখাগ্র অধিকৃত ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের কল্যাণ-মঙ্গল-ও নীতি-প্রচারের বিপরীত উদাহরণ সরবরাহ করলেও তাঁর সাহিত্যচর্চাও সুখ্যাত সত্যধর্মধ্বজ ; পরবর্তী শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা নজরুল ইসলাম প্রমুখ প্রধান সাহিত্যরথীর চেতনালোকে ঐ তরঙ্গ প্রসারিত হ'য়ে এসেছে। তিরিশের কালে এই দায়িত্বভার কবিকথকদের হাত থেকে স্খলিত হ'য়ে যায় ; তবে স্মরণীয় : পরোক্ষভাবে দেশসমাজের কল্যাণভাবনা থেকে নিশ্চয় একেবারে বিচ্যুত হওয়া কারো পক্ষে ও কোনো কালেই সম্ভব নয়। বঙ্কিম যেমন শুধুমাত্র তাঁর সময়ের সাহিত্যের কর্ণধারই ছিলেন না, তেম্নি রবীন্দ্রনাথও কেবলমাত্র কবিগুরু ছিলেন না :—দেশসমাজের সকল প্রসঙ্গে তাঁদের আতত দায়িত্ব-ভার ছিলো অভিভাবকের মতোই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তব্য যে মূলত সেই অনিমেষ শ্রেয়ো-ভাবনায় নিঃসৃত হয়েছে, এ-বিষয়ে উভয়ের রচনা থেকে দুটি পাশাপাশি উদ্ধারপর্ব সাহায্য করবে :

১. কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন —চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শুদ্ধদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ-সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।
[বিবিধ প্রবন্ধ, উত্তরচরিত : বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

২. বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী। যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম—কোনো-একটি বিশেষ তত্ত্ব-নির্ণয় কোনো-একটি বিশেষ ঘটনা-বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষণ-অনুসারে তাহাকে দর্শন বিজ্ঞান বা

ইতিহাস বা আর-কিছু বলিতে পারো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই। ......সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব—মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব—মানবকে স্পর্শ করা মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

['সাহিত্যের উদ্দেশ্য', "সাহিত্য" ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

রবীন্দ্রনাথের এই সত্য-সুন্দর কল্যাণের পিছনে তাঁর অভিজাত পারিবারিক প্রভাব বা তাঁর ঋষিপ্রতিম জনকের প্রভাব নিশ্চয় উল্লেখনীয়। রবীন্দ্রজীবননাট্যে যে-নিরাসক্তিসাধনা অথবা রাবীন্দ্রিক শান্তবলয়ে যে-অধ্যাত্মঅন্বয় তার পিছনে কেবল তাঁর স্বাবলম্বনের প্রবর্তনাই নয়, পিতারও অনিঃশেষ অংশ আছে ব'লে মনে হয়; মনে হয়, একেবারে আক্ষরিক অর্থে না-হ'লেও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমদৃষ্টি—বিলাস ও সন্ন্যাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভিতরে জ্যোতির্বিকাশী আয়তনে সংস্থিত। অধ্যাত্মজীবী দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী"র কোনো-কোনো অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের ছন্ন সম্বন্ধ কখনো রীতিমতো বিস্ময়কর।

দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপর বসিয়া আছি। ঐদিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল—'এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে'; বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস-ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল; গালিচা-দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল; মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল।............আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন, ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহার পরে সেই আনন্দময়, স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার এ কৃপার কোথাও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।

["আত্মজীবনী" ঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

"আত্মজীবনী"র কোনো-কোনো অংশকে "নৈবেদ্য", "খেয়া", "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য" বা "গীতালি"র গদ্যভাষ্যের মতো মনে হয়—এটি নিশ্চয় অলীক নয়। উপর্যুক্ত আত্মিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতারও ধ্যানধারণার সতত সম্বন্ধ অন্তর্গভীরে জ্বালানো রয়েছে।

অতএব মন, তোর কলসী ও দড়ি আন,
অতলে মারিস ডুব Mid-Victorian।

['আধুনিকী', "প্রহাসিনী" ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

নিজের উদ্দেশে এই কৌতুকের পিছনে কিন্তু কিছু সাহিত্য জড়িত ঃ মধ্যভিক্টোরিয়ান অদিতিলোকের উপবতী ছিলেন তিনি। তাঁর শিল্পসাহিত্যতত্ত্বের ধারণায় এমনকি টেনিসন-এর উপস্থিতিকেও মেনে নিতে হয়।

এই সঙ্গে তাঁর উপর বৈদান্তিক মহিমচ্ছায়ার স্বাতন্ত্র্যও অবিসংবাদিতভাবে সত্য। '"আছে আছে আছে" এই বোধির ভিতরে চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়'—এই উক্তি জীবনানন্দ দাশের হ'লেও রবীন্দ্রপরবর্তী কবির নয়, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ। এই সর্বার্থসাধক অস্তিবাদ, এই নিরন্ত-অবার আনন্দোৎসার—এই হচ্ছে আত্মোপ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব যে-কএকটি উৎসমূল থেকে ঈষদঙ্কুরিত, অতএব তার সংক্ষিপ্ত চিত্রলেখা এরকম ঃ (ক). দৈশিক প্রভাব ; (খ) বৈদেশিক ছায়া ; (গ) পারিবারিক ঐতিহ্য ; (ঘ). ধর্ম তথা উপনিষদের আলোক ; (ঙ). রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কেবল সাহিত্যগুরু নন, স্বজাতির নির্দেশক ও অভিভাবকের অলিখিত অপিচ অনিবারণ পদ তাঁকে যেহেতু অঙ্গীকার ক'রে নিতে হয়েছিলো, অতএব তাঁর পরিপার্শ্বও সত্য-সুন্দর-কল্যাণের নিশিত নিরঞ্জন নব্যপ্রবক্তা হিশেবে তাঁকে খানিকটা সহায়তা করেছিলো—এ কথা হয়তো অস্বীকার করা চলে না ; (চ). সর্বোপরি কবিসার্বভৌমের ব্যক্তিগত প্রবণতা।

৩

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের নিহিত প্রসঙ্গগুলি—সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও আনন্দ—এই ধারণা-সমুচ্চয় বিশ্বসাহিত্যের বিশদ মজলিশে স্থাপন ক'রে এর মৌল সীমা-শক্তি-বিভূতি ও স্খলন-পতন ছেঁকে তোলা যায়। কিন্তু

তার আগে বলা দরকার : সাহিত্যের এই অন্তর্গত স্রোতঃপথ প্রসঙ্গে লেখকে-লেখকে দেশে-কালে ভিন্নমত লক্ষ্য করা গেলেও শিল্পসাহিত্য থেকে এই অপরিনির্বাণ বিষয়গুলির নির্বাসন কারো কাম্য হ'তে পারে না ; অর্থাৎ সাহিত্যের লক্ষ্য, পরিবর্তমান অর্থে, সত্যও বটে সুন্দরও বটে এবং শেষ-পর্যন্ত সাহিত্য নামধেয় যে কোনো রচনা কল্যাণ বা আনন্দসঞ্চারী। দেশে-কালে লেখকে-লেখকে কেবল যে-পার্থক্য ঘটে তা অস্মিতা ও ব্যক্তিস্বরূপের : যথা—সত্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব যেমন স্বর্লোকের শান্তিধারায় অভিস্নাত, এমিল জোলা-র তেমন নয় ; সুন্দর-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-মতে অবিচলিতমনা, রাইনে মারিআ রিলকে তা থেকে ভিন্ন পরামর্শ দ্যান ; অথবা সাহিত্যের কল্যাণশক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মীমাংসা সমান্তরাল নয়। যেন রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হচ্ছে, বিভিন্ন রঙের আলো ফেলা হচ্ছে অভিনেতাদের উপর :—ঐ অভিনেতাদের বলা যেতে পারে সত্য-সুন্দর-কল্যাণ, আর ঐ বর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তির চিত্ত।

> দেশে দেশে মানুষ আপনার সত্য প্রকৃতিকে আপনার অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। মানুষ আপনার দৈন্যকে, আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশী।.....সাহিত্যশিল্পকে যারা কৃত্রিম বলে অবজ্ঞা করে তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত, প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়াতাড়ালাগা আবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম ; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে। যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য, তার শিল্প একটি বড়ো পন্থা। তা কখনও কখনও বাস্তবের রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে।
>
> ['সত্য ও বাস্তব', "আধুনিক সাহিত্য" : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

নিম্নরেখ অংশগুলিতে অভিনিবেশ দিলে মনে হয় : রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিলো বাস্তব ও প্রাত্যহিক মানুষ নানাভাবে অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম, এবং সত্য ও বাস্তব যেন আমেরু আলাদা, যেন সত্য বাস্তব হ'তে পারে না। এখানেই য়োরোপীয় সত্য-ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সত্য-ধারণা দ্বিমেরু-

বিষম হ'য়ে ওঠে। যদিচ উপযুক্ত উদ্ধৃতির শেষ লাইনে 'আধুনিক' চেতনারই অনুলিখন, বা প্রাক্‌লিখনও বলা চলে, তবু গোটামুটি তা তত্ত্ব হিশেবে তাঁর কাছে যাচিত মর্যাদা পায়নি ; পক্ষান্তরে, য়োরোপ বা রবীন্দ্রঠাকুরোত্তর বাংলাদেশে বিষিয়ে-ওঠা বাস্তবকে বা মানবজীবনের আবিলতাকে সত্যেরই উৎসঙ্গে মেলায়।

The arts, literature, poesy, are a science, just as chemistry is a science. Their subject is man, mankind and the individual.

['The serious artist' : Literary Essays of Ezra Pound]

এজরা পাউণ্ড-এর এই সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ শায় দিতে পারতেন না, কিন্তু বাংলাভূমির কথাসাহিত্যে যখন মনোবাস্তবতা আরাধ্য ঈশ্বর হ'য়ে উঠেছিলো, তখন একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম বিজ্ঞানমন্যতাই জ্ঞাপন করেছিলেন—মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এরকম উক্তি স্বীকার ক'রে নিতে পারেন না,—কেননা তাঁর রোমান্টিক উজ্জীবনে হাঁপিয়ে উঠতো ধরা-বাঁধা বিজ্ঞান ; যিনি বাল্যবেলায় কলকাতার প্রস্তরপুরী থেকে উধাও হ'য়ে গেছেন কল্পলোকে ও নিসর্গে ; যিনি কেবলমাত্র ঈশ্বরদত্ত মানব-স্বভাব-দ্বারা জগজ্জীবনের রহস্যভেদ করতে চেয়েছিলেন, অধীত দর্শনে আস্থা রাখেননি, পাছে সহজগ্রাহ্য বিষয় হ'য়ে ওঠে জটিল ; যে-তপোবনের অস্তিত্ব ছিলো কেবল পুরাণে ও মানুষের কল্পনাজগতে তাকে যিনি তাঁর অলোকদৃষ্টিসাধনার মধ্য দিয়ে নামিয়ে আনেন এই শতকশোভাপটভূমিকায় ; —তাঁকে 'আধুনিক' ব'লে মেনে নেয়া যেমন শক্ত, তেমি তাঁর দূরদেশ-কালকল্পনার মিলনোৎপন্ন অবিশ্বাস্য সৃষ্টিসাধনাকে আধুনিকোত্তম ব'লে স্বীকার না-করা আরো-কঠিন।

Beauty is not the object of art, but its flesh and blood, its being.

["Essays in Aesthetics" : Jean-Paul Sartre]

রবীন্দ্রনাথকে মনে হয় বস্তুর স্বকীয় সৌন্দর্যই আকর্ষণ করতো প্রধানত, যদিচ তা হৃদয়ের পথেই সৃষ্টিলোকী হ'য়ে ওঠে, তবু মনে হয় ঐ হচ্ছে তাঁর মূলমন্ত্র, মৃত্তিকালগ্ন বটে, তবে এক হিশেবে অক্ষিতও বটে, যতোদিন-না তিনি উত্তরকালে বস্তুবিবিক্ত হৃদয়রসী প্রলেপের সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, সজনেডাঁটার বিষয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসাহিত্যিক আপত্তিও একেবারে অবান্তর নয় এজন্যে যে তা ঠিক রবীন্দ্রচেতনায় তথা শিল্পাংশে ধৃত হ'তে পারেনি। এমনকি যখন তিনি ঈষৎ শিল্পবিচ্যুত হ'য়েও গল্পকবিতা

সম্ভব ক'রে তুললেন, তখনও 'এ গান যেখানে সত্য অনন্ত গোধূলি-লগ্নে'র ছন্দোচ্চারণে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে মরা বিড়ালের ছানা মাছের কানকো ছাইপাঁশ অব্যর্থ মনে না-হ'য়ে অলগ্নতায় প'ড়ে থাকে।২ তবে এমনকি যে-খেয়ালি জাঁ-পল সার্ত্র আধুনিক বিশ্বকবিতার জনিতা শার্ল বোদলেআর-কে অগ্রাহ্য ক'রে ঠেলে তোলেন ফরাশি কবিকুল-শিরোমণি ব'লে শব্দব্রহ্মবাদী স্তেফান মালার্মে-কে, সৌন্দর্য-সম্বন্ধে তাঁর মতামত মোটা-মুটি সাধারণের ধারণাই অনুমোদন করে ঃ

> Beauty is not monadic It requires two unities, one visible and the other secret. If ever we managed even after relentless effort to penetrate into the essence of a work by a single glance, the object would be reduced to its inert visibility, Beauty would be effaced, and only its ornamentation would remain.
>
> [প্রাগুক্ত]

অথবা, বাংলাদেশে উত্তররৈবিক কাব্যচেতনায়ও সৌন্দর্যধারণা মোটামুটি দীর্ঘপোষিত কাব্যকানুনেরই সমর্থন পায় ঃ

> হ'তে পারে কবিতা জীবনের নানা রকম সমস্যার উদ্ঘাটন ; কিন্তু উদঘাটন দার্শনিকের মতো নয় ; যা উদ্ঘাটিত হ'ল তা যে কোনো জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে।
>
> ['কবিতার কথা', "কবিতার কথা" ঃ জীবনানন্দ দাশ]

এমনকি হৃদয়জীবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে যে-মননশীল ইমানুএল কাণ্ট-কে স্থাপন করা যায়, তাঁর নিকটেও সৌন্দর্য চিত্তেরই নিপট প্রেরণা মাত্র। কিন্তু যদি রবীন্দ্রনাথের সত্যসুন্দরের সঙ্গে একালের সেতুপ্রণয়ন অসম্ভব বোধ হয়, তাহ'লেও ক্রোচে-র স্বজ্ঞা ও প্রকাশের ভরকেন্দ্রে অথবা লরেন্স-এর রক্তের শাশ্বত ধর্মনির্মুক্তি একদেশদর্শিতায় তুল্যমূল্য। এদিকে, আরিস্টটল, আনন্দবর্ধন বা ক্রোচে-র ভাষ্যে সাহিত্যের আনন্দফল—অর্থাৎ মীমাংসা অভিন্ন, কেবল প্রত্যেকের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আবার, ফ্লোবেঅর-এর মতো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ম্ভর শিল্পের হাতির দাঁতের কুঠুরিতে নিজেকে রুদ্ধ রাখেননি, বরঞ্চ আনুপূর্ব জীবনকেই রচনা ক'রে তুলেছিলেন শিল্পময় ক'রে তুলেছিলেন। আসলে সুখদ প্রাচ্যপ্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্য-সুন্দর-কল্যাণের নিরন্তর নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধ অনবনমনে চলেছিলেন, সমস্ত নেতি

যেখানে এসে এক অপার সদর্থকতায় রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। এমনকি যাঁরা এই ঘনঘোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকর্ষণ থেকে একদিন সবলে নিজেদের ছিনিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদেরই অন্যতম, নাস্তিকেন্দ্রিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সারাজীবন নিখিল নঞর্থক রাষ্ট্র করার পরেও, উপান্ত্যজীবনে, ১৯৫৬ সালে, লেখেন: 'দিনে দিনে নিজেকে যত চিনছি তত বুঝছি যে সংসার আমার বৈরী নয়, বহির্জগত সুন্দর ও অতিথিবৎসল।' এবং পূর্বপরিচ্ছেদে উদ্ধৃত জীবনানন্দ দাশের কবিতার লাইন ক'টিও শূন্যসন্ধান নয় নিশ্চয়, বরং সুস্থির সুরসাম্যেরই বৈতাল। অতএব, রবীন্দ্রনাথ, সত্য-সুন্দর-কল্যাণের অপরিক্লান্ত সম্প্রচারক, আশরীর স্বাঙ্গীকৃত করেছিলেন এদেশেরই দীর্ঘ-ব্যাপ্ত ইতিহাসচেতনাকে এবং সেই অতিভার বহনের বিদ্যুৎ-ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই ছিলো।

৪

রবীন্দ্রকাব্যের উত্তরণপরম্পরায় এই সত্য-সুন্দর কল্যাণেরই আন্তর- ও বহির্লীলা। বাঁশি, রাখাল, রাজা, নৌকো ইত্যাদি কএকটি প্রিয় প্রতীকে কবি তাঁর অনুভূতির বিচিত্র সুর রেখে গেছেন—যা সত্য সুন্দর-কল্যাণেরই পরোক্ষ সমর্থন করে। অবশ্য এই ধ্রুবপদের ভিতরে কখনো-কখনো-যে বিপর্যাস রচিত হয়নি, তা-ও নয়। কৈশোরিক 'কবিকাহিনী''র 'কী দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,/রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল' থেকে আশি বছরের সেই ক্ষুরধার 'সভ্যতার সংকট' পর্যন্ত এই বিসংবাদ প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে সক্রিয়। কবিতালোকে ''পরিশেষে'' আছে 'প্রশ্নে'র মতো ক্ষমাহীন কবিতা; পরে, সায়ন্তন কবিতাগুচ্ছে আরো প্রকট: 'প্রথম দিনের সূর্য', 'দুঃখের আঁধার রাত্রি', 'তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতি কবিতায় 'শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়াহীন ঘর', আর মরণের অভিজ্ঞতায় উপজাত যে আঁটোশাঁটো আশ্চর্য প্রমিতির কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না-করলে মনে হয় স্নান অসম্পূর্ণ থেকে গেলো, সেই অমোঘ অনিবারণ আত্মার ইস্পাতসঙ্কাশ উচ্চারণরেখা:

> রূপনারানের কূলে
> জেগে উঠিলাম,
> জানিলাম এ জগৎ
> স্বপ্ন নয়।

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

['রূপনারানের কূলে', "শেষ লেখা" : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

মনে হয়, যদি মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে না-যেতো, তাহ'লে হয়তো তিনি চেতনার নবতর লোকে আর-একবার উত্তীর্ণ হ'তেন, অন্তত তাঁর শেষ কবিতাগুচ্ছ প'ড়ে বোধ হয় বহু আবর্তন-পুনরাবর্তন-পুনরাবৃত্তির পরে তিনি অপর কোনো ভুবনের প্রবেশ-দুয়ারে—কোনো নবপ্রস্থানের মুখে—এবং সেই হিশেবে মনে হয়, তাঁর একাশি বছর বয়সে মহাপ্রয়াণও অকালমৃত্যু, —অকালমৃত্যু, কেননা তখনো তাঁর চেতনা জাগ্রত ও অজর, তাঁর ক্ষান্তিহীন জীবন ও সত্যের অন্বীক্ষা তখনো আগন্তুককে স্থান ক'রে দিচ্ছে। তত্রাচ, অতিসরলীকরণের মোহে আমরা যেন না-ভুলে যাই যে কবি-জীবনের এই শেষ বছরেও, ১৯৪১-এও, তাঁর মূলমন্ত্র মৃত্যুর কএক মাস আগে লেখা 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'তে : 'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে। / সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি/এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।'

কবির গদ্যরচনায়ও প্রধানভাবে সত্য-সুন্দর-কল্যাণ-চেতনাই সর্বত্র সমীরিত ; আবার ব্যতিরেকী উদাহরণও দ্রষ্টব্য। যেমন, "সে", "গল্পসল্প", "খাপছাড়া" প্রভৃতি অস্বভাবী গ্রন্থ, যা শিশুসাহিত্যের মুখচ্ছদ এঁটে আমাদের সুমুখে হাজির হয়। রবীন্দ্রকবিতায় যে মাঙ্গল্যপ্রবণ নিসর্গ-প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, তাঁর ছোটোগল্পে সেই স্নিগ্ধ ও মধুর নিসর্গ সর্বদা অনুসৃত হয়নি ; যেমন 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে' মনিবপুত্রের সলিল-সমাধির পরে 'পদ্মা পূর্ববৎ ছলছল খলখল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায়

মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।' এই পর্যায়ে স্মরণীয় 'নষ্টনীড়' নামক সেই পারিবারিক ধ্বংসধ্বজ গল্প; কিংবা 'নিশীথে' গল্পের নায়কের মনোবিকার অথবা 'দুরাশা' গল্পের 'কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার' প্রায় মোপাসাঁ-শোভন পরিণতি; কিংবা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে শৈলবালার মৃত্যুর পর 'নিবারণ নূতন করিয়া হরসুন্দরীকে ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটা মৃতা বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।' নির্বিপ্লব বাংলা উপন্যাসের দেশে আকস্মিক "চোখের বালি", যেখানে মনের কারখানা-ঘর থেকে আগুনের জলুনি হাতুড়ির পিটুনি দৃঢ় ধাতুর মূর্তি রচনা করতে থাকে। অথবা "মালঞ্চ"র সেই শ্বাসরোধী উপসংহার, যেখানে মহাকবির মহাকরুণা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে:

> পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।' বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে—চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে, 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।' হঠাৎ ঢিলে সেমিজপরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, 'পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।' বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।
>
> ["মালঞ্চ": রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলি আকস্মিক বা আপতিক কিছু নয়। সম্প্রতি দেশি-বিদেশি অনেক সমালোচক রবীন্দ্রছবিতে এমন-সব বিষয় ও বস্তুর আবিষ্কার, উন্মোচন ও উদ্‌ঘাটন করেছেন, যা তাঁর ঈশ্বরঘনিল মানসস্বর্গের সঙ্গে যথাযথ মেলে না। এই সব বিষয়বস্তু তাঁর সাহিত্যের অন্তরে-অন্তরে দীর্ঘকাল আবহমান: কেবল যা ছিলো সুপ্ত ও গভীরসঞ্চারী, তাঁর অন্তিম রচনা ও চিত্র গুচ্ছে তা ভিতর-দুয়ার অনর্গল ক'রে বেরিয়ে এসেছিলো। তাঁর চিত্র যদি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'অবচেতনার বুদবুদ' হয়, তাহ'লে বলা দরকার: এই অবচেতনা তাঁর গল্প-উপন্যাসেও কখনো-কখনো ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এই শতাব্দীরই অপর একজন লেখক-চিত্রী ডি এচ. লরেন্স-এর সঙ্গে রবীন্দ্র-

চিত্রাবলির তুলনা চলে। উভয়ের চিত্রাবলিই ঐন্দ্রিয়িক ও চীৎকৃত, সংরক্ত ও আদিম, নগ্ন ও স্বকীয় প্রকাশে ভাস্বর; লরেন্স-এর নগ্ন নারী-পুরুষের পাশে রবীন্দ্রনাথের লিবিডো শোভন চিত্রাবলি স্থাপন করা যায়; কেবল মস্ত পার্থক্য এই: রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁর রচনার পরিপূরক, তাঁর জীবনদৃষ্টিতে এতোকাল যা খানিকটা অবহেলিত ছিলো তারই দ্যুতিময় লীলায়িত প্রকাশখেলা; আর লরেন্স-এর চিত্রজগৎ তাঁর জীবনচৈতন্যেরই বিস্তার ও প্রসার, তাঁর জীবনদর্শনেরই চিত্ররূপ।

এরই সমপরিসরে মধুসূদন-উৎখাতে, বঙ্কিম-বিরোধে ও উত্তররৈবিক ঊর্ধ্বশ্বাস 'আধুনিকতা'র পরিহাসে—অন্তত এই তিনবার—অস্বস্থ ও আরক্তিম রবীন্দ্রমুহূর্তগুলি প্রয়োজনীয় হ'তে পারে; কিন্তু স্মরণীয় উত্তর-কালে যেমন তিনি মধুসূদনকে আবার তাঁর ধ্রুপদ আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন, যেমন বঙ্কিমকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, তেম্নি সন্থবিকশিত আধুনিকদেরও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রায় প্রত্যেকটি তৎকালীন তরুণের রচনাকে সম্বর্ধনা ও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। তিনিই বাংলা আধুনিক কবিতার জনক মধুসূদন দত্তকে বলেছিলেন 'নির্বীজ', আজ তিরিশের সর্বস্বীকৃত আধুনিকতাকে সেদিন বলেছিলেন 'গুলি-পাকানো ল্যাঙট-পরা ধুলো-মাখা আধুনিকতা', এবং

> কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।.........কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে, অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় হইতেই সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন? কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।
>
> ["বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (চতুর্থ খণ্ড): সুকুমার সেন, ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ক্রুদ্ধ অবস্থানের পরেই তিরিশের সৃষ্টিশীল সমালোচকদের রবীন্দ্রবিরোধের একটি পঞ্জি তৈরি করা যাক:

১. দেশ থেকে যে সব পত্র ও পত্রিকা পাই সে সব পড়ে অস্পষ্টরকম বুঝতে পারি দেশে দু'রকম কবিওয়ালা কথার কুস্তি লড়ছেন।......সবচেয়ে আমাকে লজ্জিত করেছে, রবীন্দ্রনাথও এর মধ্যে আছেন।...অতি আধু-

নিক বাংলো সাহিত্যে অতি-আধুনিকদেরই জন্ম হতে বাধ্য।

['জীয়নকাটি', "মনে মনে" : অন্নদাশঙ্কর রায়]

২. 'কল্লোলে'র লেখকেরা মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন—কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লেখবার প্রয়োজন মনে করেন না—যদিও তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়; তিনি ভারত ও ইউরোপের অনেক জাত ও অনেকের মতে শাশ্বত বিষয় নিয়ে শিল্পে সিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানা রকম সঙ্কেত রয়েছে যা তিনি ধারণা করতে পারেননি বা করতে চাননি।

['অসমাপ্ত আলোচনা', "কবিতার কথা" : জীবনানন্দ দাশ]

৩. কিন্তু সে-সমস্ত সত্ত্বেও হয়তো এমন বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত যে রবীন্দ্রনাথ কালের আনুকূল্যে একেবারে বঞ্চিত নন; এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে আমাদের আস্থা থাক বা না থাক, আমরা মানতে বাধ্য যে মহাকবির আবির্ভাব লগ্নসাপেক্ষ। অর্থাৎ সকল প্রকারের মহত্ত্বই সুযোগ খোঁজে; এবং সাহিত্যিক মহত্ত্ব প্রকাশের সুসময় ভাষার শৈশবাবস্থা।

['ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', "কুলায় ও কালপুরুষ" : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

৪. তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু ঊর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।

['বাংলা সাহিত্যে প্রগতি', "সাহিত্যের ভবিষ্যৎ" : বিষ্ণু দে]

কিন্তু এই সবই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিলিখন; ক্রমশ এইসব লেখকেরা রবীন্দ্রমাহাত্ম্য অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে ফেলেছিলেন, যেন কবি স্বয়ং তাঁর আশি বছরের জীবন ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতকে আচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছেন: একদিকে লোকশিক্ষা, সমাজহিত, দেশোন্নয়ন—মানবের কল্যাণভাবনায় বিরতিহীন ক্ষরণ ক'রে চলেছে, অপরদিকে কেবলমাত্র প্রাতিস্বিক উপলব্ধি ও অস্মিতার নিগূঢ় নিঃসরণ: এই আয়তনযুগ সর্বদাই পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেনি, অনেক সময়ে অর্ধনারীশ্বর। 'হায় রে, সমাজ-দাঁড়ের পাখি!' এই খেদোক্তির পাশেই সমাজকর্মী রবীন্দ্রনাথের দেশ-সমাজ-ও রাষ্ট্র-চেতন সত্যসংবৃত রচনারাশি প্রবাহিত হয়েছে। ঊনবিংশ

শতাব্দীর বাংলা দেশই নয়, সমগ্রভাবে পৃথিবীই ছিলো স্বস্থ ও সুন্দর ; লরেন্স, তাঁর কোনো-এক উপন্যাসে, লিখেছিলেনঃ '১৯১৫-য় পুরোনো পৃথিবী শেষ হয়ে গেলো.' আর একজন বাচংযত লেখক, ই. এম. ফর্ষ্টর-এর কাছে নবোত্তৃত পৃথিবী এরকম বহুলাঙ্গ মনে হ'য়ে ছিলো যে তিনি এই নব্য বিশ্বপৃথিবীর পটভূমিকায় তাঁর পক্ষে আর উপন্যাস প্রণয়ন সম্ভব নয়— ঘোষণা করেছিলেন। সেই নবাগত নিঃসহ জটিলতাকে আতিথেয় রবীন্দ্রনাথ ধারণ করেছিলেন, 'যেখানে পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা "না", 'তা-ও,—অাঁকাবাঁকাভাবে উপরের কোনো-কোনো লাইনে তা রেখায়িত হয়েছে, যার জন্যে এমনকি কখনো-বা তাঁর সেই আলোক-বোধন—সেই সত্য-সুন্দর-কল্যাণের ধ্রুবা—নিজিত হয়েছে তাঁরই হাতে। এম্নিভাবে, মনোবিত্থার ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অন্তর্বৃত' ও 'বহির্বৃত' একাধারে এই সোচ্চার দুই প্রদেশে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন।

৫

ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হ'য়েও রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে যে-কথাটি অস্খলিত দাঁড়িয়ে থাকে, তা হচ্ছে এই তথ্য, যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত একজন কবি। কবি ;—কিন্তু তিনি মহাকবিতা রচনা করেননি, তাঁর বাণীর ললিতা উদ্গীত হয়েছে টুকরো টুকরো প্রাণবিক মনস্বিতায় ভ'রে উঠে ; তাইতো গল্পে-উপন্যাসে এমনকি দস্তএভস্কি-র মতো অবচ্ছিন্ন আশ্রয়ভূমি থেকে তাঁর চরিত্রপাত্র সম্পূর্ণ উল্টো পদ্ধতিতে এক অমরতার গন্তব্য সন্ধান ক'রে ফেরে ; তাইতো তাঁর প্রবন্ধমালা কোনোরকম 'সাহিত্যিক' (literary) প্রচল মানে না ; আর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যরচয়িতা হ'য়েও রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক কিছুতেই জমে না।

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অভিজাতমগ্নতার দেদীপ্যমান ফাঁপরে প'ড়ে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর মধ্য-ভিক্টোরিয়ান-পর্বের সুরুচি ও আদর্শ, তাঁর উপনিষদ-উত্তেজ মানস তাঁকে বাঁচাতে পারতো না, যা পারতো এবং পেরেছিলো তা হচ্ছে আগন্তুক আধুনিকতার সঙ্গে তাঁর আলিঙ্গন, প্রাক্তন সুসীম সাহিত্যচেতনার বুর্জোয়াপনা উৎখাত ক'রে চিরোজ্জ্বল ক্রন্দসীর নিচে ধুলোমাখা মানুষের ও মানসের সঙ্গে তাঁর নিজেকে স্থাপন করার শক্তি।

এবং সত্য-সুন্দর-কল্যাণকেও তিনি দেখেছিলেন একজন কবিরই দূর ও আভিজাতিক কেন্দ্রভূমি থেকে, যেখানে জীবনযাপনের আবশ্যিক বাস্তবতার ছন্দ চাষাড়ে মনে হয়, যেখানে শিল্পের শর্ত বাদে আর-সব অনাবশ্যকের অবলেশ হ'য়ে যায়, যেখানে জীবনের ভার ঝ'রে গিয়ে স্ফূর্তির ধারাবাহিক দীপাবলি জ্ব'লে ওঠে কেবল শিল্পাগ্নিতে। কিন্তু, সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কবিসংবিত ও কবিকৃতিতে খানিকটা বিসংগতি আছে—তাঁর রাশি-রাশি রচনায় তাঁর ধারণার আলোক তিনি পরিবেশন ক'রে গেছেন, আবার কিছু-কিছু রচনায় এক অস্থিত অনুত্তরণ—আমরা এই তাঁর সত্য সুন্দর-কল্যাণ-ধারণার তাঁর রচনার আলোকে সঙ্গতি ও বিসঙ্গতি উপরে নিবিষ্ট ক'রে দিয়েছি। সত্য-সম্পর্কে তাঁর ঈষৎ অসম্পূর্ণ ধারণা, সুন্দর-সম্বন্ধে তাঁর অভিজাত মনোভাব ও তাঁর দেশসমাজের প্রয়োজনানুগ কল্যাণচিন্তা সর্বাংশে তাঁর শিল্পবিন্যাসে স্বাক্ষরিত ও অনুসৃত হয়নি। তাঁর অর্জিত তত্ত্বের সুমিত চক্র ডিঙিয়ে তাঁর শিল্প বৃহৎ জীবন ও নীলিমাক্রান্তির উদ্দেশে রওনা হ'য়ে গেছে,—যেমন অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছিলো ভিন্নার্থে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিধি পেরিয়ে বঙ্কিমের রচনা, যেমন গিয়েছিলো এগিয়ে কবিদের উদ্দেশে প্লেটো-র কবিতাক্রান্ত বক্রোক্তি। আন্তর-ও বহির্বাস্তবতাকে আকর্ষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথের সত্যসংবিত পূর্ণায়ত হয়েছে; অভিজাত মনোভাব ঝরিয়ে যা পরুষ ও উৎকট বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে তার স্থান ক'রে দিতে তাঁর সৌন্দর্যচেতনা নব্যতন্ত্রী আধুনিকতাকে স্পৃষ্ট ও উচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে গেছে; আর একজন উইলিঅম আর্চর যেখানে শিশ্ন ও যোনির তথা রিরংসার নগ্নকঠিন প্রকাশলীলা দেখেছেন, তা, এবং 'নষ্টনীড়' বা "মালঞ্চে"র মতো রচনা নিশ্চয় নিসর্গসুন্দরীর বন্দনাগাথায় বা মানব-কল্যাণে প্রণীত হয়নি। এইভাবে তাঁর নভোচারী অপিচ শিল্পময় সত্য-সুন্দর-কল্যাণের ত্রিবেণী নিটোল, সুগোল ও স্বয়ম্পূর্ণ হয়েছে। 'No one is cynic', এমনকি সার্ত্র-র মুখে যখন এই কথা শুনি, তখন মনে হয়, নাস্তি ঊর্ধ্বশ্বাস আধুনিকতার ভিড়বিলোল অতিবিষম নবনির্মোচন মাত্র। অতঃপর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পসাহিত্যতত্ত্বের এই বহুবিলম্বিত পটশোভা ভূমিতে, মনে হয়, আলবের কাম্যু-র এক আর্ষোক্তি নববিন্যাসে মর্যাদাবান ক'রে নেয়া যায়ঃ

> 'No artist tolerates reality', says Nietzsche. That is true, but no artist can ignore reality.
>
> ['Rebellion and Art', "The Rebel" : Albert Camus]

১. এ-প্রসঙ্গে অজস্র উদাহরণ সমাহৃত ক'রে তোলা যায়, বর্তমানে সে-সব স্থগিত রেখে একটিমাত্র অসামান্য কবিতাবিন্যাসের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি: শরীরের আবরক একটি তুচ্ছ নূতন কাপড় একটি সামান্য অন্তরীয় তাঁর শিল্পৈষণার এবং সাধারণ বস্তুর শিল্পে রূপান্তর ও অনন্যকরণের এক উজ্জ্বল-মেধাবী পরিচয়পত্র: স্থানাভাবে কেবলমাত্র প্রথম স্তবকটি উদ্ধার করলুম: 'সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী, / তাই আমার এই নূতন বসনখানি/ নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে দেখতে কি পায় কেউ ? /সেই নূতনের ঢেউ/অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি। /...'— "বলাকা", ৩৮-সংখ্যক কবিতা।

২. বিপ্রতীপের মিলনে সুন্দরের জন্ম, অথবা কদর্যতার মধ্য থেকে সুন্দরের উন্মেষ—এইসব যখন য়োরোপীয় অন্বীক্ষা, তখন, তার সঙ্গে রানি কমলিকার কুৎসিতদর্শন রাজাকে শেষপর্যন্ত ভালোবাসা—নিশ্চয় সমান্তর নয়, বরং জীবনের উপরতল থেকে উচ্চারিত ব'লে বোধ হয়।

[১৯৬৭]

বন্ধ দরোজায় থাকা

১

প্রত্যেকটি লেখকের যাত্রা শূন্যবিন্দু থেকে ঃ আমার চারপাশে কেউ নেই কিছু নেই—ব্যক্তিসত্তার এই পরম অস্মিতা থেকেই আসে যাবতীয় শিল্পলীলা ঃ সেই লীলাময় ক্ষমতার দূরবিহার রটে গল্পে উপন্যাসে নাট্যে কবিতায় বা। এই শূন্যবিন্দুর রওনা ও স্থাপনা কোনখান থেকে? সে কি সৃষ্টিপৃথিবীর সমপাতে? না কি সভ্যতার আঁটশাট জন্মলগ্নে? অথবা সাহিত্যেতিহাসের এলোমেলো অপ্রমেয় ভোরসকালে? উত্তর দিতে থমকে দাঁড়াতে হয় আমাদের ঃ হয়তো এই সৃষ্টি, সভ্যতা ও সাহিত্যেতিহাসের অদ্ভুত অপিচ আবশ্যিক এক সমাপতন ঘটে লেখকের মনে; হয়তো ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের গভীরতলে হাজার হাজার বছরের বেদনা, চেতনা ও স্বপ্ন ছলছল খেলা করে—যে সব গোপন দেরাজ থেকে বেরিয়ে আসে বড়ো বড়ো শিল্পসাহিত্যের দেশখণ্ডগুলি ;—অর্থাৎ, এই শূন্যবিন্দু দেশ-কালের দেয়াল পেরিয়ে আবহমান ইতিহাসচেতনার যাত্রা-রেখ থেকে প্রত্যেকটি অনিমেষ লেখকের মধ্য দিয়ে বারে-বারে চ'লে আসে। এই কোণ থেকে এলিয়টপ্রোক্ত ইতিহাসচেতনা কল্পনাজীব ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত মাত্র, যদিচ এক হিশেবে তাকে মান্য ক'রে নেয়া যায়। অথবা এই পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নেয়া যায় বড়োজোর যে ইতিহাসচেতনা আর ঐ শূন্যবিন্দু কবির কল্পনামনীষায় একাধারে সক্রিয়। মনে হয়, অতএব, যে-সব অক্ষর জিনিশ শিল্পীর চেতনা থেকে বেরিয়ে আসে, তার গভীর-খননে গেলে এই সব আবছা ও হিরণ অন্তর্জ্ঞান ক্রমশ বিশুদ্ধ হ'তে পারে। এবং নাট্যনির্মাণ হচ্ছে তেমনি একটি শিল্প, যা মানবেতিহাসের প্রাথমিক রৌদ্রালোকে একদিন সৃষ্টি হয়েছিলো, যা হয়তো-বা এমনকি কবিতার চেয়ে আদিম, এদিকে এখনো সচল ;—কেননা গ্যয়টে-র উত্তরজীবী

টোমাস মান্-এর ভাষায় সভ্যতা যদি কথোপকথনেরই নামান্তর হয়, তাহ'লে এই জীবযাত্রার সর্বাধিক অবিকল প্রতিনিধি-শিল্প নিশ্চয় নাটক, কেননা একমাত্র মৌনিগণ বাদে আমাদের সকলেরই জীবন সংলাপমুখর অন্তর্নাট্যে ও বহির্নাট্যে বিবিধ দৃশ্যে বিভক্ত হ'য়ে চারিয়ে আছে। কিন্তু জীবন নিশ্চয় শিল্প নয়, এবং গ্রন্থাকারে বদ্ধ নাট্যশিল্পই বক্ষ্যমাণ রচনার আলোচ্য প্রসঙ্গ।

২

এক বেচারা শূন্যসন্ততি দেখি বাংলা আবহমান নাট্যপ্রকাশে,—অথচ যখন বাংলা সাহিত্যের বিশ্বমর্যাদা শুনি গরীয়ান, কিন্তু তা বোধহয় কবিতায় বা ছোটোগল্পেই সীমায়িত। বাংলা নাট্যের কোনো-একজন নিবিড় জনিতা নেই, যেমন নেই কবিতার ক্ষেত্রেও কেউ, কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে অন্তত ইতিহাসের তরফ থেকে আছেন একজন; কবিতার বা নাটকের ক্ষেত্রে একজন নিবিড় জনিতা নেই,—তার কারণ, প্রাকৃত জনতাস্তরের ইতিহাসের আততিতে কবিতা বা নাটক বিস্তৃত চ'লে এসেছে। স্মরণীয়ঃ—আধুনিক কালে প্রাকৃত জনতাস্তর থেকে কবিতালোক স্খলিত হ'য়ে গেছে, বা সত্যের আরো নিকটে হয়, যদি বলি, প্রত্যক্ষ জনতাস্তর থেকে প্রবল মিনারের মতো তার উত্থান; কিন্তু নাটক এখনো প্রাত্যহের লোকায়ত সংস্পর্শ ধ'রে আছে, গল্প উপন্যাসের ধরনে নয়, একটু ভিন্নভাবে লোকায়তকে স্পর্শ করতে গিয়ে তার প্রোজ্জ্বল প্রতিদ্বন্দ্ব চলছে চলচ্চিত্রের সঙ্গে। কিন্তু নাটক তো সাহিত্য, সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের দ্বন্দ্বিতা হ'তেই পারে না; তার কারণ সাহিত্য যতোই প্রাকৃতলোকে নেমে যাক, মানবের অন্তর্গত ক্রন্দসীতে তার বিহার। চলচ্ছবি মানে মৌহূর্তিক উদ্ভাসন, অস্থায়িতা তার মূল অবলম্ব। অবশ্য, চলচ্ছবি ও দৃশ্যনাট্য—উভয়েই যৌথ শিল্প, উভয়েই নির্ভর রাখে মূল রচয়িতা ছাড়াও বহু বিভিন্ন চেতয়িতার উপরে। কিন্তু যে-ব্যতিরেকী কারণিক ক্ষমতা উভয়কে আলাদা ক'রে দিয়ে যায় এবং যেখানে চলচ্চিত্রের অস্থায়িতা ও নাটকের কালাতিক্রমতা নিঃশ্বসিত হ'য়ে ওঠে, তা হ'লোঃ আশুতোষ চলচ্চিত্রের উপরে 'রচিত' নাটকের দেশ-কাল-সন্ততির খেয়া পারাপারের রঙিন শক্তি।

ছিলো একদিন, যখন কবিতাই ছিলো বাংলা সাহিত্যের সার্বভৌম অধীশ, গদ্য ছিলো দলিলদস্তাবেজের দিনযাপনের গ্লানির ভিতরে সংরুদ্ধ;

কিন্তু কবিতা যেহেতু তখনো ভিড়বিলোল জনতাস্তর থেকে স'রে আসেনি নির্বাচিত ও মুষ্টিমেয় পাঠকের মনে, অতএব তার অনেক দায় সারতে হ'তোঃ গল্পের বেগার খেটে দিতে হ'তো, কাহিনীর স্বাদ মেটাতে হ'তো, কাজ ক'রে দিতে হ'তো নাটকের ·কবিতা তাই তখন কেবল পাঠ্য ছিলো না, নাট্যও ছিলো বটে। কবিতার এই নাটকাভিনয় নানারকম মঙ্গলকবিতায় সাচীকৃত হ'য়ে, কখনো কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলীর মুখচ্ছদে. কভু ঈশচেতনায় উদ্দীপিত—সারা মধ্যযুগ ব্যেপে নিঃসরণ ক'রে গেছে। পরে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক প্রাচীনের এক ধূসর সময়সন্ধিতে জনতাচলাচলে আসার জন্যে সে আরো পরিচ্ছদ খশিয়ে নগ্ন, অলজ্জ ও প্রাকৃত বেশ ধারণ করলো—সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যমর্যাদাও বসলো হারিয়ে। তারপর, রুচি ও প্রগতির প্রশ্নে ও মীমাংসায় রঙ্গমঞ্চ তৈরি হ'লো, যদিচ নির্দিষ্ট একজন চারণের হাতে নয়। ক্রমশ স্বস্থ ও সুস্থ বাংলা নাটক জন্ম নিলো। এবং আজ পর্যন্ত সেই 'আধুনিক নাটকেরই ঈষদ্‌ভিন্ন রূপের নির্মাণ দ্রষ্টব্য।

—বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর্যুক্ত অতিদ্রুত অঙ্কিত পরিলেখে দুজন নাট্যকার দুই বিপ্রতীপ মেরু ছুঁয়ে আছেনঃ দীনবন্ধু মিত্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের অনুচর বা সহচর বাংলা নাট্যঐতিহ্যে সন্ধান ক'রে পাওয়া যাবে না, তার জন্যে যেতে হবে বিদেশেঃ য়োরোপখণ্ডে; আর দীনবন্ধুর সহজীবী বা পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে তাঁর অগ্রণী নাট্যকার পাওয়া গেলেও প্রবেশশক্তিতে তাঁকে তাঁদের পুরোভাগে স্থাপন করা যায়। এই দুজনের নাট্যগুচ্ছের প্রায় যে-কোনো স্থান থেকে দুটি উদ্ধার উভয়ের চারিত্র্যের বিষমতা জ্ঞাপন করবে। দেখা যাবেঃ দীনবন্ধু মিত্র দেশসমাজমনস্ক, বাস্তবতার পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনরূপায়ণে, পরিহাসাঙ্কিত প্রসঙ্গমালায় উৎসাহী; আর, রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নিল দুর্মোচ্য সব গূঢ় ভাষণে নিষ্ণাত, সংকেতের অধরাসত্তা উপজীব্য তাঁর তিনিঃ কবি;—হ্যাঁ, তাইঃ দীনবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের কেবল পরম্পরীণ ঐতিহাসিক ব্যাপারে পৃথুল পৃথকতা রচিত হয়নি, কথক ও কবির শিল্পীমানসের আলাদা ভুবন এই দুজন রচনা করেছেন যেন, অন্তত ঐ তুলনামূলকে দুজনকে মোটামুটি চেনা যায়। 'রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক ছন্দোবদ্ধ দীর্ঘ পাঠোপযোগী কবিতা মাত্র', 'রবীন্দ্রবাণীর ললিতায় অনেক বাস্তব জিনিশ চাপা প'ড়ে হারিয়ে যায়'ঃ এই সব সত্যার্থ অভিযোগবাণীর পরেও স্বয়ম্বশ যে-সত্যটি বাঁচে, তা হ'লোঃ

তাঁর কোনো-কোনো আশবাব অনন্তের মেহগনি ও হিরের তৈরি, নাট্যবেষ্টনী পেরিয়ে যাবার মতো স্পর্শময়। দীনবন্ধুর জীবনঘনিষ্ঠ ও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নসংবেদ্য নাট্যগুচ্ছের পাশে বিভিন্ন সূতনুকা স্রোতোরেখাও আছে—এটা অগ্রাহ্য করা চলবে না। বাংলা নাটকের সোনালি লগ্নে—অর্থাৎ, উনিশ শতকে—রাশি-রাশি নাটক অনূদিত ও রচিত ও রূপায়িত হয়েছে। মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা পরবর্তী কোনো-কোনো নাট্যলেখককে অস্বীকার করা চলে না নিশ্চয়। এবং নামোল্লেখযোগ্য আরো অনেকে আছেন, কিন্তু সত্যিকার সার্থক নাটকচেষ্টা এমনকি দীনবন্ধু মিত্র বা রবীন্দ্রনাথেও বেশি নেই। তাহ'লেও, বাস্তবতায় দীনবন্ধুকে ডিঙোনো বা স্বপ্নপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথকে এড়ানো সম্ভব হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীজ য়োরোপের প্রকৃতিবাদী নাট্যশিল্পের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর সহজীবী নাট্যকারদের সহ-অবস্থান দ্রষ্টব্য। দীনবন্ধু থেকে রবীন্দ্রনাথে উত্তরণ বাংলা নাট্যের উনবিংশ থেকে বিংশ শতকে উত্তরণ—প্রকৃতিবাদ থেকে প্রতীকীবাদে।

অপিচঃ বাংলা নাটকের বিবর্তন স্বভাবী হয়নি, স্খলিত হ'য়ে নেমে গেছে শস্তার আসরে, এক কল্পিত লোকলক্ষ্মীর চবুতরায়, বাস্তবতার নামে এক স্বকপোলপ্রযুক্ত নাট্যকাহিনী—যা কখনো সামাজিক, আধো-সামাজিক, কখনো ঐতিহাসিক আকারে ব্যক্ত হয়েছে। সমস্যা বলতে নাট্যকারেরা এমন বিষয় বুঝেছেন, যার আত্মিক মূল্যজ্ঞান তো নেই-ই, উপরন্তু যা সমকালীন বাস্তবতারও ধার ধারে না—প্রধানত। বাংলা নাটককে আসলে 'বাঙালি নাটক' বলা যেতে পারে, যদিচ সে কোন শতাব্দীর ফাঁপা বিলাসে মানুষ তা শনাক্ত করা মুশকিল, তবে এই চলতি শতকের নয় অন্তত। উত্তররৈবিককালে কবিতা, ছোটোগল্প ও উপন্যাসের তথা সাহিত্যের প্রধান মাধ্যমগুলির নবায়ন ঘটেছে বিভিন্ন কবি-কথকের হাতে; কিন্তু এই শতকের তিন-চার দশকের সর্বতোমুখী জীবনবীক্ষা নাটককে নিবিপ্লব রেখে গেছে, প্রায় স্পর্শমাত্র করেনি। রবীন্দ্রনাট্যের পরবর্তী স্বরগ্রাম তাঁর পরে পরম্পরীণ চ'লে আসেনি; বিদেশে উচ্ছিষ্ট হ'য়ে গেছে অতি-ব্যবহারে বা নূতন ব্যবহারে, কিন্তু তেমন ধারা বাংলা নাট্যের অচলায়তন ফাটিয়ে নামেনি—এরকম বিষয়ও কিছু আছে; গত শতাব্দীর দ্বিপ্রহরবেলা থেকে বাংলা নাট্যলেখকেরা একই বা প্রায়-এক প্রসঙ্গে ও প্রকরণে নির্দোষ,

সুগোল ও নির্বোধ উদ্গীরণ ক'রে চলেছেন, যেমন বছর-বছর প্রতিজ্ঞাকৃত চাষি ফিরে-ফিরে আসে তার খেতে। যতো-সব তথাকথিত সমস্যার সুকুমার চাবি খুঁজে বেড়ানো নাট্যকারের কাজ নয়—আমাদের মুগ্ধ ও সুমনা অধিকাংশ নাট্যরচকেরা সে-বিষয়ে প্রায় অজ্ঞান; কিন্তু আত্মার সঙ্গে আত্মার সন্ধ্যাভাষার কথোপকথনে খানিকটা জটিল গেরো প'ড়ে যায়, সেই সব গেরো খুলতে গিয়ে কিছু স্বষ্টিলোকী স্বগতস্ফুরণ চলতে থাকে—নাটক-নামা শিল্প অনেক সময় সেই সব স্বাবলম্বন মানে, যাকে নিশ্চয় গল্প-কবিতা-উপন্যাসের আকারে-আধারে ধারণ করা যায় না। আধুনিক জীবনের যে-দুর্মর জটিলতা থেকে উদ্ভূত নূতন কবিতা-গল্প-উপন্যাস পুরোনোকে তছনছ ক'রে ফেলেছে, বাংলা নব নাটক এখন তার প্রবেশ-দরোজায়। নব নাট্য আন্দোলনে নাটককে নব্য তন্ত্রে পৌঁছে দেবার এষণা জেগেছে। মোট কথা: নাটক-প্রসঙ্গে এরকম ধারণা, যে, নাটক ঠিক গভীর ভাবনার বাহন হ'তে পারে না—এই আমূলপ্রোথিত কুসংস্কার একদিকে স্বষ্টিশীল লেখকদের নাটক থেকে দূরে রেখেছে, অপরদিকে তৈরি করেছে রাশি রাশি অনাট্যের অকাজ।

৩

বাংলা নাটকের যখন এই বন্দিদশা, তখন য়োরোপে নাটক শিল্পিদের এক প্রধান প্রকাশমাধ্যম হিশেবে বহুদূর আলোক বোধন ও বিতরণের কাজ ক'রে যাচ্ছে। প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমীয় নাট্যমালা; শেক্সপিঅর-এর সাঁইত্রিশটি বিদ্যুত্বান নাটক—যার কাছে সব যুগই খানিকটা আশাশীল, মহাসময়ের উৎসঙ্গে সমর্পিত তাঁর রচনাবলি, অথবা বলা যায় তারই কোল থেকে এক অমিত ও শতমুখ ফোয়ারার মতো তাঁর উৎসারণ। এই সমস্তের উদ্বেল তরঙ্গ অনেক সময় আধুনিকতায় আছড়ে পড়েছে, তবু আমরা সেই সুব্যবহিত পশ্চাদ্‌বেলাভূমি ফেলে এসেছি এগিয়ে। হেনরিক ইবসেন: এই বহুস্তর নামটির পাশে এক-মুহূর্ত দাঁড়ানো জরুরি, কবিতায় শার্ল বোদলেঅর বা কথকতায় ফিয়োদোর দস্তএভস্কি যেমন, তেম্নি তিনি এক দীপিত আধুনিকতার জাজ্বল্য প্রতীক, যেমন সামাজিক নাটকের, তেম্নি কবিতানাট্যের, তেম্নি মনোপ্রবিষ্ট নাটকেরও। অগস্ট স্ট্রিণ্ডবর্গ, অ্যান্টন চেকভ, বর্নর্ড শ, পিরানদেল্লো, হাউপ্টমান, মিতরলিঙ্ক এবং আরো কএকজন—আধুনিক নাট্যেতিহাসের প্রাসাদ উঠেছে এই সব

প্রোজ্জ্বল স্তম্ভগুলির উপরে। কোনো-এক নির্দিষ্ট দেশ থেকে প্রবল উদ্‌গতি নয়, ছড়ানো য়োরোপ থেকে আধুনিক নাট্যের উত্থান। ইংল্যাণ্ড বরং ঈষৎ নির্জিত হ'য়ে গেছে নাটকে, পরে শিল্পসাহিত্যের রাজধানী প্যারিসে ও য়োরোপের বিভিন্ন দেশখণ্ডে শিকড় গেড়েছে। —একটু অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও এখানে বলি : যদি য়োরোপী সাহিত্যের অনুপন্থী বাংলা সাহিত্য ইংরেজির পরিবর্তে ফরাশি সাহিত্যের উজ্জ্বল পশ্চাদ্ধাবনে আবাল্য আনুপূর্ব ব্যস্ত থাকতো, তাহ'লে বাংলা ফসলরাশি উজ্জ্বলতর বা বিচিত্রতর হ'তে পারতো, বা এখনো পারে ;—এরকম উক্তির জন্যে, আমি জানি না, হয়তো আমার আশৈশব ফরাশি সাহিত্যের প্রতি দুর্বলতাই দায়ী।—সে যাই হোক, য়োরোপের এই নাট্যসন্ধিৎসা এতো বিবিধ বিভাগে চারিয়ে গেছে, যার সুনির্মল ও সুপ্রসর আলোচনা এই আয়তনে সম্ভব নয় ; অবহিত পাঠকসমালোচকের মার্জনা ভরসা ক'রে কএকটি কথা বলা যেতে পারে মাত্র। আরো—বলা হয়ে থাকে : দেশসময়ের সঙ্গে শিল্পের সংলগ্নতার কথা, বারে-বারে, কিন্তু দেশ-প্রসঙ্গে শিল্পীকে সচেতনভাবে নিমজ্জনের দরকার নেই—কেননা তা আপনিই আসবে, বরং দেশের চেয়ে সময় বড়ো কথা, বরং এই ব্যাপ্ত জলেস্থলে তাঁর উদ্দীপিত অভিযান্ চালিয়ে যাওয়া জরুরি, সচেতনভাবে সেটা আনাই দরকার। আর চিন্তাধারার আবার দেশকাল কী : আমি জর্মান বা ফরাশি বা ইংরেজ ভাষাসাহিত্যের ঐতিহ্যে নিজেকে স্থাপন ক'রে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারি, যদি আমার ঐ প্রবণতা ঐ ভাষাসাহিত্যের অভিমুখে যায়। মানুষ নিশ্চয় উদ্ভিদের মতো স্বদেশের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না, মানুষ মানুষ, তার আত্মার অবার উড্ডয়ন তার ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতিরই নর্মাচার।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ও তার উপজাতক বাস্তববাদ বিচূর্ণ হয় বিংশ শতাব্দীর কঠিন জটিল চত্বরে। ঠিক সিগমুণ্ড ফ্রএড্-এর অনুসরণে নিশ্চয় নয়, যদিচ তাঁর প্রভাবচ্ছায়ার কথা না-বললেও চলে হয়তো ;—নয়, কেননা স্মরণীয় : ফিয়োদোর দস্তএভস্কি ফ্রয়েড-এর পূর্বাহ্ণেই মানবাত্মার পাতালদেশে প্রবেশ ক'রে অর্জন ক'রেছিলেন কতিপয় মূল্যবান মুক্তো, উন্মুক্ত ক'রেছিলেন আবিশ্ব সাহিত্যলোকের রহস্যময় এক গোপন দরোজা। অবশ্য এই সূত্রেই স্মরণ্য : ফ্রএড্-এর বিরুদ্ধে এমনকি ডি এচ লরেন্স ও জাঁ-পোল সাঁৎ'—এই বিংশ শতকের প্রথম শ্রেণীর দুই লেখকের

অস্বীকারের তেজি ও রাগি বাণী। অর্থাৎ, কি দেখছি আমরা? দেখছি ঃ উপরের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঐ মহাজনগণ পিছনে স'রে যাচ্ছেন সময়ের পট ন'ড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে, এবং আসছেন—সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই—আসছেন, এসে গেছেন একদল চিরকালের ধৃষ্ট তরুণ, নূতন নাট্য-রচয়িতা, যাঁরা শতাব্দী শতাব্দীবাহিত ও পূজিত ও আরাধ্য নিয়মাবলি কাচের তৈরি জিনিশের মতো আছড়ে চুরমার ক'রে ভেঙে ফেললেন। উপান্ত্য-স্ট্রিণ্ডবর্গ-ই অবশ্য মেনেছিলেন ভালো যে, বাস্তববাদী নাটক মৃত্যুমুখী। কিন্তু ফ্রএড্-এর ঐ অনুসরণে ও প্রতিবাদে যেমন একদিকে স্বাধীন অবচেতনলোকের উদ্ধার ও বাস্তবতার নূতন আয়তন সম্ভব হয়েছিলো, তেম্নি ঐ উদাহরণই সাহিত্যের এক শাশ্বত সত্যের সাক্ষ্য; আসলে সাহিত্যে কিছুই পুরোনো হয় না, প্রাক্তন বিমর্ষ প্রদীপ সরিয়ে ফেলে নূতন-রকম আলো আসে কেবল, পোশাক পাল্টে সাহিত্যে সবই থেকে যায়—সবই, এবং সাহিত্যে আধুনিকতা ব্যাপারটি আসলে একরকমের ছল বা চালাকি। যেমন, এককালে অতিব্যবহৃত ও বর্তমানে অব্যবহার্য-মৃতপ্রায় স্বগতোক্তিকে ফিরিয়ে এনে পুনর্বিন্যাসে স্থাপন করেছেন কোনো কোনো নাট্যকার। আধুনিকতার সংজ্ঞা সম্ভবত কর্মিষ্ঠ, সক্রিয়, নিরঞ্জন জীবনেই প্রাপ্তব্য।

চলতি শতকের যাবতীয় প্রধান শিল্পবিলোড়ন মূলত যুক্তির বিরোধী অরণিতে জ্বালানো। অস্তিতার বত্রে বাঁশি বেজেছিলো যে-তিন ধারায়, মার্টিন হাইডেগার-এএ, বহুলাঙ্গ জঁা-পোল সাঁৎ-এ, নির্মেদ আলবেআর কামু্য-তে, তারই অন্তিম সমরেখে প্রবল শেষ নাট্যচেষ্টা অসম্ভব-নাটকের উজ্জীবনমন্ত্রে। সে অঙ্গীকার ক'রে নিলে জটিল কবিস্বভাবী সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকব্যাপ্ত চিত্রকল্প—যার রহস্যশরীরে ভেদস্থান নেই; স্যুররিয়ালিজম—যা রোমান্টিকতার নূতন উদ্ধার—তার নববোধনপ্রয়াসে হ'য়ে উঠলো অন্তর্গত নিশীথসূর্যের আতপস্নাত; বলতে চাইলো এমন ভাষায় কথা, যাকে মানবিক চোখ দিয়ে দেখা যায়। এতোকাল-পূজিত চরিত্র-ঘটনা-সময়ের ঐক্য ভাগিয়ে থিয়েটারলোকে জাগ্রত হ'লো এক নববাস্তবতার রসায়ন। অসম্ভব-নাট্যের সূর্যমুখী সূত্রে আরো পাই ঃ মানলো না মানবচরিত্রের স্পষ্ট উপন্যাস রচনার দায়; ছুঁড়ে ফেলে দিলে আদি-অন্ত-মধ্য-সমন্বিত ড্রয়িংরুম-শোভন নাটুকেপনা; স্বাধীন সংলাপ ফেললে ভাষার গভীরে

অতিরিক্ত আলো; ঝরা পাতার মতন তথাকথিত বাস্তবকে মাড়িয়ে চ'লে গেলো তুমুল সেনানী, ভীষণরকমে আক্রান্ত কিন্তু বিজয়ী হ'য়ে উঠলো কবিতার কুশলতা-দ্বারা; একমাত্র যে-বাস্তব বিষয়কে স্বীকার করলে, তা মানুষের মুখের যুক্তিপরম্পরাহীন ব্যাকরণ-মানেনা এমন স্বসমুখ ভাষা। পুরোনো নাটকের ধারা এসেছে মিইয়ে;—এখন অলীক-নাট্যে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়েছেন স্যামুএল বেকেট্, ইউজিন্ আয়োনেস্কো প্রমুখ। অবশ্য, দীর্ঘ জনন-মিথুন-মরণের চক্রে চংক্রমিত মানবের জীবনের মতোই অন্যান্য বহুধাভক্ত প্রবাহও রয়েছে সচল, এবং এমনকি কখনো কুশলীর দ্বারা আশ্চর্যরকম প্রাণবিক। প্রেয় প্যারিসকেন্দ্রিক ঐ বিজয়নিধান নাট্যকলার কোন নূতন রাস্তা খুলে দ্যায়, তার জন্যে বিশ্বের সুধীচিত্তের অপেক্ষা ও উন্মুখিতা হয়তো বৃথায় লুটোবে না।

৪

অলীক-নাট্যের স্বপ্ন, কল্পনা, অবদমনের জাগরণের পাশ্বিকে জীবনের মতোই এমন অজস্রভক্ত নাটকের আতিথেয় বিষয় চারিয়ে আছে, যার প্রত্যেকটি ব্যক্ত ও ফিচেল খোপ আমার পক্ষে লোচন করা, এবং এই আলোচনার পরিসরে, মুশকিল। এখানে কেবল আর-একটি বিষয়ে ইশারাসম্পাত করতে চাই।—

সাহিত্য হচ্ছে জীবনেরই দ্বিতীয় উৎসারণ; সুতরাং জ্ঞান, বোধ ও নিবেশের জন্যে জীবনের যাবতীয় আহরণ ও গ্রহণ সাহিত্যে দ্রষ্টব্য— অবশ্য বর্জনও সাহিত্যে একটি বড়ো কথা: তাকে বলা হয় শিল্পিতার সংযম; অর্থাৎ, আহরণ নির্বিচার নয়, বরং বিষয়ানুসারে চারিয়ে দেয়াই হচ্ছে শিল্পীর কাজ। দেখা যাচ্ছে, সমস্ত বীজবন্ত বিষয় লেখকের চেতনায় নবজন্মায়িত হ'য়ে এক তৃতীয় উত্তরণলোকে উঠে যায়। আবার, নবজন্ম- বা পুনর্জন্ম কথাটি এক-হিশেবে যে-কোনো সাহিত্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য: কেননা সাহিত্য তো একরকম জীবনের নির্বাচিত পুনর্জন্ম— জীবনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ঘটনাবলির ভাষায় সাক্ষাৎ অনুবাদ; অথবা চেতনাচেতনেরই বাগীশ্বরী নির্মাণের নাম দিয়েছি আমরা: সাহিত্য। কিন্তু, বলা হয়তো বাহুল্য, বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্যের এই সরল ইশারাপাত আমার লক্ষ্য নয়;—বরং আমি সেই অবচ্ছিন্ন সন্নিপাতের প্রতি নির্দেশ

করতে চাই যেখানে পুরাণ, ইতিহাসচেতনা, কল্পেতিহাস. উল্লেখ, উদ্ধৃতি, নেপথ্যবিহারী স্মৃতিরেখা, রূপান্তরণ প্রভৃতি ফসলরাশি উঠে আসে সাহিত্যের দেশে, এসে নূতন আয়তন পরিপাক ক'রে দ্বীপাতীত উদ্দেশ্যের দিকে চ'লে যেতে চায়।

পুরাণ বা উপকথা বলতে দেশ বা জাতির অতিপ্রাচীন কাহিনী বোঝায়; সেখানে কখনো প্রতীকে, কখনো রূপকে, কখনো সরাসরি ছলছল করছে সহাস্য ও অশ্রুমতী মানুষ-মানুষীর আনন্দ ও বেদনার, জ্ঞান ও দর্শনের প্রাক্তন শাঁকো। আজকালকার নৃমুণ্ডের ভিতর তথা অবচেতনায় তার জাগর-প্রয়াস আপন মনে কাজ ক'রে যায়; একালের দীপ্তিভিখিরি মানুষের চেতনা অনুচেতনায় তার সুদূর সেতুপ্রণয়ন, কখনো টুকরো-খুচরো ব্যবহার :— অন্তত কোনো-কোনো সংবেদনায় ধরা পড়েছে; দেখা যায়, একএকটি দ্বীপবতী একালের মানুষের ভিতরে তার দীর্ঘ আনুপূর্ব অনবনমন চলেছে। —একালের গদ্যপদ্য থেকে এরকম সংবেদনশীল তথ্যোন্মোচন তেমন দুঃসাধ্য নয়। উপকথা হচ্ছে সেই আদিম দর্শন, যা জীবন- ও মৃত্যুান্তরের রহস্যগুচ্ছের নির্মোচক। সুসান কে. ল্যাঙ্গার দেখিয়েছেন: উপকথার উৎপত্তি ধর্ম থেকে নয়, প্রকল্পনা (fantasy) থেকে, যে-প্রকল্পনার জন্মউৎস আবার স্বপ্ন। ইএট্‌স্‌ বা জীবনানন্দের মতো কবি দূরপ্রয়াণের মধ্য দিয়ে সেই প্রাক্তন আলোকবর্ষগুলিতে যখন প্রবেশ করেন, তখনই বোঝা যায়: এইসব কবির মর্মের ভিতর পুরাণ—প্রকল্পনা—স্বপ্নপ্রয়াণ সরলরেখান্বিত। এরই অপর পিঠে স্থাপন করা যায় সেই ইতিহাসচেতনার, একজন কবি যাকে বিহঙ্গের বিসংগত অথচ আশ্চর্য অনুভববেদ্য নিরুক্তিতে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু আমরা যেন উপকথা, কিংবদন্তী ও রূপকথার পার্থক্য ঘুলিয়ে না-ফেলি; যদিচ কোনো-কোনো কবির চেতনাচৈত্যে এগুলির বিমিশ্র ও সমীকৃত স্বাক্ষর পাই, কেননা নেপথ্যবিহারী স্মৃতিধারণে এর অনায়াস বিন্যাস সম্ভব। পুরাণ, উপকথা, ইতিহাস, ইতিহাসচেতনা, কল্পেতিহাস; উল্লেখ, উদ্ধৃতি, পুনরুত্থান: এই সব বাংলা সাহিত্যে পুনর্জন্মে আপন্ন হ'য়ে একাধিকবার কমবেশি জয়ী হয়েছে। বাংলা নাটক থেকে এরকম উৎকলন—সার্থকতাঋদ্ধ উৎকলন বেশি সম্ভব নয়। সাধারণভাবে বিশ শতকের বিশ্বসাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্ম একটি উল্লেখনীয় বিষয়। নাট্যে জঁা এ্যানুই বা জঁা ককতো পুরাণের পুনরুত্থানে প্রায় আপাদমাথা

নিয়োজিত। সাধারণভাবে বিশ্বপুরাণের আহরণেই আত্মপ্রকাশ সম্ভব, যখন বাঙালি-মুসলমান নাট্যকারের স্বকীয় ধর্মপুরাণ ঈষদচ্ছ বা অনচ্ছ। কবিতায় বা উপন্যাসে এসবের কাজ ঋত ও বিচিত্রমুখ বটে, কিন্তু নাটকে বধির অনুবর্তন বাদে তেমন নিপট ও চক্ষুষ্মান কাজ চোখে পড়ে না তো।

৫

প্রসঙ্গের উৎসারেই নয়, প্রকরণের প্রসারেও নব নাটক স'রে এসেছে পিছনের কান্তিভূমি ফেলে, হাজার বছরের শোভাভূমি ফেলে স'রে আসছে। তাই এলিঅট যখন বলেনঃ নাটককে সাহিত্যিক সার্থকতায় না-নিয়ে যাওয়া তাকে মঞ্চায়িত না-করার মতো একই ভুলের সমতুল, তখন তা স্বস্থ ব্যাকরণমন্যতার পরিচায়ক বটে,—কিন্তু আমার পক্ষে স্বীকার ক'রে নেয়া একটু কঠিন। কারণঃ মঞ্চস্থ হওয়াই যদি নাটকের একটি অবশ্য-শর্ত হয়, তাহ'লে ক-টি প্রাচীন নাটক আজকের দিনে রঙ্গমঞ্চায়িত হচ্ছে? ক-টি বিদেশি নাটক আমরা অভিনীত হ'তে দেখছি? প্রাচীন, বিদেশি এমনকি অধিকাংশ দেশজ নাটক কি অধিকাংশ পাঠক-দর্শকের কাছে 'রচিত' ও পাঠ্য হিশেবে মর্যাদা পায় না? (বিদেশে সম্ভবত মোটামুটি উল্লেখযোগ্য নাট্যদর্শক আছে. আমাদের এখানে আরো কম—অতিসীমিত।) সে যাই হোক, অধিকাংশ নাট্যপাঠকদর্শকের কাছে নাটক আসে পাঠ্যবস্তু হিশেবে। তাই মনে হয়, সাহিত্য হিশেবে পাঠ্য হওয়াই নাটকের প্রথম লক্ষ্য না-হ'লেও শেষ লক্ষ্য বটে; মনে হয়, এলিয়টোক্ত ঐ বাণী এড়িয়ে সাহিত্যে সমর্পিত নাটকই শেষপর্যন্ত বিজয়-নিশান উড়ায়।

নাটক স্বীকার ক'রে নিচ্ছে নূতন-নূতন কুশলতা, অনেকরকম রঙ্গে, প্রজ্ঞায় ও লাবণিতে চলেছে নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন—যেমন আধুনিকতার আস্থায় চিৎপ্রবাহকে স্থান ক'রে দিয়েছেন ইউজিন ও'-নীল ("অদ্ভুত গর্ভাভিনয়")।

৬

এরই উপ-প্রস্তাব হিশেবে কবিতানাট্যের পুনরুত্থানের বিষয়টিও নিশ্চয় পুনরালোচনার যোগ্য। প্রাচীন গ্রীক ধ্রুপদী নাট্যমালা কবিতাবিধৃত; শেক্‌স্‌পিঅরও; এবং আরো অনেকে এই পরিসরে পড়ে। মনে হয়ঃ

মানবের আত্মার পেলব, মেদুর, স্বপ্নিল, সংকেতগূঢ়, নাচার এমন কতো-গুলি সংঘাত আছে, যা নাটকের মুখের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু গদ্যভাষা যেখানে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে যেখানে ছন্দোচ্চারণ অনিবারণ মর্যাদা পেশ করে। ইএট্‌স্‌ বা রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো কবিতানাট্য পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়, এই সঙ্গে উল্টো উদাহরণও স্মরণীয় যে রবীন্দ্র-নাথের কোনো কোনো কবিতানাট্য ছন্দোবদ্ধ দীর্ঘ পাঠোপযোগী কবিতা-সংকর মাত্র—যা রঙ্গমঞ্চে প্রণীত না-হ'য়ে ইজিচেআরে ব'সে পড়তেই ভালো লাগে। তত্রাচ এই মাধ্যমে তাঁরই কার্যধারা বাংলায় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এ-বিষয়ে আধুনিককালে একজন আয়াল্যাণ্ডজাত ও একজন ইংল্যাণ্ডজাত কবির নাম প্রথমেই উঠে আসে: উইলিঅম বটলর ইএট্‌স্‌ ও টমাস স্টর্ন্‌স এলিঅট। যাকে বলে কবিতানাট্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তা সৃষ্টি করেননি; কিন্তু "মেঘনাদবধ কাব্য", "বীরাঙ্গনা কাব্য" ও ও "কৃষ্ণকুমারী"-র প্রণেতার সেই সলীল ক্ষমতা ছিলো ব'লে মনে হয়, যা কবিতায় নাট্যসৃজনে উল্লেখনীয় হ'তে পারতো। গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্বকীয় ছন্দোবাণে বিদ্ধ রচনাগুচ্ছও এ পর্যায়ে স্মরণীয়। কিন্তু রাজাধিরাজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতানাট্যের চেষ্টা বাংলা ভাষাভাষীর কাছে শেক্‌স্‌পিঅর-এর তুল্যমূল্য। এবং রবীন্দ্রনাট্যের নিঃশ্রেয়স পন্থায় যেমন পূর্ববর্তীর পদচারণ চোখে পড়ে না, তেম্নি উত্তররৈবিক কবিনটেশেরাও উপর্যুক্ত পথে ভ্রমণ করেননি আর—কেবল কোনো-এক প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশের স্ব-চেতনার সুসমাচার মেলে এ-বিষয়ে; পরে, প্রায় সাম্প্রতিকের দু'একটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একক মহিমার অবিস্মরণ কীর্তিকলাপ সূর্যসংকাশ। প্রসঙ্গত মনে হয়: কবিতানাট্যের ছন্দোযাত্রা অক্ষরবৃত্তে যতোটা সম্ভবে, বাংলা ছন্দোত্রিবেণীর অপর-কোনো ছন্দে ততোটা আসে না;—তার কারণ, পয়ার ছন্দের তান্তবতা। রবীন্দ্রনাথ চোদ্দো মাত্রায় যে-আশ্চর্য গল্প বুনন ক'রে গেছেন, বর্তমানে আঠারো মাত্রার দীর্ঘ স্বয়ম্ভর পংক্তিতে তা আরো বেশি সহজ সম্ভব। এ-বিষয়েও মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর তথা প্রবহমান, ভাঙা পয়ার এবং স্বরবৃত্তেও এমনকি নূতন কাজ দরকার। কিন্তু তীব্র ভিতরের চাপে।

৭

'এই গ্রীষ্মকালে গোলাপগুচ্ছ নীল, অরণ্য কাচের তৈরি,' আঁদ্রে ব্রেতোঁ-র এই অতি-ব্যক্তিগত বর্ণনায় আমাদের আপাতপ্রগতিবাদী-কিন্তু-পরিণাম-

রক্ষণশীল কবিকুল যেমন আঁৎকে উঠবেন, তেমি বিশ্বপৃথিবীর নূতন নিঃসহ নাটক দেখে শিউরে উঠবেন প্রাক্তন ধারার তথাকথিত নাট্য-রসিকেরা। তার কারণ: অশ্রুগলিত পরিণতি বা বৈহাসিক উপসংহার, অর্থাৎ সুগোল-নিটোল নারীশরীরের মতো কাহিনীর বয়ন—নাটকের কাছে আজো আমাদের এই হায় প্রার্থনা; শিল্পের চারু সুষমতা পালন করা আবশ্যিক বটে, কিন্তু কোনো মৌহূর্তিক উদ্ভাসও-যে আধুনিক নাট্যের উপজীব্য হ'তে পারে—এই তথ্য আমরা স্বীকার করি না। প্রাচীন গ্রীস থেকে অদ্যাবধি যে-সব নাটক লেখা হয়েছে সব রগরগে কাহিনী সংবলিত, তার সংপ্রসারণে থাকেই থাকে একজন গোয়েন্দা এবং সেই ধাঁধার নিরসনেই নাটক সমাপ্ত হয়—আয়োনেস্কো-র এই দুর্ধর্ষ অভিযোগ আসলে একটি সত্য-ভাষণ,—এরই নিশিত মুখে নব নাটকের ব্যতিরেকী জয়গান. এরই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে নূতন নাট্যসীমা তৈরি হ'তে থাক।

এ-দেশের সাহিত্যেও যে-অতিবেল জীবনঅন্বীক্ষা শুরু হয়েছে, নাটকও নিশ্চয় তার একাংশ ধারণ করার পক্ষে যোগ্য শিল্পমাধ্যম, যদিচ সে-রকম সম্বিৎসা বিশেষ চোখে পড়ে না। নাটক তো সাহিত্য, সাহিত্য মূলত পাঠ্য এবং মঞ্চগুণ থাকে তো ভালো এবং পাঠ্য হিশেবে সাহিত্যোত্তীর্ণ নাটকই শেষপর্যন্ত জয়ী হবে। আজো আমাদের মঞ্চোপযোগী নাটক প্রাকৃত জনসাধারণের স্থূল সন্তোষ সাধন করতে চায় এবং ঐ যার গন্তব্য তার অবগতিও স্বাভাবিক,—খুব অল্প নাটকই গভীর ভাবনার কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে। বলা হয়তো বাহুল্য: যে-নাটক সাহিত্যোত্তীর্ণ, তা নিশ্চয় মানবের হৃদয়ের গভীরশায়িত কোনো সত্যকে স্পর্শ করবে, কিন্তু মননকে অপরিতৃপ্ত রেখে কক্‌খনো নয়। এবং এই বিষয়ে ব্যত্যয়ই আমাদের নাট্যসাহিত্যের সামান্য লক্ষণ। আর, আমার ব্যক্তিগত ধারণায়, নাটক হিশেবে ট্র্যাজেডিই নিঃশ্রেয়স;—অবশ্য, আরিস্টটলীয় হৃদয়নির্মোচনের কারণে নয়, সে তো সাহিত্যের সাধারণ সত্যই বটে। সে যাই হোক, এর ভিতরেই যারা নাট্য-রচনায় ও -ভাবনায় নিবিষ্ট তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে নাটককে চিত্তের গভীরদেশে নিয়োগ কররার জন্যে।

বাঙালি নাট্যে মুখ্যত এক নভোচারী কল্পনাবিলাস কখনো সামাজিক কখনো-বা ঐতিহাসিক আকারে ব্যক্ত হয়; রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রধান নাটকের সঙ্গে এই সব কল্পনাপ্রধান নাটকের মেরুবিষমতা লক্ষণীয়: এই

সব নাটকে কল্পনা দিয়ে বাস্তবতার অভাব মোচনের চেষ্টা হয়—অথচ যা আসলে বাস্তব নয়; পক্ষান্তরে বৈবিকনাট্যে সত্যের নিরঞ্জন সীবন কল্পবাস্তবতার বিদ্যুতে রচিত। দেখে-শুনে মনে হয়ঃ কল্পনা বা বাস্তবতা —এর যে-কোনোটিই নাটক তথা সাহিত্যের উপজীব্য হ'তে পারে, কিন্তু একজন লেখকের পক্ষে সুপ্রকাশ ও সুলিখনই প্রধান দায়। তবে, এর জন্যে আমাদের দর্শক-পাঠকদের প্রস্তুতির দায়িত্বও আয়ত—আমার তো মনে হয়, এই হতভাগ্য দেশে, এই নির্বিবেক অনুকরণের দেশে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সুবিধা না-থাকলে তাঁর ঐ সব গগনবিহারী নাটক রচনা বা অভিনয় কোনোটিই সম্ভব হ'তো না। আমরা কি কল্পনা করতে পারি, গিঅম আপোলিনেঅর-এর নাট্যে ("টাইরেসিঅসের স্তন") যখন টাইরেসিঅসের স্তনযুগ দুটো বেলুনের মতো উড়ে চ'লে যায় এবং তিনি পুরুষে রূপান্তরিত হ'য়ে যান—তখন এ-দেশের দর্শক-পাঠক কোন দৃষ্টিতে তা দেখবেন? অথবা ইউজিন আয়োনেস্কো-র নাটকে একটি লাশ ক্রমাগত স্ফীত হ'তে-হ'তে-হ'তে স্বামী-স্ত্রীর শয্যাকক্ষ জুড়ে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে ছায় আর-একটি ঘরে, তখন বাঙালি পাঠক-দর্শক সেগুলিকে কতোটুকু সহ্য করবেন? কিন্তু আমাদের বাংলা নাট্যঐতিহ্যে অন্তত একজন দুঃসাহসী পুরুষ—বিজ্ঞাপনের ভাষায় বা সমালোচনার পরিভাষার নির্মোকে নয়, একেবারে আক্ষরিক অর্থে —সেই প্রধান চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন, যাকে আমরা সমস্ত নাটকে একেবারের জন্যেও দেখলুম না—অথচ রবীন্দ্রনাথের সেই "রাজা" নাটক, এবং অন্যান্য, আমাদেরই ইতিহাসচেতনার অন্তর্ভুক্ত।

তাইতো একাধারে অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত অচলায়তনে জ্যা-বদ্ধ হৃদয় এই গান তোলেঃ অনুযাত্রী নয়, বিশ্বনাট্যের আবশ্যিক খেয়ায় কিন্তু ব্যক্তিহৃদয়ের একান্ত কনকলতা খুঁজে-খুঁজে, দেশজ পেশলতা ছেঁকে, নব্যতন্ত্রে যাই নাট্যকলার যতো-সব বেচারা কানুন উজিয়ে, নব্যতন্ত্রে যাই নাট্যকলার যতো-সব অনড় আইন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে, আইন উড়িয়ে.................

রবীন্দ্রনাথের কূটাভাস

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এদেশে কোনো নির্দলীয় ও অনুভূত সত্য উচ্চারণের জন্যে রীতিমতো অভীকতার প্রয়োজন হয়। কারণ, তাঁর সম্বন্ধে দুরকম আচ্ছন্নতা আমাদের অধিকাংশকে পেয়ে বসেছে: একটি ভক্তির অন্ধ অর্চনা, অপরটি বিদ্বেষের বিষ। শোচনার কথা এই যে, এই দ্বিদৃষ্টির কোনোটিই 'সাহিত্যিক' কারণে জন্মগ্রহণ করেনি, বরঞ্চ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে জাত। যুগল এই বিপ্রতীপ শিবিরের অধিবাসী কেবল লেখকেরা নন, পাঠকদের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘশায়িত। মনে হয়, আমাদের সকলেরই খণ্ডদৃষ্টির এই যুগ্মতা এতোদিনে বিসর্জন দেবার সময় উপস্থিত। যদিচ অবস্থাদৃষ্টে ব্যাপক আঁধির পরে কবে-যে চক্ষুরুন্মীলন হবে সেই আশংকা কিছুতেই ঘোচে না, তত্রাচ উক্ত নির্মল দিনের আশা সব সাহিত্যধর্মীর মন-মানসের ফাল্গুনীতে প্রদীপিত।

বহু দূর ভূমি থেকে দেখি একজন শিল্পীকে; ঐ দূরত্ব—গভীর অর্থে—নিকটেরই দ্বিতীয় অভিধা বহন করে; কারণ: দূরত্বের দ্বারা চরিতার্থ হন শিল্পী, তাকে পাই পূর্ণের দীপিকায়, অপ্রমত্ত ও বিস্পষ্ট আলোকে, পাই পরিবেশের প্রচুরপ্রসর পটভূমিকায়। তাই, জীবিত শিল্পীর বিচারে বিচিত্রবিধ অন্তরায় ও অসম্পূর্ণতার দায় কাঁধ পেতে নিতে হয়; কিন্তু মৃত শিল্পীর প্রতিপার্শ্ব থেকে যাবতীয় দেয়াল স'রে-স'রে গিয়ে পাঠক-দর্শক-শ্রবক-সমালোচকের জন্যে নিমন্ত্রণ মেলে ধরে;—এই দিক থেকে মৃত শিল্পীই বস্তুত জীবিত, যেন জীবনযাপনী খণ্ডিত, এলোমেলো ও

... ...

কূটাভাস (paradox)-শব্দটি মনোবিদ্যা থেকে পরিগৃহীত হ'লেও সাহিত্যে আগন্তুক নয়; মনোবিদ্যা ও সাহিত্য—উভয়ের সঙ্গেই তার আত্মীয়তা বর্তমান—যেমন অন্তর্বন্ধুত্ব আছে সাহিত্যের সঙ্গে মনোবিদ্যারও।

ত্যাড়াবাঁ্যাকা শিল্পীটি মরণের পরে সম্পূর্ণকায় দীপ্তিতে জাগ্রত হ'য়ে ওঠেন—এক-সঙ্গে-চকিতে-জ্ব'লে-ওঠা দীপাবলির সমস্ত বাতির মতো। তবু মানবের মনোলোকের মতোই এক অভেদ্য ও নির্বাতাস রহস্যময়তা শেষ পর্যন্ত তার চারিত্র্যে জড়িত থাকে ব'লেই তা শেষ-বিশ্লেষণের পরপারে। শিল্পী সম্পূর্ণ হন সারা জীবনব্যাপী তাঁর প্রকাশ-শিল্পধারার মধ্য দিয়ে, শিল্প—শেষপর্যন্ত (হয়তো প্রথম থেকেও বটে)—ব্যক্তিক ফসল ব'লেই একটি একরেখ ব্যক্তিতার টানে, যা সারা জীবন ধ'রে খণ্ডিত, এলোমেলো ও ত্যাড়াবাঁ্যাকা হয়ে ছিলো, একটি একরেখ ব্যক্তিতার টানে আঁটি-বাধা ফসলের মতো সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে; আমরা পাঠক-দর্শক-শ্রবক-সমালোচকেরা তখন ঝেড়ে, বেছে, সাজিয়ে তুলতে পারি গোলাঘরে।

এখানে, প্রশ্ন জাগতে পারেঃ শিল্প গোলাঘর, ম্যুজিঅম বা রচনাবলির আকারে-আধারে সাজিয়ে শোভা বাড়ানোর জিনিশ না চলতি জীবনের সঙ্গেই তার সহোদরের সম্পর্ক? এর উত্তর সরল নয়ঃ অনেক কোণ-মোড়-বাঁক ঘুরে, অনেক কমা-সেমিকোলন-কোলনের গিঁটে বাঁধা জটিল সূত্রের মতো বাক্যের আলোয় প্রাপ্তব্য।—শিল্পের আত্যন্ত সম্বন্ধ জীবনের সঙ্গেই বটে, যদিচ শিল্প ও জীবনের মধ্যে একটি জটিল দেয়াল তোলা; আবার সেই দেয়ালে কএকটি দরোজা কাটা আছে, যার দ্বারা শিল্প ও জীবনের প্রতিবেশিত্ব রক্ষা হয়। শিল্পের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ জীবনের সঙ্গেই বটে; এই সম্পর্ক আবার দু-তরফাঃ জীবন ছেঁকে শিল্পী তৈরি হ'য়ে ওঠে, আবার সেই শিল্প ফেরত আসে বিচিত্রাভ জীবনেই।

চলতে-চলতে এমন অনেক বিষয় শিল্পী গ্রহণ ও আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সুপ্রকাশ করেন, যা শিল্পামোদি তো বটেই, এমনকি স্বয়ং শিল্পীর কাছেও আশ্চর্যবিস্ময়ের উদ্বোধন করে; এই আশ্চর্যবিস্ময় কথাটি অবশ্য সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনের ভাষায় নয়, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই সত্য ও প্রযোজ্যঃ সেই বৈদ্যুত-পরশের আগেই যে-প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন, তা হ'লো এইঃ পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিবীজবন্ত শিল্পীকে আমরা দুভাগে ভাগ ক'রে নিতে পারিঃ আবর্তিত শিল্পী ও সরলরেখ শিল্পী। আবর্তিত শিল্পী তিনি, যিনি এক জীবনের মধ্যে বারংবার নব-নব বিষয়বিভূতির সংক্রমণে জন্মলাভ করেন, স্বনিষেকী ভাষাশ্রয়ে বারংবার আত্মঅতিক্রম করেন, ফ্রয়েডি নিরুক্তিতে রমণোত্তর নিদ্রার অন্তিমে মৃত্যু-

স্বাদের পরপারে নূতন জাগরণের রূপকের মতো। এবং সরলরেখাংকিত শিল্পী হচ্ছেন তিনি, যাঁর শিল্প কোনো একটিমাত্র প্রসঙ্গ-প্রকরণের চক্রে বদ্ধ, যদিচ সেই চক্রের মধ্যেও নেমির আভাস বা অস্তিত্ব থাকতে পারে। তবে এই বিপ্রতীপ শিল্পীযুগলের ভিতরে, কি বিষয়ে, কি ভাষায়, শিল্পীর চারিত্র্যজ্ঞাপক একটি অনিবারণ অস্মিতাপ্রধান স্রোতোরেখা থাকেই থাকে —যে-জন্যে আবর্তিত শিল্পীও সরলরেখান্বিত শিল্পীর মতোই ব্যক্তার্থের চাপে ও ব্যক্তিতার তাপে বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠেন।

আবর্তিত শিল্পী উইলিঅম বটলর ইএট্‌স্ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপরীতে আমরা স্থাপন করতে পারি ডেভিড হর্বট' লরেন্স বা কাজী নজরুল ইসলামের মতো সরলরেখ শিল্পীকে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়ঃ এই তুলনা সমালোচনার দিক থেকে লক্ষ্যভেদী হ'লেও, যাবতীয় সৃষ্টিবীজবন্ত শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই সীমাগ্রামায়িতও বটে, কেননা সৃষ্টিবীজবন্ত শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা সমালোচনার অন্যতম শর্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একজন আবর্তিত শিল্পী এটা তাঁর ক্লান্তিহীন নবনবান্বেষণ ও শিল্পৈষণার আশি বছরের মনোবাহী মানদণ্ডে উচ্ছ্বসিত। তিনি একাধারে রোমান্টিক ও ক্লাসিক—যদিচ তাঁর মধ্যে রোমান্টিক আবেদন সংবেদন উল্লেখযোগ্যরকম বেশি।[১] রোমান্টিক ও ক্লাসিক প্রতিসাম্য অবশ্য তাঁর মধ্যে সর্বদা বর্তমান নয়। তবে, সত্যিকার প্রতিভামন্তের মতোই ব[illegible] বিপ্রতীপ দ্বৈরথ সমরে তাঁর মনোলোক বিলোড়িত হয়েছে বারংবার, [illegible] তার ধ্বংসাশী ও শুভংকরী মনোভাবের হাওয়ায় সবকিছু স্বস্থভাবে সমীকৃত; তাঁর বহির্দ্বান্দ্বিক ক্রীড়াভূমির ওপারে যেমন, তেমি শিল্পীজীবনেও খোয়া-ওঠা কাঁকর-খচা ধুলো-ওড়া দ্বন্দ্বারক্ত রাস্তাগুলি তিনি এড়িয়ে গেছেন ব'লে বোধ হয়। কিন্তু এই প্রাথমিক মীমাংসার পারে আমরা যদি ঈষৎ গভীরে প্রবেশ করি, তাহ'লে দেখবোঃ একালের অনেক কবি শিল্পীর মতো স্পষ্ট, বহুস্তরী, রঙা, মুখচ্ছদ-পরা দ্বন্দ্ব নিশ্চয় নয়—তবে একরকম সুপ্রস্ফুরিত দ্বন্দ্ব কবিচিত্তকে বরাবর আচ্ছন্ন করেছে। তাঁর জীবনব্যাপী ঈশ্বরপ্রার্থনা ও আদর্শের পশ্চাদ্ধাবনে কি প্রমাণিত হয় না যে তিনি কর্দমে অর্ধপ্রোথিত?—যে-লোক ঈশ্বর-বা আদর্শপ্রাপ্ত, ঈশ্বর বা আদর্শের ব্যাপারে সে নিশ্চয় এমন উৎসুক থাকে না, রবিকাব্যালোকের বিচ্ছিন্ন প্রকাশরূপ থেকে এলোমেলো উদ্ধারেও মেলে সেই প্রমাণাঢ্যঃ

১. হে দেবতা, অনুগ্রহ হতে
রক্ষা করো অভাগা কবিরে,
অপযশ অপমান দাও—
দুঃখ জ্বালা বহিব এ শিরে।

['অনুগ্রহ' : সন্ধ্যাসঙ্গীত]

২. অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো উজ্জ্বল করো
সুন্দর করো হে'।

[৫ সংখ্যক কবিতা : গীতাঞ্জলি]

৩. প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার মাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধারা।

[৫১ সংখ্যক কবিতা : গীতিমাল্য]

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।
সব দুখশোক সার্থক হোক
লভিয়া তোমারি আলো।

[২ সংখ্যক কবিতা : নৈবেদ্য]

৫. আমি বিকাব না কিছুতে আর
আপনারে
আমি দাঁড়াতে চাই সভার তলে
সবারই সাথে এক সারে।

['প্রার্থনা' : খেয়া]

রৈবিক কবিতার অতিভাষণ ও পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি, যেমন স্বীকার করেছি তাঁর আপনাকে বহু মুখে ছড়ানোর স্বৈরাচার। গভীরতা-ব্যাপারটি গভীরভাবে তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন ব'লে আমরা এই সঙ্গত প্রশ্ন তুলতে পারি যে নিজের সীমার বাইরে যাওয়া গভীরতার অপর নাম নয় নিশ্চয়ই। এই বহু মুখে ছড়ানোর অভীপ্সার ফল বিষিয়ে উঠেছে তাঁর নাটকে: দীনবন্ধু-শোভন "মুক্তির উপায়" প্রহসনে, শরৎচন্দ্র-প্রতিম "সতী" নাটিকাটিতে ও সুভাষ বসুকে

উৎসৃষ্ট "তাসের দেশ" নাট্যে। এসব নাটক-যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরোৎসিত তার তেমন প্রমাণ নেই। 'রথের রশি' বা 'রথযাত্রায়' এই বহিঃপ্রভাবেরই টানে—মনে হয়—তিনি সমকালকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন—যা নবযুগের আলেখকপদে উঠে গিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা নজরুল ইসলামে আন্তর রূপায়িত। নবযুগায়ত বা সমকালীন হবার এই লোভ—পাঠক মাপ করবেন: এখানে এই শব্দটি কিছুতেই বর্জন করা গেলো না—রবীন্দ্রনাথকে শেষ-জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। তাঁর বহুমুখিতা, উপর্যুক্ত নাট্যচেষ্টার পরেও এই সূত্রে যেটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে তাঁর গদ্য-কবিতা। তাঁর মৌখিক ভাষায় 'রবিন-ধূত্তোর' সাহিত্যকে তিনি শেষপর্যন্ত অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই কার্যকলাপে আহত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নজরুল ইসলামের খেদোক্তি স্মরণীয়:

১. তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধের শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ম শ্লেষও তেমনি নিষ্ঠুর। তিরস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে, এ-কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু সত্যই কি আধুনিক বাংলা সাহিত্য রাস্তার ধূলা-পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য সাধনা জ্ঞান করিয়াছে?

['সাহিত্যের রীতি ও নীতি', "স্বদেশ ও সাহিত্য": শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

২. ওঁর [রবীন্দ্রনাথের] আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

[বড়র পিরীতি বালির বাঁধ: ন. র. (দ্বিতীয় খণ্ড): নজরুল ইসলাম।]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কুটাভাস আধুনিক কালের সংঘর্ষ সংস্পর্শেই সহসা আতীব্র প্রস্ফুট হ'য়ে গেছে। একটি উদাহরণ পেশ করি। কবিতায় মনন প্রকাশরাস্তা খুঁজে পেয়েছে তিরিশের কবিদের মধ্যে এরকম প্রধান নায়ক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথের "আকাশপ্রদীপ" কবিতা গ্রন্থের উৎসর্গাংশ উৎকলন করা যাক:

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কল্যাণীয়েষু,

বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি। তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে

দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

["আকাশপ্রদীপ", র. র.: ২৩: রবীন্দ্রনাথ]

এরই পাশাপাশি স্থাপন করা যাক কবির একটি পত্রাংশ:

> বিষ্ণু দে-র কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে,—সেটা দুর্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোন বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে কিন্তু এগুলি যদি প্রায়ই তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি। ঘাট বাঁধানো দীঘির পাশাপাশি পাইন বনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না। সাইকোলজির আঁকাড়া শব্দ বাংলা কাব্যের জঠরে চালান করতে পারে কিন্তু সেটি হজম না হয়ে আস্তই থেকে যাবে।
>
> [রবীন্দ্রনাথের পত্র, 'কবিতা', ৮: ১ সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু]

আধুনিক কালকে স্বীকার করলেও সে কবিতার সবগুলি লক্ষণ তিনি স্বীকার করতে নারাজ। কিন্তু এই নারাজ বিছানাই আধুনিক কাব্যে এক প্রধান শয়নোপকরণ হ'য়ে উঠেছে। আর, একথা স্মরণীয়: বিষ্ণু দে'ই একমাত্র কবি যিনি তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থে ("উর্বশী ও আর্টেমিস") রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন;—জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ঝরা পালক", সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কবিতাগ্রন্থ "তন্বী", বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "মর্মবাণী" বা এমনকি "বন্দীর বন্দনা", প্রেমেন্দ্র মিত্রের "প্রথমা" রবিকাব্যালোকবাসী বা বড়ো জোর প্রতিবেশী তার। উপরন্তু: "আকাশ-প্রদীপ" কাব্যগ্রন্থে এমন কিছু ছিলো না, যা নূতন কালকে ভিতর থেকে স্পর্শ করতে পারে।

তিরিশের কবিতার এক প্রধান প্রেরণা উদযাপিত হয়েছে অবচেতনের উন্মোচনে। জীবনানন্দ দাশের অজস্র কবিতা (বিশেষত "মহাপৃথিবী" কাব্যগ্রন্থটি) ও বিষ্ণু দের অবিচ্ছিন্ন যতিচিহ্নহীন কবিতাবলি (বিশেষত "চোরাবালি" কাব্যগ্রন্থটি) এর সাক্ষ্য। অবচেতনস্পৃষ্ট কবিতা ও কথকতা উত্তরবর্তীকালে মর্যাদায় আসন পেতেছে। আধুনিক কবিতায় সচেষ্ট রবীন্দ্রনাথ অথচ বলছেন:

> অবচেতন মনের কাব্য রচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন তা হলেই আশাজনক হবে।

এই কথাগুলি শিরোধার্য ক'রে 'অবচেতনার অবদান' নামে যে ব্যঙ্গ-কবিতাটি রক্ষণশীলতার তৎকালীন মুখপত্র 'শনিবারের চিঠি'তে বেরিয়েছিলো তার প্রথম কএকটি ছত্র নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হ'লো :

গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি
লম্বা দাঁড়ার করতাল
পাকড়াশিদের কাঁকড়া ডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর
লেজখানা যায় ছিঁড়ে
পালতে মাদার সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিড়ে!

পত্রিকায় প্রকাশকালে এই কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য যুক্ত ছিলো : 'সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি।' সঙ্গে যোলোকলা পূর্ণ করেছিলো একটি কৌতুকচিত্র।

মনোবিশ্লেষ পরিভাষায় যাকে বলে উচ্চমন্যতা, যোগ্যতা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-কর্মে তার সদর্থ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তার খানিকটা শিকার হয়েছিলেন। ভাষা, ছোটোগল্প কি অপর-কিছু সম্বন্ধে তাঁর আত্মোক্তিকে অন্তত দম্ভোক্তি বলা চলে না। কিন্তু নিজের রচনাবলি সম্বন্ধে তাঁর অবিরল ভাষ্য তাঁর অভিনব রচনাবলির মর্ম গ্রহণে যেমন সহায়তা করেছে, তেমি অনেক সময় ক'রে তুলেছে জটিলতর দুর্বোধ্যতর। "চোখের বালি"র প্রবেশকে তিনি-যে দাবি করেছিলেন সেই প্রথম অন্তরের কথামালা বহির্ভূমিতে নিয়ে আসার চেষ্টা হ'লো,[২] বাংলা সাহিত্যের অভি নিবেশী পাঠকের কাছে তা সত্য ব'লে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ : "কৃষ্ণকান্তের উইল" বা "বিষবৃক্ষে"ই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধারণ করেছিলেন মানবী মানস-সরোবরের তরঙ্গমালা। "চোখের বালি"তে বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসটি কেবল বিনোদিনীর আঁচল থেকে হঠাৎ মহেন্দ্র বের ক'রে আনেনি, মনে হয়, যাবতীয় চরিত্ররাশি ও ঘটনারাজির উপর তার ছায়াসম্পাত হয়েছে। তাঁর নীতিজ্ঞানময় সমাজশিবঙ্কর ভূমিকা বর্জন করলে বঙ্কিমের এই উপন্যাসটি হ'য়ে উঠবে নির্মেদ অপিচ অরণ্যসংকুল জটিলতায় প্রথম বাংলা মানসবিলোড়নের দিঙদর্শী রচনা। "বিষবৃক্ষে"র

পরবর্তী পদক্ষেপ "চোখের বালি" ; "বিষবৃক্ষ" প্রথম বাংলা মানসতত্ত্বসম্মত উপন্যাস—"চোখের বালি" নয়।

তিরিশচেতন আধুনিকতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিলো অনচ্ছ। তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ও সংলেখক ব'লেই, জগদীশ গুপ্ত তাঁর মনোযোগ পান। কিন্তু, পূর্বোক্ত কারণে, সুবিচার পান না। তিনিই আবার অবিরল প্রশংসাবাক্য বিতরণ করেছিলেন প্রায় সব নবীন লেখককেই ; এবং তার মধ্যে অনেক সময়েই একজন লেখকের বিশিষ্টতাখানি যথার্থত চিহ্নিত করেছেন।

তাঁর আধুনিকতা প্রাসঙ্গিক কূটাভাসের একটি উজ্জ্বল নজির তাঁর গদ্যকবিতা ও গদ্যকবিতা বিষয়ক তাঁর মতামতের মধ্য থেকে রচনা করা যেতে পারে। সার্থকতার কথা না-তুলে প্রচেষ্টার প্রশ্ন যদি তুলি, এবং সজ্ঞান সচেষ্টতার, তাহ'লে বলতে হয়ঃ বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা গদ্য-কবিতার রচয়িতা।৩ বস্তুত গদ্যের ধরনে সাজালেও কবিতা কবিতাই থাকতে পারে, এবং গদ্যকে কবিতার আকারে ভেঙে দিলেই তা কবিতা হ'য়ে ওঠে না। এই সচৈতন্য রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত ব'লেই তিনি একদিকে সৃষ্টি করেছেন "লিপিকা", আর অপরদিকে তাঁর যে-কোনো গদ্য-কবিতাগ্রন্থ, ধরা যাক "পুনশ্চ"। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে গল্প কবিতার নির্ভেদ তিনিই নির্ণয় করেছেন. তিনিই বাংলা সাহিত্যে শিখিয়েছেন প্রকরণের অন্যোন্য মিশোল, কিন্তু "লিপিকা"র প্রত্যক্ষ বা রূপক গল্পগুচ্ছের বাইরে অন্তত কোনো-কোনো রচনা স্পষ্টত কবিতা ব'লে আলাদা আধার পেতে পারতোঃ যেমন—'পায়ে চলার পথ', 'মেঘলা দিনে', 'বাণী', 'মেঘদূত', 'বাঁশি', 'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'গলি', 'একটি চাউনি', 'একটি দিন', 'কৃতঘ্ন শোক' প্রভৃতি। গদ্যকবিতা সম্বন্ধে তাঁর অস্থির ধারণার জন্যেই "লিপিকা" বইটিতে গল্প ও কবিতা একাকার হ'য়ে গেছে। পুনরপি, "পুনশ্চ"র ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যকবিতায় তাঁর অনীহা প্রকাশ ক'রে তিনি নিজে যে-গদ্যকবিতা সৃষ্টি করেছেন, শৈথিল্যে, বাকবিস্তারে ও ভুল প্রসঙ্গ নির্বাচনে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পতিত।

বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাশ্বত উৎস ; কিন্তু—ইচ্ছা-চেষ্টা সত্ত্বেও—তিনি তিরিশের কবিতার অন্তঃবাহী স্রোতোধারার পরিচয় পাননি এবং তুলে ধরতে পারেননি তার কবিতায়। তাঁর সঙ্গে তিরিশের কবিতার

কোনো উজ্জ্বল-গভীর সম্বন্ধ নেই; তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতায় আমরা ধন্যতা মানি বটে, কিন্তু তিরিশচেতন আধুনিক কবিতার তিনি কেউ নন।।

১. উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের লগ্নপ্রথমাকে আমরা ক্ষণকালীন ধ্রুপদ-যুগ ব'লে অভিহিত করতে পারি। কবিতা-বিন্যাসে মধুসূদন দত্ত যেমন তেমনি নভেলখণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিশ্চিতভাবে ধ্রুপদী—এবং ধ্রুপদরীতি এখানে বিষয়সম্ভব হিশেবে নয় বরঞ্চ "কাল্পনিক কথোপকথন" প্রণেতা ল্যাণ্ডরোক্ত কলাকুশলতার দিক থেকে জ্ঞাপন করা হচ্ছে:—প্রাক্তন ল্যাণ্ডরের মতন ধ্রুপদী বা অধুনাতন পাউণ্ডের মতন খেয়ালি উভয়েই যেখানে সমমতী।

২. সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয় বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

[ভূমিকা, চোখের বালি : রবীন্দ্রনাথ]

৩. এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি না আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে অনেক স্থলে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার। নইলে কেবল কবি নাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ-স্বরূপ তিনটি গদ্যকবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম।

[বিজ্ঞাপন, "গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক", বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

কবিতা—ঈশ্বর করুন—ম'রে যাক্ ও!

ছিলো একটি কিশোর : 'প্রকৃতি ও সংস্কৃতি' শীর্ষে একটি গল্প লিখেছিলো সে, তার কেন্দ্রচরিত্র ছিলো একজন কবি এবং যে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ ক'রে নিয়েছিলো শুধুমাত্র এই কারণে যে বাংলাদেশের তিরিশ দশকের সুখ্যাত কবিবংশকে সে তার কবিতা থেকে কিছুতেই ভাগিয়ে দিতে পারছে না। কিশোরটির অজস্র অপ্রকাশিত গল্পে কুশীলবগণ অবশ্য বিভিন্ন কোণ-মোড়-বাঁক ঘুরে অনিবারণভাবে এগিয়ে যেতো আত্মহননের প্রতি ; এবং কে না জানে : সব লেখাই—কোনো-এক অর্থে—গোপন ইচ্ছাপূরণ। অন্তত উপর্যুক্ত গল্পে তো মনে হয় জেগে উঠেছিলো ছেলেটির তখনই সজাগ অস্মিতা, অস্মিতা ও দিনযাপনের সংঘট্ট যেন তখনই ঝাপশাভাবে টের পেয়ে গিয়েছিলো সে, আত্মহত্যার ও-রকম একটি কারণ দর্শালে গল্প-যে অবাস্তব হ'য়ে উঠবে—এই হাস্যাস্পকারী ধারণা থেকে সে হয়তো অজ্ঞাতসারেই মুক্ত ছিলো, কেননা আমরা তো জানি : 'বাস্তব' বলতে যতো-সব গৃহস্থ ও রক্ষণজীবী লেখক-সমালোচকেরা যা মনে করেন তা সপূর্ণত বাস্তববৈমুখী। রক্ষণজীবী অনুমোদিত ও সাধারণ্যে পোষিত প্রচলঅনুগ বাস্তব ও কল্পনার ভেদরেখা কেমন মারাত্মক অলীক ও ভ্রান্ত, তা তো আমরা জানি ; কেননা, যাকে বলি 'কল্পনা' সে-ও তো বাস্তবতায়ই অধিবাস করে, আর আমাদের পক্ষে—যে-কোনো মানুষের পক্ষেই—অবাস্তব হওয়া কি সম্ভবপর? আমাদের ভাবনা-বেদনা-কল্পনা প্রভৃতি যাবতীয় বিমূর্ত বিষয়, বস্তুত, বাস্তবতার অংশ মাত্র। শিল্পসাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনার ভেদ নেই, আছে কেবল উনমান ও পূর্ণমান রচনা। অন্তত আমার কাছে তথাকথিত বাস্তব ও তথাকথিত কল্পনার মধ্যে বিন্দুতম ব্যবধি নেই। উক্ত 'আমার কাছে' কথাটির নিচে রেখা টেনে দেয়া যেতে পারে, কেননা ও-ই তো অস্মিতার ভরভেন্দ্র : আর-কারো কাছে নয়, আমার কাছে। জগতে এই

'আমি'-টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই যুগে-যুগে লেখক-শিল্পীরা জন্মগ্রহণ করেন। একে নিন্দার্থে ব্যষ্টিকেন্দ্রিকতা বলা হয়, অনেক সময়, কিন্তু এর উপর প্রশংসার্থেই ঐ একই শব্দ ব্যবহার্যঃ ব্যষ্টিকেন্দ্রিক; কারণ, শিল্পের জন্যে নির্বীর্য ব্যক্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন। শিল্পরচকও তাই হ'য়ে ওঠেন বীর ও নবি, সন্ত ও শহিদ। এমনকি ইএটস-এর কাছে সমরায়োজনে মৃত সৈনিকের চেয়ে আত্মবলয়ে প্রবেশ অধিকতর মহিমায় আরূঢ় হয়। আজকের দিনের কবির কাছে, তাইতো, প্রার্থনা করি সেই নিবিড় আত্মতা যা রীতির ভিতর দিয়ে বিষয়ের নবজন্ম দান ক'রে যাবে। শিল্পসাহিত্যে রাতারাতি কোনো ঘটনার সংঘটন সম্ভব নয়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে দিনের পর দিন ধ'রে রাখবে একই পরিধি। তিরিশ-অনুসৃত যতো সব ইশকুল-পাঠ্য পদ্য—যা আজকের অনেক কবিতাবোদ্ধার কাছেও ভুল মর্যাদা পাচ্ছে—ধুলোয় লুটোবে একদিন, জানি। তিরিশাশ্রিত কএকটি শৌখিন-রঙিন শব্দ, হাত-ফেরানো অভিজ্ঞতা, নির্জীবন ছন্দের দাসত্ব—কাঁহাতক ভালো লাগে আর। ছুঁড়ে ফেলে দাও ঐসব, চূর্ণ করো, ধূলায় লুটাও, আপন অক্ষমতার কঙ্কালের উপর ঝলমলে আবরণ চড়িয়ো না, নিজের ব্যর্থতার পরিমাপ জানো, জানো লক্ষ্যের উচ্চতা ও গন্তব্যের সুদূর ধ্রুবতা, পুরোনো চোখে আনো নূতন দৃষ্টি—একদিন, অর্থাৎ, একরাত্রে যেমন চাঁদকে 'আই' হরফের মতো দেখে বসেছিলেন আলফ্রেদ দ্য ম্যুসে। জেনোঃ কবিতা তোমার ঘরের বৌ নয়, সে তোমার এমন দয়িতা যাকে তুমি কোনোদিন পাওনি। কবিতাকে ঘরের বৌয়ের মতো পেয়ে গিয়ে যারা মসৃণ আরামে ম'জে আছে, তারা জানেও না তারা তাকে পায়নি। কিন্তু জানো সেই লুব্ধক অলভ্যাকে। মানো, তন্ময়আত্মতা। হে হৃদয়, লুণ্ঠিত হও! জাগো, হে অস্মিতা! আর হৃদয় যদি বিনত ও অস্মিতা যদি জাগ্রত না-হয়, তাহ'লে, ঈশ্বর করুন, ও ম'রে যাক্, যাক্ লুপ্ত হ'য়ে চিরতরে!!

নজরুল-গীতি : একটি সাহিত্যিক আক্রম

গ্রীক দার্শনিক প্লটিনাস-প্রোক্ত 'দেবতা ও আশীর্বাদপ্লুত অমরদের মনীষা কথায় প্রকাশ করা যাবে না, যাবে শুধুমাত্র সুকুমার চিত্রকল্পে', মনে পড়ে। আসমগ্র নজরুল-গীতি ঐ বাকপ্রতিমার এক প্রদীপিত শোভাবাজার। দার্শনকল্পনা তথা অলংকারমুখরতার এক বাংলা শিখর নজরুল ইসলামের সংগীতসমুচ্চয়। নজরুলের শিল্পের প্রাসাদে গীতধ্বনিত ঐ কক্ষটি সমস্তসুন্দর; তাঁর কবিতা ও অপরবিধ সাহিত্যচেষ্টার তুলনামূলকতায় বটে—যেমন বলেছেন প্রাচীন অর্বাচীন অনেক আলোচক। ওরকম আলোচনায় ঠিক হৃৎসন্ধান চোখে পড়েনি; বর্তমান যাত্রা উপর্যুক্ত রচনাবলির স্বর্গের চাবির খোঁজে। বলা দরকারঃ নজরুল-গীতির সুরবৈশিষ্ট্য ও সুরবিচিত্রতা সংগীতজ্ঞের আলোচনার মুখাপেক্ষী, এবং এখানে সে-রকম চেষ্টামাত্র হয়নি। এই অসম্পূর্ণতার দায় স্বীকারের সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও অবহিত হওয়া প্রয়োজনঃ 'সাময়িক কবিতা'র ভিতরেও নজরুল ইসলাম যেমন চারিয়ে দিয়েছেন আবহমান কবিতা'র সোনালি শীকর, তেম্নি কেবল সুরঝংকারেই নজরুলগীতিমাধুরীর অবলেশ তলিয়ে যায় না। বরঞ্চ ঐ গীতিমালার শুদ্ধমাত্র বাণীর ভিতর দিয়েই ব'য়ে যাচ্ছে কবিতার তরস্বান তটিনী। নজরুলগীতি বিষয়ক এই রচনায় বিশদ অর্থে শৈল্পিক নয়, বরং তার সাহিত্যিক approach বা আক্রম দ্রষ্টব্য।

১

নজরুল ইসলামের কবিতার মতো তাঁর গীতিপুঞ্জও মুখ্যত অলংকাররণিত; গানে অজস্র অলংকার ও কাব্যকুশলতাকে উচ্ছিষ্ট ক'রে গেছে তাঁর কবির দীপিত চেতনা ও জীবিত হাত। নরত্বারোপ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ, অনুপ্রাস, মধ্যমিল, রূপক, প্রতীক, কবিপ্রসিদ্ধি, সিনেসথেসিআ, চিত্রকল্প প্রভৃতি ভিড় ক'রে এসেছে তাঁর গানে-গানে। এই সমস্তের মধ্য দিয়ে

তিনি নির্মাণ ক'রে তুলেছেন তাঁর এক নিজস্ব কল্পনায় জগৎপরিধি। শ্রাবণকল্পনা ও দার্শনিককল্পনার এক সংমিলিত শারীরী বৈভব নজরুলগীতি। অর্থাৎ নজরুল-গীতি একাধারে গীতল ও চিত্রল। এই সূত্রে স্মরণীয়ঃ গানে বাচংযম আবশ্যিক। এবং অলংকার, যা স্বভাবত বহুচ্ছুরিত, গানে ঐ প্রয়োজন মেটায়। অলংকারস্বভাবী নজরুল, সুতরাং, সংগীতে লক্ষ্য-ভেদের একটি উজ্জ্বল উপায় স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে গিয়েছিলেন।

কঃ নরত্বারোপ

রোম্যান্টিক চিত্তবৃত্তির একটি অনিবারণ লক্ষণ নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা। এই মুগ্ধতা নিসর্গের এক-একটি অংশকে প্রাণবান ও জীয়ন্ত ক'রে তোলে। রোম্যান্টিক কবিতায় ঐ প্রাণবপনের ফসল ফ'লে ওঠে। নজরুল-গীতি থেকে উক্ত personification বা নরত্বারোপের কএকটি উদাহরণ রাখা যাকঃ

১. কবে সে ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি, আসবে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শসুখে ভাঙবে রে ঘুম রাঙবে রে কপোল।

[১ নং গান, বুলবুল]

২ সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ-সিঁথি রচি' চিকুরে,
নাচে ছায়া-নটী কানন পুরে'
দুলে লটপট লতা-কবরী।

[৩ নং গান, বুলবুল]

৩ দোলে ঝিন্দোল দোলায় ধরণী শ্যাম পিয়ারী
দুলিছে গ্রহতারা আলোক-গোপ-ঝিয়ারী।
নীলিমার কোলে বসি'
দুলে কলঙ্ক-শশী.
দোলে ফুল-উর্বশী ফুল-দোলনায়।

[২৬ নং গান, বুলবুল]

৪. বোরকা খুলি' বন-কেতকীর
ফুলরেণুতে রাঙলে গা,
পারুল-বধূর মাগলে মধু,
হাসনাহেনার ভাঙলে দোর।

[৪৩ নং গান, বুলবুল]

৫. শরম-রাঙা গালে
জাগিল কুমারী উষা,

তরুণ অরুণ ঐ
এস রাঙা বর-বেশে।

[১১ নং গান, চোখের চাতক]

৬. কেতকী ভাদর-বধূ ঘোমটা টানিয়া কোণে
লুকায়েছে ফণি-ঘেরা গোপন কাঁটার বনে।
কামিনী ফুল মানা মানে না ছুঁতে পড়েছে ঝ'রে।
গন্ধ-মাতাল চাঁপা দুলিছে নেশার ঝোঁকে
নিলাজী টগর-বালা চাহিয়া ডাগর চোখে,
দেখিয়া ঝরার আগে বকুল গিয়াছে ম'রে।

[৬৪ নং গান, নজরুল-গীতিকা]

৭, ওপারে লুকায় আঁধার গভীর ঘন বন-ছায়
আকাশে হেলান দিয়ে আলসে পাহাড় ঘুমায়।

[১১ নং গান, বনগীতি]

৮. চৈতালি চাঁদিনী রাতে
নব মালতীর কলি
মুকুল-নয়ন তুলি'
নিশি জাগে আমারই সাথে।
পিয়াসী চকোরী দিনগুলি পুরোনো
শূন্য গগনে বক্ষ জুড়ানো
দক্ষিণ সমীরণ মাধবী কঙ্কন
পরায়ে দিল বনভূমিরই হাতে।

৯. 'আয় বনফুল' 'আয় বনফুল' ডাকিছে মলয়
এলোমেলো হাওয়ায় নূপুর বাজায় কচি কিশলয়।
তোমরা এলে না ব'লে ভোমোরা কাঁদে
অভিমানে মেঘ ঢাকিল চাঁদে।

১০. ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা
বনের বিধবা মেয়ে,
হারানো কাহারে খুঁজি'
খুঁজিস নিশীথ-আকাশের পানে চেয়ে।

১-চিহ্নিত গানে পুষ্পের উন্মীলনে শিশিরপরশের ভূমিকা পুরুষের স্পর্শে কুমারীর জাগৃতির সঙ্গে তুলিত হয়েছেঃ ফুল এখানে কুমারী-নারী, শিশির পুরুষ। ফুলের বর্ণালি কুমারীর কপোলরক্তিমায় আশ্চর্য রূপান্তরিত।

২-চিহ্নিত গানে সন্ধ্যা চন্দ্রের দর্পণে মুখ দেখছে, তার অন্ধকার-অসিত কেশপুঞ্জের ভিতরে ছায়াপথ সিঁথি এঁকে দিয়েছে। এদিকে বনে নর্তকীরূপে ছায়া নৃত্যমান, দুল্যমান তার লতাঝোপের খোঁপা। এ অংশে গোধূলিসন্ধির অর্ধ-অন্ধকার, পূর্ণ চন্দ্রোদয়, ঊর্ধ্বে নীলিমার ছায়া-পথ, নিচে বনানীতে ছায়াআলোকের খেলা—সমস্ত হ'য়ে উঠেছে জীবিত।

৩ ও ৯-চিহ্নিত গানে নীলিমাঅদিতিব্যাপী প্রতিটি জিনিশ প্রাণবিক: গ্রহ, নক্ষত্র, চাঁদ, পৃথিবী, পবন, পুষ্প, পাখি ও পতঙ্গ মিলে একটি মানবিক ভুবন সৃজন ক'রে নিয়েছে—যেখানে এমনকি বাতাস ও বুলবুলির কণ্ঠ কথা ক'য়ে ওঠে বাংলা ভাষায়।

৪ ও ৫ সংখ্যক গানে ফুল, ৫-সংখ্যক গানে সকাল ও সবিতার উপর নরত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৮-সংখ্যক গানে চন্দ্রিকাপ্লুত রজনীতে প্রেমিক দক্ষিণা বাতাস দয়িতা বনভূমির হাতে কঙ্কন পরিয়ে দিয়ে যায়।

লক্ষণীয়: এইসব জীয়ন্ত গীতাংশে কবি যৌবনিত মিলনপিয়াসার চিত্র ফলিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতে প্রাণ-পাওয়া ফুল-পাখি-চাঁদ তাদের পুষ্প বিহঙ্গ ও সুধাংশু সত্তা স্থায়ী রেখেই হ'য়ে উঠেছে নারী, অধিকাংশ সময়েই নারী। মনে হয়, নজরুল ইসলামের যৌবনসত্তা এক আশ্চর্য মিশোলে নিসর্গের ভিতরে সঞ্চারিত হ'য়ে গিয়েছিলো।

উপর্যুক্ত বা আরো অনেক গীতাংশে নজরুল নরত্ব আরোপ করেছেন, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এক-একটি সম্পূর্ণাঙ্গ সংগীতেও; যেমন: বর্তমান উদ্ধারাংশের ১০-চিহ্নিত গানের শরীরময় (রজনীগন্ধাকে বিধবা-মেয়ে হিশেবে কল্পনা করা হয়েছে এবং ঐ সমস্ত গীতব্যাপী তার বেদনার্দ্র ইতিহাস সঞ্চিত) বা "সুরসাকী"-র ৬৭-চিহ্নিত গানের দেহময় (সমগ্র বাংলাদেশ একটি মেয়ের রূপ ধারণ করেছে)। কবির নরত্ব আরোপের পরিপূর্ণ নজির-স্বরূপ এখানে একটি সম্পূর্ণ সংগীত উদ্ধৃত করি, যে-গানের ঘূর্ণিবায়ু হ'য়ে উঠেছে একটি দুরন্তাচঞ্চলা কিশোরী:

> শুকনো পাতার নূপুর পায়ে
> নাচিছে ঘূর্ণিবায়।
> জল-তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল্
> ঢেউ তুলে সে যায়।।

দীঘির বুকের শতদল দলি',
ঝরায়ে বকুল চাঁপার কলি,
চঞ্চল ঝরনার জল ছলছলি'
মাঠের পথে সে ধায় ॥

বন-ফুল-আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া,
আলুথালু এলোকেশ গগনে মেলিয়া
পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া
ধূলি-ধূসর কায় ॥

ইরানী বালিকা যেন মরু-চারিণী
পল্লীর প্রান্তর-বন-মনোহারিণী
ছুটে আসে সহসা গৈরিক-বরণী
বালুকার উড়ুনী গায় ॥

[১ নং গান, গীতি-শতদল]

খ: তুলনা/প্রতিতুলনা

সাধর্ম্য ও বৈপরীত্য সন্ধান কবিচিত্তের এক নিদর্শন সূত্র। ভাবনার সঙ্গে ভাবনার, ভাবনার সঙ্গে বস্তুর এবং বস্তুর সঙ্গে বস্তুর স্বারূপ্য সন্ধানের সূত্রে কবিতায় জাত হয় তুলনা বা উপমা। 'জাত হয়' কথাটি লক্ষণীয়ঃ উপমা—যেমন অনেক আধুনিক পদ্যে প্রাপ্তব্য—বহিরারোপিত নয়, তা কবিতার উৎসজল থেকেই ব'য়ে আসে। এই স্বারূপ্য কবিতায় তুলনা বা উপমা-রূপে চিহ্নিত; আর ঐ বৈপরীত্য, যা দুটি অনোন্যবিপ্রতীপী সত্তাকে মেলায় এক করতলে, বা অন্ততপক্ষে অব্যবহিত ক'রে আনে, তাকে বলা যেতে পারেঃ প্রতিতুলনা। এই বৈপরীত্য বা প্রতিতুলনার একটি নিরুপম নজিরঃ 'বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিটল না কবি! / ফটিক জল! জল খুঁজিস যেথায় কেবলি তড়িৎ ঝলকে!' (৬১ নং গান, নজরুল গীতিকা)। কবি এখানে জল ও অগ্নির বৈপরীত্যকে একটি সমান্তরালে স্থাপন করেছেন, ফলে কবির তৃষ্ণা নিবৃত্ত না-হ'লেও তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়েছে। অথবা, নজরুলেরই সৌজন্যে, আর-একটি দৃষ্টান্তঃ 'আগুনে মিটালি তৃষা, কবি, কোন্ অভিমানে, / উদিল নীরদ যবে দূর বন-কিনারে।' (৬১ নং গান, নজরুল-গীতিকা)। এখানে বিপ্রতীপ অগ্নিকে আকর্ষণ করেছে কোনো-এক নামহীন অশরীরী অলোকতিয়াষা। নীরদের স্থানে অগ্নিতে পিপাসা

মেটানোর অসম্ভব অপিচ কাব্যসফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নজরুল। অনন্তর নজরুল-গীতি থেকে এক গুচ্ছ উপমা চয়িত হ'লো :

১, মুদিত কমলে ভ্রমরেরি প্রায়
বন্দী হইয়া কাঁদিয়া বেড়ায়,
চাহিয়া চাহিয়া মিনতি জানায়,
সুনীল আকাশে ডাকি'—
চঞ্চল ঐ আঁখি।

[১৪ নং গান, চোখের চাতক]

২. তরুণ অরুণ সম আকাশ আনীল,

[৫০ নং গান, চোখের চাতক]

৩. ফুলে-ফুলে ধরা যেন ভরা ফুলদানি
বিশ্ব-সুষমা-সম্ভাতে।

[৩১ নং গান, নজরুল-গীতিকা]

৪. গানগুলি মোর আহত পাখীর সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম।

[১ নং গান, সুর-সাকী]

৫. নাহি কেহ আমার ব্যথার সাথী
জ্বলি পিলসুজে একা মোমের বাতি।

[২৩ নং গান, গুল–বাগিচা]

৬, শফরী-সম তাহে ভাসিছে আঁখি-তারা
তাহারি লোভে যেন উড়িছে ভুরু-পাখি।

[৭৬ নং গান, সুর-সাকী]

৭. বাদল-পরীরা নাচে গগন আঙিনায়
ঝমাঝম বৃষ্টি-নূপুর পায়।
শোনো ঝমাঝম বৃষ্টি-নূপুর পায়। [৪ নং গান, বন-গীতি]

৮, বাহুর ডোরে বেঁধে মোরে
ঘুমের ঘোরে যেন
ঝড়ের বনলতার মত
লুকিয়ে কাঁদো কেন।

৯. একাদশীর চাঁদ রে ঐ রাঙা মেঘের পাশে
যেন কাহার ভাঙা কলস আকাশ-গাঙে ভাসে।

১০. মুখর আমার গানের পাখী
নীরব হ'ল হায় বারেক ডাকি'
যেন ফাগুনের জ্যোৎস্না-হসিত রাতে
নামিল বরষা।

[১৮ নং গান, সংযোজন : ন. র. তৃ]

এ শুধু একগুচ্ছ। প্রসঙ্গত স্মরণীয়ঃ 'প্রায়', 'সম', 'যেন', 'মতো' প্রভৃতি শব্দের যোগেই উপমা রচিত হয় না; উপমা রচনার আরো উপায় আছে, যেখানে উপযুক্ত শব্দগুলি থাকে লুক্কায়িত।

গঃ উৎপ্রেক্ষা

উৎপ্রেক্ষা মর্মত উপমাই। প্রকৃত জিনিশের সঙ্গে অপ্রকৃত জিনিশের সাযুজ্য সন্ধান থেকে উৎপ্রেক্ষার সৃজন। কতিপয় উদাহরণঃ

১. ভাগে তোর হানলে আঘাত
দিস রে কবি ফুল-সওগাত
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে
বনে কি দুলে ফুল-পতাকা।

[৪ নং গান, বুলবুল]

২. কুনাল কি পড়ল ধরা
পীযুষ-ভরা ঐ চাঁদো-মুখে
কাঁদিছে নাগিসের ফুল
লাল কপোলের কমল—বাগানে।

[১২ নং গান, বুলবুল]

৩ কেন কামনা-ফাঁদে
রূপ-পিপাসা কাঁদে
শোভিত না কি কপোল
ও কালো তিল নহিলে।

[১৮ নং গান, বুলবুল]

৪. মরুতে চরণ ফেলে
কেন বন-মৃগ এলে,
সলিল চাহিতে পেলে
মরীচিকা-ছল।

[২৩ নং গান, বুলবুল]

৫. ভাঙা মন আর জোড়া নাহি যায়।
ঝরা ফুল আর ফেরে না শাখায়।

[২৪ নং গান, চোখের চাতক]

৬. মন কয় চিনি চিনি
একি গো বন-দেবীর সতিনী।
শিশির ধ'রে পায় আলতার রঙ চায়,
পাখি তারি গান গায় বনে নিরালা।

[৫৪ নং গান, গুল-বাগিচা]

৭. তুই শুকতারারই সতিনী সই, সন্ধ্যাতারার জা।

[৭৪ নং গান, গানের মালা]

৮. তুমি কাশের ফুলের করুণ হাসি

মরানদীর চরে,

তুমি শ্বেত-বসনা অশ্রুমতী

উৎসব-বাসরে।

[৬৪ নং গান, গানের মালা]

৯. চোখ তুলে সে মুখের পানে ভুরুর বাণ হানে

অমনি ওঠে রামধনু গো সেই চাহনির টানে।

কপালের সে ঘাম মুছে গো আঁচল যখন খুলে'

ধানের খেতে ঢেউ খেলে' যায় দরিয়া ওঠে দুলে।

[৫৪ নং গান, গুল–বাগিচা]

ঘঃ ছন্দ

সংগীতের শ্রুতিনির্ভর সূত্র সুর, কবিতার ছন্দ। সুতরাং নজরুল-গীতিকায় প্রধানত সুরের তরঙ্গিনীই প্রবাহিত; তবু তাঁর অনেক গানে কবিতার ছন্দও কার্যকরী হ'য়ে উঠেছে। বলা বাহুল্যঃ গানে কবিতার ছন্দ আবশ্যিক নয়। নজরুলের অনেক গান কবিতা হিশেবেও আবেদনময় এবং ছন্দ এই সংগীতদ্বয়ের ভিত্তিভূমি। এরকম অনেক গানে তিনি যে-সব ছন্দ আশ্রয় করেছেন, তাতে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত বাংলা ছন্দের এই প্রধান ত্রয়ীই ব্যবহৃত। এ বিষয়ে একটি নকশা প্রণয়ন করলে সমস্ত ছবি স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে।

গীতিগ্রন্থ	অক্ষরবৃত্ত	স্বরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত
১. বুলবুল	১৪,২৫,৩৪ প্রভৃতি	১,২,৬,৭,৮,৯,১২ ২৭,৩০,৩৫,৩৭,৪১ ৪৩,৪৪ প্রভৃতি	৩,১০,২৯,৩৯,৪০ ৪২,৪৭ প্রভৃতি
২. চোখের চাতক	৩,৩৬,৪০ প্রভৃতি	১,৪,১০,১৬,২৪,৪৮ প্রভৃতি	১৪ প্রভৃতি
৩. নজরুল-গীতিকা		১,৩,৪,৫,৭,৯,১০,১১, ১২,১৩,১৫,১৬,২২,২৩ ৭৪ প্রভৃতি	
৪. সুর-সাকী		৪,৮,৯,১৯,২০,২১,৩৫, ৩৮,৩৯,৪৬,৫৭,৭০,৭৭ ৮২,৮৫ প্রভৃতি	১,৩,৫,৫১ ৫২,৬৯ ৮৪,৮৬ প্রভৃতি

গীতিগ্রন্থ	অক্ষরবৃত্ত	স্বরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত
৫. জুল্‌ফিকার		৩,৫,৭,৯,১২,১৪, ১৫,১৬, প্রভৃতি	১,২৩ প্রভৃতি
৬. বন-গীতি		১,৩,২২,৩৫,৫৩ প্রভৃতি	৮,৩০ প্রভৃতি
৭ গুল্‌বাগিচা	৮ প্রভৃতি	১,৬,১০,১১,১৩,১৫, ২১,৩১,৩৪,৩৫,৪০, ৪৬,৬২,৬৩,৬৮,৭২,৭৮, ৮১,৮৪ প্রভৃতি	৩৬,৪২,৪৪,৪৭ ৪৮,৬৯,৭০,৭৪, ৮৩ প্রভৃতি
৮. গীতি শতদল		৪,৪৯,৫৫ প্রভৃতি	১৫,৮৩,৮৪,৮৬, প্রভৃতি
৯. গানের মালা		৩,৩২,৩৪,৩৫,৩৮ ৪৪,৫০,৫২,৫৬,৬৫, ৬৮,৬৯,৭১,৭৪ প্রভৃতি	১,৫,১৯,৩৭,৫৩, ৬১,৬৩, ৮১ প্রভৃতি

এই নকশায় দেখা যাবে স্বরবৃত্তে রচিত সংগীতের সংখ্যাই অধিকতম, অক্ষরবৃত্তে ন্যূনতম। আবার, উপর্যুক্ত ছন্দাবলি ব্যবহারের বৈচিত্র্যেও বৈদূর্যবন্ত ঃ

স্বরবৃত্ত

৪ ৩

১ করুণ কেন | অরুণ আঁখি।

৪ ৩

দাও গো সাকী | দাও শারাব্‌।

হায় সাকী এ | আঙ্গুরী খুন।

নয় ও হিয়ার | খুন খারাব।

[৮ নং গান, বুলবুল]

৩ ৫

২. এত জল | ও কাজলচোখে

পাষাণী | আন্‌লে বল কে।

টলমল | জল-মোতির মালা

দুলিছে | ঝালর পলকে।

[৯ নং গান, বুলবুল]

৩ ৪ ৪ ৫
৩. চেয়ো না | সুনয়না | আর চেয়ো না | এ নয়ন পানে।
জানিতে | নাই ক বাকি | সই ও আঁখি | কী যাদু জানে ॥
একে ওই | চাউনি বাঁকা | সুরমা আঁকা | তায় ডাগর আঁখি।
বধিতে | তায়, কেন সাধ | যে মরেছে | ওই আঁখি-বাণে ॥
[১২ নং গান, বুলবুল]

৩ ৪ ৩ ৩
৪. সে নাচে | তটিনী-জল্ | টলমল | টলমল।
বনের | বেণী উতল | ফুলদল | মুরছায় ॥
বিজলী | জরীর আঁচল | ঝলমল | ঝলমল।
নামিল | নভে বাদল | ছলছল | বেদনায় ॥
[২৭ নং গান, বুলবুল]

৩ ৪ ৪ ৫
৫. এলে কি | দলিতে আজ | ধূলি-ঢাকা | ফুলসমাধি মোর।
নাহি আর | চৈতী হাওয়া | সঙ্গে আজি | বৈশাখী তুফান ॥
[১৪ নং গান, গুল-বাগিচা]

৩ ৪
৬. পূবের | করুণ্ অরুণ্
৩ ৪
পূরবে | আস্‌লে ফিরে,
কাঁদায়ে | মহাশ্বেতায়
হিমানীর | শৈল-শিরে ॥
কুহেলির্ | পরদা তারি'
ঘুমাত | রূপ-কুমারী
জাগালে | স্বপন্‌চারী
তাহারে | নয়ন্-নীরে ॥
[৪১ নং গান, বুলবুল]

মাত্রাবৃত্ত

৬ ৪
১. আসে বসন্ত | ফুলবনে
সাজে বনভুমি | সুন্দরী।
চরণে পায়েলা | রুমুঝুমু
মধুপ উঠিছে | গুঞ্জরী'।
ফুলরেণু-মাখা | দখিনা বায়
বাতাস করিছে | বন-বালায়
বন-কবরী নি | কুঞ্জে ছায়

৬ ৪
মুকুলিকা উঠে | মুঞ্জরি ॥
[৩০ নং গান, বুলবুল]

৭ ৭
২. কে শিব-সুন্দর | শরৎ চাঁদ চূড়
৭ ৪
দাঁড়ালে আসিয়া এ | অঙ্গনে।
পীড়িত নরনারী | আসিলে গেহ ছাড়ি
ভরিল নভতল | ক্রন্দনে ॥
৭ ৭
বেদনা-মন্দিরে | আরতি বাজে তব,
কে তুমি সুন্দর | শ্মশান-চারী নব
দিগদিগম্বরে | জীবন-উৎসব
৭ ৪
শঙ্খ শুনি তব | আগমনে ॥
[৪২ নং গান, বুলবুল]

৫ ৫ ৫ ৩
৩. নমো হে নমো | যন্ত্রপতি | নমো নমো অ | শান্ত।
ত্রাসে তব | ত্রস্ত ধরা | সৃষ্টি পথ | ভ্রান্ত ॥
৫ ৫
বিশ্ব হল | যন্ত্রময়
মন্ত্রে তব | হে।
৫ ৫
নন্দন আ | নন্দে তুমি
গ্রাসিলে মহা | ধ্বান্ত ॥

কোনো কোনো গানে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশোলে অভিনব ছন্দস্পন্দ সৃজিত হয়েছে—নিম্নলিখিত গানের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মাত্রাবৃত্ত এবং তৃতীয় ছত্রে স্বরবৃত্ত ব্যবহৃত ঃ

৫ ৫ ৫ ৫
ভুলি কেমনে | আজো যে মনে | বেদনা-সনে | রহিল আঁকা।
আজো সজনী | দিন-রজনী | সে বিনে গণি | তেমনি ফাঁকা ॥
৩ ৪ ৪ ৪
আগে মন্ | কর্‌লে চুরি | মর্‌মে শেষে | হান্‌লে ছুরি।
৫ ৫ ৫ ৫
এত শঠতা | এত যে ব্যথা | তবু যেন তা | মধুতে মাখা ॥
[৪নং গান, বুলবুল]

৬ : মধ্য-মিল

প্রাগুক্তির জের টেনে বলা যায় : নজরুলের অনেক গানে যেমন ছন্দের, তেমি মিলেরও বিদ্যুতি কারুকাজ দ্রষ্টব্য। এখানে, মিলের দিক থেকে গানের কথায় প্রচলনির্ভর অন্ত্যমিলের প্রসঙ্গ আসছে না, অন্ত্যমিলের অজস্র বিচিত্রতা প্রধানত তাঁর কবিতাতেই দ্রষ্টব্য ; কিন্তু তাঁর কবিতার মতো কোনো-কোনো গানেও মধ্যমিলের জোয়ার ব'য়ে গেছে।

"বুলবুল" গীতিগ্রন্থের ১-সংখ্যক গানে প্রথম স্তবক বাদে অপর চারটি স্তবকে মধ্যমিল কাজ করেছে। দ্বিতীয় স্তবক : 'আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় ঝুরছে নিশিদিন/আসেনি দখনে হাওয়া গজল গাওয়া মৌমাছি বিভোল।' তৃতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তিতে 'কবে সে ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি' ও পঞ্চম স্তবকের প্রথম পংক্তিতে 'কবি তুই গন্ধে ভুলে ডুবলি জলে' ঐ মধ্যমিল আবার অর্ধ-মিলে পর্যবসিত। চতুর্থ স্তবকের প্রথম পংক্তি 'ফাগুনের মুকুলজাগা দুকূল-ভাঙা'-র অধোরেখ অংশে ধ্বনিগত সৌষম্য একটি দূরান্ত মধ্যমিলের মতো। ২ সংখ্যক গানের ছ'টি স্তবকেই মধ্যমিল কাজ ক'রে গেছে ; কেবল শেষ স্তবকের শেষ পংক্তি 'উষসীর শিশ্-মহলে আসতে যদি চাস্ নিরবধি'তে মধ্যমিলটি ভেঙে গিয়ে অলক্ষ্যে কাজ করেছে 'আসতে'-র 'আস্' ও 'চাস্' উচ্চারণে। ৩-সংখ্যক গানে প্রথম স্তবকে তিনটি মধ্যমিল দ্রষ্টব্য : 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে/পানিয়া ভরণে চল লো গোরী। / চল জলে চল কাঁদে বনতল ডাকে ছলছল জল লহরী।' পরবর্তী পাঁচটি স্তবকে তিনটি ক'রে অন্ত্যমিল ব্যবহৃত। ৪-সংখ্যক গানে মধ্যমিলের একটি স্রোত ব'য়ে গেছে যেন। প্রথম স্তবকে তিনটি ক'রে মধ্যমিল : 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা। / আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা।' তৎপরবর্তী পাঁচটি স্তবকে মধ্যমিল একইভাবে কাজ করেছে, প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে দুটি মধ্যমিল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে তিনটি মধ্যমিল : কেবলমাত্র একটি স্তবকের উদাহরণ রাখা যাক : 'আগে মন করলে চুরি মর্মে শেষে হানলে ছুরি/এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা।' ৬-সংখ্যক গানে মিলের বিচিত্রতা সক্রিয়।

প্রথম স্তবকে তিনটি ক'রে মধ্যমিল: 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে গোপন পায়ে কে ঐ আসে,/আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া উতল হাওয়া কেশের বাসে।' দ্বিতীয় স্তবকে মিল সম্পন্ন হ'লো অন্যভাবে: 'উষার রাগে সাঁঝের ফাগে/যুগল তাহার কপোল রাঙে/কমল দুলে সুরয শশী নিশীথ চুলে আঁধার রাশে।' তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের শেষ পংক্তিদ্বয়ে মিলের রীতি পরিবর্তিত: 'আঁখির পলক-পতন-ছাঁদে / নিশীথ কাঁদে দিবস হাসে।' এবং 'কুসুম-কাঁটায় আঁচল বাধে / রুমাল লুটায় সবুজ ঘাসে।' ষষ্ঠ বা শেষ স্তবকে মিল দুলিয়ে দেয়া হ'লো অন্যভাবে, পংক্তির প্রথমে স্থাপন ক'রে: 'তোমার লীলা-কমল ক'রে / নিখিল-রাণী! দুলাও মোরে। / ঢুলাও আমার সুবাসখানি / তোমার বুকের মদির শ্বাসে।' ৭-সংখ্যক গানেও মিলের বৈচিত্র্য শ্রোতব্য। প্রথম স্তবকে তিনটি ক'রে মধ্যমিল: 'কে বিদেশী বন-উদাসী / বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে। / সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে / কুসুম-বাগের গুল-বদনে।' দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে তিনটি ক'রে অন্ত্যমিল ব্যবহৃত। চতুর্থ স্তবকের তৃতীয় পংক্তিতে আবার একজোড়া মধ্যমিল: 'বাহু সিথানে কেন কে জানে।' পঞ্চম বা শেষ স্তবকের শেষ পংক্তিদ্বয়ে আবার ত্রয়ী মধ্যমিলের খেলা: 'কাঁদে নিরালা বনশীওয়ালা / তোরি উতালা বিরহী মনে।' ১০-সংখ্যক গানে নজরুলের বহু কবিতা ও গানের মতো ত্রয়ী অন্ত্যমিল কাজ করেছে। ১২-সংখ্যক গানে প্রথম স্তবকে মধ্যমিলের দোলা এ রকম: 'চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না এ নয়ন পানে। / জানিতে নাই ক বাকি সই ও আঁখি কী যাদু জানে।' দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকের শুধু প্রথম পংক্তিদ্বয়ে মধ্যমিল দেখা যায়, 'একে ঐ চাউনি বাঁকা সুর্মা আঁকা তায় ডাগর আঁখি।' এবং 'কুনাল কি পড়ল ধরা পীযূষ-ভরা ঐ চাঁদো মুখে।' তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বা শেষ স্তবকে মধ্যমিলের স্বননস্পন্দন একই রকম। ২০-সংখ্যক গানে সুন্দর ত্রয়ী অন্ত্যমিল। ২৮-সংখ্যক গানে প্রথম স্তবক বাদে বাকি তিনটি স্তবকেই ত্রয়ী মধ্যমিল। একটি উদাহরণ রাখা হ'লো: 'তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা সে ভরেছে ডালা নিতি নব ফুলে। / (আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে।' "বুলবুল" গীতি-

গ্রন্থের প্রথম দিকের গীতিগুচ্ছেই মধ্যমিলের ব্যাপ্ত বিচিত্রতা দ্রষ্টব্য, পরে শমিত হ'য়ে এসেছে ক্ষণকালীন ফুলঝুরির মতো, কিন্তু মধ্যমিলের প্রবণতা নজরুল-গীতি ও কবিতার একটি চিরোজ্জ্বল বিশিষ্টতা। আরো কএকটি প্রকীর্ণ নজির :

১. তুমি আসিবে ব'লে সুদূর অতিথি
জাগি চাঁদের তৃষ্ণা লয়ে কৃষ্ণা-তিথি।

[৭ নং গান, গানের মালা]

২. দৃষ্টিতে তার বৃষ্টি হতো তোদের অধিক আলো।

[১১ নং গান, গানের মালা]

৩. খানিক আগে মানিক আমার ছিল রে এই চোখে।

[১১ নং গান, ঐ]

৪. বাদল-মেঘের মাদল-তালে
ময়ূর নাচে দুলে' দুলে'।

[৩৫ নং গান, ঐ]

৫. দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মালা
সকাল সাঁঝে সকল কাজে জপি সে নাম নিরালা।

[৪৪ নং গান, ঐ]

৬. রণ-মাদল মন মাতায় ঘন বাজে গুরু গুরু।

[৪২ নং গান, ঐ]

৭. অঘ্রাণে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী।

[৩৭ নং গান, ঐ]

৮. ভঙ্গিমা তোর গরব-ভরা
রঙ্গিমা তোর হৃদয়-হরা

[৮১ নং গান, ঐ]

৯. করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকী দাও শারাব।

[৬০ নং গান, নজরুল-গীতিকা]

১০. মাদল বাজিয়ে এল বাদ্‌লা মেঘ এলোমেলো
মাত্‌লা হাওয়া এল বনে।

[৪ নং গান, সংযোজন, ন. র. তৃ.]

চ : কবিপ্রসিদ্ধি

নজরুলের কবিতায় গানে কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহার প্রবলপ্রচুর। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কবিতায় ব্যবহৃত অলংকার তিনি আবার নূতন গয়নায় গালিয়ে নিয়েছেন তাঁর কবিতায়। এরকম কতিপয় নমুনার উদ্ধার :

১. ভালোবাসার ছলে আমায় তোমার নামে গান গাওয়ালে।
চাঁদের মতন সুদূর থেকে সাগরে মোর দোল খাওয়ালে।

[১ নং গান, বন-গীতি]

২. ঘুমিয়ে ছিলাম কুমুদ-কুঁড়ি
বিজন ঝিলের নীল জলে,
পূর্ণ শশী তুমি আসি'
আমার সে ঘুম ভাঙালে।

[৩ নং গান, গুল-বাগিচা]

৩ চাহি তার নীল নয়নে
হরিণী লুকায় বনে,
হাতে তার কাঁকন হতে মাধবীলতা কাঁদে
ভ্রমরা কুন্তলে লুকায়।
একেলা বনপথে যায়।

[২ নং গান, গীতি-শতদল]

৪, কত ফুল ফোটে ঝরে উপবনে
তারি মাঝে আছে ফুটি'
তোমার অধরে গোলাপ-পাপড়ি দুটি।

[১৯ নং গান, গানের মালা]

৫, সাগর হ'তে চুরি ডাগর তব আঁখি।
গভীর চাহনিতে করুণা মাখামাখি।।
শফরী সম তাহে ভাসিছে আঁখি-তারা,
তাহারি লোভে যেন উড়িছে ভুরু-পাখী।।

[৭৬ নং গান, সুর-সাকী]

৬, সে ছিল গো মধ্যমণি আমার মনের মণিমালায়,
রেখেছিল লুকিয়ে তায়, মানিক যেমন রাখে ফণী।।

[৩ নং গান, বনগীতি]

ছঃ অনুপ্রাস

নজরুলের গীতিমালায় অনুপ্রাসের ব্যবহার তাঁর অলংকারপ্রীতির একটি সাক্ষ্য :

১. মরণ-বিষাদে অমৃতের স্বাদ আনিলে নিষাদ মম।

[২ নং গান, সুর-সাকী]

২. হলদে পাখী দোদুল দুলে
সোনাল্ শাখায় আদুল গায়ে।

[৬৩ নং গান, সুর-সাকী]

৩. আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান হাজার মোয়াজ্জিন।

[১৪ নং গান, জুলফিকার]

৪. বিকালের বিষাদে ঢাকা ছিল বনভূমি।

[২২ নং গান, বন-গীতি, দ্বি স]

৫. তড়িৎ-লতার ছিঁড়িয়া আধেকখানি
জড়িত তোমার জরির ফিতায় রানি।

৬. দুলিছে মেখলা-হার
শ্যামলী মেঘ-মালার,
উড়িছে অলক কার
অলকার ঝরোকায়।

[৬৭ নং গান, নজরুল-গীতিকা।]

১-চিহ্নিত উদাহরণে ম ষ দ, ২-চিহ্নিত উদাহরণে ল দ খ, ৩-চিহ্নিত উদাহরণে ম ন জ র, ৪-চিহ্নিত উদাহরণে ব, ৫-চিহ্নিত উদাহরণে ত ড় জ র, ৬-চিহ্নিত উদাহরণে ল ম অ ক র প্রভৃতি বর্ণের বারংবার ব্যবহারে শ্রাবণী মাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে।

জ : প্রতিষঙ্গ

নজরুলের কোনো-কোনো গানের চরণে দেখা যায় এক ইন্দ্রিয়জ ধারণা অপর ইন্দ্রিয়জ ধারণায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। একে বলতে পারি, প্রতিষঙ্গ। র‍্যাঁবো, বোদলেআর বা পরবর্তী পরাবাস্তব কবিদের চেতনা-রচনায় প্রতিষঙ্গের অবিরল ব্যবহার দেখা যায়। নজরুল-গীতি থেকে একমুষ্টি নজির :

১. পরাগ-আবীর হানে বনবালা
সুরের পিচকারি হানিছে কুহু,
রঙীন স্বপন ঝরে রাতের ঘুমে
অনুরাগ-রং ঝরে মনে মুহুমুহু।

[৮৪ নং গান, গানের মালা]

২. ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির ম্লান সুরভি
হায় সন্ধ্যায়।
রহি' রহি' কাঁদি' উঠে সকরুণ পূরবী
আমারে কাঁদায়।

[১০নং গান, ন. র. তৃ.]

৩. তা'রা সুরের পাখায় উড়িতে ছিলো গো নভে
তব নয়ন-শায়কে বিঁধিলে তাদের কবে।

৪. মুখর আমার গানের পাখী
নীরব হ'লো হায় বারেক ডাকি'
যেন ফাগুনের জ্যোৎস্না-হসিত রাতে
নামিল বরষা।

এখানকার প্রতি গীতাংশে দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্পর্শ প্রভৃতি স্থান পরিবর্তন ক'রে আমাদের মনে এক নূতন আয়তন রচনা ক'রে বসে।

ঝ : রূপক

বিচ্ছিন্ন রূপকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে নজরুলের কোনো-কোনো গানে, এখানে একটি সম্পূর্ণ রূপক উদ্ধৃত করি :

এ নহে বিলাস বন্ধু	ফুটেছি জলে কমল।
এ যে ব্যথা-রাঙা-হৃদয়	আঁখি-জলে টলমল॥
কোমল মৃণাল দেহ	ভরেছে কণ্টক-ঘায়,
শরণ লয়েছি গো তাই	শীতল দীঘির জল॥
ডুবেছি এ কালো নীরে	কত যে জ্বালা স'য়ে,
শত ব্যথা ক্ষত ল'য়ে	হইয়াছি শতদল॥
আমার বুকের কাঁদন	তুমি বল ফুল-বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস	দখিনা বায়ু চপল॥
ফোটে যে কোন ক্ষত-মুখে	কবি রে তোর গীত-সুর
সে ক্ষত দেখিল না কেউ	দেখিল তোরে কেবল॥

সমগ্র গানটির মর্মে আছে একটি জলপদ্ম, তার অনুষঙ্গে কাঁটা, কালো জল, সুগন্ধ, দখিনা বাতাস ইত্যাদি এসেছে। কিন্তু এখানে জলপদ্ম ও তার সমস্ত অনুষঙ্গ আসলে অন্য এক দিকে ইঙ্গিত করছে। রূপকে সর্বদাই দুটি অংশ : একটি বাচ্যার্থ, অপরটি নিহিতার্থ। বাচ্যার্থের জলপদ্ম অতিক্রম ক'রে আমরা নিহিতার্থের কবি-হৃদয়ের দিকে অগ্রসর হই। শতদল ক্রমে কবি-হৃদয়ে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়, দিঘির শীতল-কৃষ্ণ জল আশ্রয়আধার হ'য়ে ওঠে দহমান ঐ হৃদয়ের, সুগন্ধ হ'য়ে ওঠে ক্রন্দনজলার্দ্রতা। 'ফুটেছি জলে কমল' ব'লে যে-গীতির সূচনা, তা ক্রমে বিলাসের রম্যতা ডিঙিয়ে গভীরের মর্মে পৌঁছিয়ে দ্যায়। নিহিতার্থ এখানে কোনো-কোনো জায়গায় বাচ্যার্থ দখল করেছে, তাকে স্খলন বলা যেতে পারে। কিন্তু কবি তাঁর ব্যথার স্পষ্ট কারণ না-দর্শিয়ে একটি অনির্দেশী বিভূতিতে আমাদের অধিকার ক'রে নেন, যদিচ আমরা ঐ ব্যথার কেন্দ্রে অনুভব করি কোনো গোপন দয়িতার উপস্থিতি ও আঘাত, কিন্তু কবি কোথাও তা স্পষ্ট ক'রে বলেননি বলেই তা আমাদের মর্মে বিঁধে যায়।

ঞ : চিত্র/চিত্রকল্প

নজরুল-গীতি গীতল তো বটেই, তা চিত্রলও। তাঁর রচিত অজস্র চিত্রের মধ্য থেকে একমুঠো জাগর ছিন্ন পদ উদ্ধৃত করি :

১. ঝিমিয়ে আসে জোনোরা-পাখা
যুঁথীর চোখে আবেশ মাখা
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
(ভোর-গগনের দর-দালানে)
দর-দালানে ভোর-গগনে।

[৫৯ নং গান, নজরুল-গীতিকা]

২ টলমল জল-মোতির মালা দুলিছে ঝালর-পলকে।

[৬১ নং গান, ঐ]

৩. বিকালের বিষাদে ঢাকা ছিল বনভূমি।

৪. বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে
ঝরা বন-গোলাপের, বিলাপ শোনে ॥

৫. উদাসীন আকাশ থির হ'য়ে আছে
জল-ভরা মেঘ ল'য়ে বুকের কাছে ॥

একটি সম্পূর্ণ চিত্রল গান ঃ

হিন্দোলি' হিন্দোলি'
ওঠে নীল সিন্ধু
গগনে উঠিল তার
কোন পূর্ণ ইন্দু ॥
শত শুক্তি-আঁখি দিয়া
পিইছে চাঁদ অমিয়া
শিশির রূপে ঝরিয়া
পড়ে জ্যোৎস্না-বিন্দু ॥

[৪০ নং গান, চোখের চাতক]

নজরুল-গীতি চিত্রকল্পের বিশাল ও বর্ণময় ভাণ্ডার। এখানে কেবল একগুচ্ছ উদাহরণ চয়ন করা যাক ঃ

[অ] দৃষ্টিবান চিত্রকল্প ঃ

১. আকাশের আঁখি ভরি' কে জানে কেমন করি'
শিশির পড়ে গো ঝরি' ঝরে বারি শাওনে।

[৪৫ নং গান, নজরুল-গীতিকা]

২. সে কাঁদন শুনি' হের নামিল নভে বাদল
এলো পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী।

[৫০ নং গান, ঐ]

৩. খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে
আঁখি মোর সৌদামিনী।

[৫০ নং গান, ঐ]

৪. বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া কেয়া-বেণীর বন্ধে।

[৬২ নং গান, ঐ]

৫. দুলিছে মেখলা-হার
শ্যামলী মেঘ-মালার,
উড়িছে অলক কা'র
অলকার ঝরোকায়।

[৬৬ নং গান, ঐ]

৬. দিনের চিতার রক্ত-আলোক
শুভদৃষ্টি গো হবে চোখে চোখে
আমার মরণ-উৎসব-ক্ষণে
শঙ্খ বাজুক সঘনে।

[৪২ নং গান, গুল্ বাগিচা]

৭. নয়ন-মনির মুকুরে তোমার
দুলিবে আমার সজল ছবি
সবুজ ঘাসের শিশির ছানি'
মুকুতা-মালিকা দিব গাঁথিয়া।

[১১ নং গান, গীতি-শতদল]

৮. চাঁদের পিয়ালাতে আজি
জোছনা-শিরাজী ঝরে।
ঝিমায় নেশায় নিশীথিনী
সে শারাব পান ক'রে।

[১৪ নং গান, ঐ]

৯. টইটুম্বুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক ঝলে,
চন্দ্র ঘুমায় গগনতলে
সাদা মেঘের আঁচল পেতে।

[১৭ নং গান, ঐ]

১০. দুলে আলো-ছায়া বন-দুকুল
উড়ে প্রজাপতি কল্কা ফুল,
কর্ণে অতসী স্বর্ণ-দুল
আলোক-লতার সাত-নোরী।

[১১ নং গান, বুলবুল]

[আ] শ্রুতিবান চিত্রকল্প ঃ

১১. বাজল কি রে ভোরের সানাই নিদ্-মহলার আঁধার-পুরে
শুনেছি আজান গগন-তলে অতীত রাতের মিনার-চুড়ে ॥

[২২ নং গান, নজরুল-গীতিকা]

১২. আমার বুকের শূন্যে কে গো ব্যথার তারে ছড় চালায়,
গাইছি খুশীর মজ্‌লিশে গান বেদন-গুণীর বীণ রবাব্ ॥
[৬০ নং গান, ঐ]

১৩. মেঘ-নটীর নূপুর
ঐ বাজে ঝুমুর ঝুমুর
শীর্ণা তনু ঝর্ণা তরঙ্গ উতরোলা।
[২৭ নং গান, গুল-বাগিচা]

১৪ ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে দিগন্ত শিহরিয়া চাহে
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী খোঁজে সেতারা চন্দে।
[৬২ নং গান, নজরুল-গীতিকা]

১৫. বাদল-পরীরা নাচে গগন আঙিনায়
ঝমাঝম বৃষ্টি-নূপুর পায়
শোনো ঝমাঝম বৃষ্টি-নূপুর পায়।
[৪ নং গান, বন-গীতি]

ইসলাম-জাগর গানগুচ্ছের সার্থকতার একটি কারণ এই চিত্রকল্পের যথাপ্রযুক্তি ঃ

১৬. দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল ॥
[১ নং গান, জুল্‌ফিকার]

১৭. হে মদিনার বুলবুলি গো
গাইলে তুমি কোন গজল।
মরুর বুকে উঠল ফুটে'
প্রেমের রঙীন গোলাপ-দল।
[পৃঃ ২৭৩, ন. র. তু.]

১৮. আমার হৃদয়-মদিনাতে
শুনি ও নাম দিনে রাতে
ও নাম-তসবী হাতে
মন-মরুতে ফুলে লালা।
[পৃঃ ২৭৫, ন, র, তু,]

একটি সম্পূর্ণ চিত্রকল্পময় গান ঃ

একাদশীর চাঁদ রে ঐ রাঙা মেঘের পাশে
যেন কাহার ভাঙা কলস আকাশ-গাঙে ভাসে ॥
সেই কলসী হ'তে ধরার 'পরে
অঝোর ধারায় মধু ঝরে রে
দলে দলে তাই কি তারা-
মৌমাছিরা আসে ॥

সেই মধু পিয়ে ঘুমের নেশায়

ঝিমায় নিশীথ-রাতি,

বন-বধূ সেই মধু ভরে

ফুলের পাত্র পাতি'।

সেই মধুর এক বিন্দু পিয়ে

সিন্ধু উঠে ঝিলমিলিয়ে রে

সেই চাঁদেরই আধখানা কি

তোমার মুখে হাসে ॥

২

অলংকাররণন নজরুল-গীতির প্রধান বিশিষ্টতা। পূর্ব পরিচ্ছেদে তার বিশদ বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। গান মাত্রেই তো গীতল—কবির বিশিষ্ট প্রতিভার ছাঁচে গান চিত্রলও হ'য়ে উঠেছে;—অর্থাৎ একাধারে গীতল ও চিত্রল। এইভাবে গান পাঠ্য কবিতার মর্যাদাও অর্জন করেছে তাঁর। সুর ও ছবি : শিল্পের এই যুগল মিনারের প্রতি যেন একই সঙ্গে যাত্রা নজরুলের। বস্তুত, কল্পনার উচ্ছলতা নজরুল-সংগীতের যে-দীপ্তিমান ভিত্তি রচনা করেছে—তার উচ্ছ্রিতি শ্রাবণকল্পনা ও দার্শনকল্পনার যুগল ধারায়। আসলে বাকপ্রতিমাই নজরুল-গীতির সর্বপ্রধান অলংকার। নরত্বারোপ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অনুপ্রাস ইত্যাদি পাশ থেকে সাহায্য করেছে যেন। এজন্যেই কোনো কোনো গীতাংশ একাধিক অলংকার হিশেবে পূর্বে উদাহৃত হয়েছে। অনেকগুলি অলংকারই শেষ পর্যন্ত চিত্রকল্পের (বা বৃহৎ অর্থে উপমার) অধীন। প্রায় যে-কোনো শ্রেণীর কবিতার মধ্যে নজরুল যেমন পুরে দিয়েছেন কবিতার জীয়ন্ত প্রাণ-ভোমোরাটি, তেমি তাঁর সর্বশ্রেণীর গানের মধ্যেই তিনি প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন চিত্রকল্প তথা অলংকারের লীলা : ১. 'রাত্রি-দিবার রংমহল চিত্রিত এ চন্দ্রাতপ,/দুদিনের এ পান্থবাস এই ভুবন—এ সুখ-আবেশ।' (ওমর খৈয়াম-গীতি), . 'পুরানো গুলবাগ এ ধরা মানুষ তাহে তাজা ফুল,/ ছিঁড়ে নিঠুর ফুলমালী আয়ুর শাখা হ'তে তায়।' (দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতি), ৩. 'আমরা ধরি মৃত্যু-রাজার যজ্ঞ ঘোড়ার রাশ' (জাতীয় সঙ্গীত), ৪. 'মেঘে মেঘে এলোচুলে আকাশ গিয়েছে ভ'রে (ঠুংরী), ৫. 'সে কাঁদন শুনি হের নামিল নভে বাদল / এলো পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী' (গজল), ৬. 'আমার বঁধুর রূপের ছায়া বুকে ধরি' আকাশ-আরশি নীল গো, / বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে ভাবিয়া কালো

সাগর সলিল গো' (কীর্তন', ৭. 'কাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা, / মুরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা' (ধ্রুপদ, ইত্যাদি। সমস্ত গানগুলি নজরুল-গীতিকা থেকে উদ্ধৃত। দর্শনীয়ঃ যে-কোনো ধরনের গানে নজরুলের সার্থকতার প্রধান নির্ভর বাকপ্রতিমার সুপ্রয়োগ।

কলাকৌশল বিষয়ে আরো কএকটি কথা বলা যেতে পারে। চোখ নজরুলের গানে কতো রকমভাবে ব্যবহৃত: নূতন চোখ কখনো প্রদীপ হ'য়ে ওঠে, চোখ থেকে শেফালিফুল ঝ'রে যায় কখনো, চোখ কখনো দোকান হ'য়ে ওঠে যে-দোকানে মালা বিক্রি হয়। আকাশ হ'য়ে ওঠে কখনো নদী, কখনো সাগর, কখনো-বা দর্পণ। চাঁদ হ'য়ে ওঠে দয়িতা, দয়িতা হ'য়ে যায় চাঁদ।

ক্রিয়াপদের সার্থক ব্যবহারে অনেকসময় চিত্রকল্পের সার্থকতা ফ'লে ওঠে। যেমনঃ ১. 'তোমারি অশ্রু ঝলে শিউলিতলে সিক্ত শরতে'—এখানে 'ঝলে' ক্রিয়াপদটির মধ্য দিয়ে শরৎ-ভোরের আর্দ্র উজ্জ্বলতা ছবি হ'য়ে ফুটে উঠেছে। অথবা ২. 'এদেশে ঝরে শুধু ভুল নিরাশার কানন ভরিয়া।' নিরাশার কাননে ফুল নয়, ভুল ঝরে; 'ঝরে' ক্রিয়াপদের অপ্রত্যাশিত অপিচ অদ্ভুত প্রয়োগে ভুল-নামক বিমূর্ত ব্যাপারটি মূর্তি ধ'রে দেখা দিলো। কিংবা ৩. 'মেঘে মেঘে খোঁজে তোমায় আঁখি মোর সৌদামিনী'—এখানে 'খোঁজা' ক্রিয়াপদের ব্যবহারে যেন একটিমাত্র শব্দে সমস্ত সন্ধান ও হাহাকার প্রদীপিত হ'য়ে উঠলো, চোখের বিদ্যুৎ ঘনান্ধকার মেঘের মধ্যে সচল ও ও গতিময় হ'য়ে উঠলো, জ্ব'লে উঠলো না-পাওয়ার বেদনা কিন্তু সন্ধানের আবেগ, এইভাবে আশ্চর্য গতিময় হ'য়ে উঠে চিত্রকল্পটি চরিতার্থ হ'লো।

শব্দ ব্যবহারেও তাঁর সচৈতন্য স্মরণীয়। ১. 'তালীবন থৈ তাথৈ করতালি হানে ঐ, / "কবি তোর তমালী কই" শ্বসিছে পূবালী বায়।' —এই স্তবকে 'তমালী' নামক অভিনব শব্দটির প্রয়োগে শ্যামলী দয়িতা, তালীবনের সমান্তরে তমালী শব্দের ব্যবহার, শ্বসিছে-ক্রিয়াপদের লক্ষ্যভেদী প্রয়োগ, পূবালি বাতাসের মর্মভেদী জিজ্ঞাসা সমস্তের মধ্য দিয়ে বৃষ্টিবহুল একটি দিনের ছবি জাগ্রত। ২. 'আসে বসন্ত ফুলবনে / সাজে বনভূমি সুন্দরী। / চরণে পায়েলা রুমুঝুমু / মধুপ উঠিছে গুঞ্জরী।' —এখানে 'ন', 'ম', 'প', 'ল', প্রভৃতি ললিত বর্ণের প্রয়োগে, ছয়

মাত্রার মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে-বসন্তের আসন্নতায় বনভূমির সুন্দরী সজ্জা— কবিকল্পনার মিশোলে আশ্চর্য রূপ ধারণ করেছে। ঠিক এর বিপ্রতীপ ছবি ধরেছে পরের গীতিকবিতাটি : ৩. 'ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে / দিগন্ত শিহরিয়া চাহে / বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী / খোঁজে সেতারা চন্দে।'—এখানে 'ঙ্গ', 'ন্ত', 'ণ্ণ', 'ন্দ' প্রভৃতি যুক্তবর্ণের প্রয়োগে, যে-যুক্তবর্ণগুলি আবার প্রতি পংক্তির প্রথম শব্দেই ব্যবহার করা হয়েছে, সমস্তে একটি রুদ্র ছবি প্রকাশিত। প্রাগুক্ত চিত্রটি যদি বলা হয় জলরঙে আঁকা, এটি তাহ'লে তৈলচিত্র। প্রসঙ্গত, গানে নজরুল অন্তর্মুখী, ভিতরের দিকে টান তাঁর, সব সময় তাই বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে যাবার দিকে ঝোঁক তাঁর। ১. 'হিয়ায় কি কাঁদে কুহু কেকা আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে'—বাহিরের কুহু বাহিরের কেকা এইভাবে হৃদয়ে অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছে। যেমন আরো : ২. 'আমার মনের মসজিদে দেয় আজান হাজার মোয়াজ্জিন', ৩. 'কাঁদে নিরালা বনশীওয়ালা / তোরি উতলা বিরহী মনে', ৪ 'তোমার ঐ সোনার হাতের সোনার চুড়ির তালে তালে / নাচে মোর গানের শিখী মনের গহন মেঘলা রাতে।' বহিঃস্থ মোয়াজ্জিন ও আজান, বাঁশিঅলা ও বাঁশির ক্রন্দন-ক্বণন, ময়ূর ও তার নৃত্য সমস্ত এখানে মানসলোকে সম্পন্ন হয়।

লীরিক বা গীতিকবিতায় একক বিষয় বা বিষয়াভিমুখিতা আবশ্যিক। নজরুল-গীতি এই দাবি পূর্ণ করে। তা সংহত, একক বিষয়সম্পন্ন ও কেন্দ্রানুগ। নজরুলের পক্ষে এই বাচংযম বিস্ময়কর—বিস্ময়কর ও শেখরস্পর্শী। বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত সম্পূর্ণ গানগুলি ('শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণি-বায়', 'এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল', 'হিন্দোলি হিন্দোলি ওঠে নীল সিন্ধু', ও 'একাদশীর চাঁদ রে ঐ রাঙা মেঘের পাশে') তার সাক্ষ্য দেবে।

নজরুল-গীতিমালায় কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহার বিশদ ও অবিরল। তাঁর স্বভাবী প্রিয় অলংকার নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি বারংবার কবিপ্রসিদ্ধির ভাঁড়ার থেকে চয়ন করেছেন, ঐ ভাঁড়ারে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতার ঐতিহ্য সঞ্চিত, ঐতিহ্য নজরুল-গীতাশ্রয়ে সংস্থিত হ'য়ে চিরকালের বাংলাদেশের জন্যে অমেয় গোলাঘর হ'য়ে রইলো। ঐতিহ্য সংস্থিত হয়েছে কিন্তু নূতনভাবে—নজরুলি ধরনে। কবিপ্রসিদ্ধির কএকটি দৃষ্টান্ত পূর্বে সংকলিত হয়েছে—তবে নজরুলের গানে কবিপ্রসিদ্ধি ও লোকপ্রসিদ্ধি ছত্রে-

ছত্রে পরিকীর্ণ : ফুল, পাখি, চাঁদ, হরিণ, সাগর—এইসব তাঁর অবিরল উপকরণ। চাঁদ ও চকোরের সাম্বন্ধিক উপমা-উপচার অজস্রবার উঠে আসে : ১. 'চকোরী দেখলে চাঁদে / দূর হ'তে সই আজো কাঁদে।' ২. 'কে শুধায় আঁধার চরে / চখা কেন কেঁদে মরে, / এমনি চাতক তরে / মেঘ ঝুরে গগনে।' ৩. 'কেন মেঘ বারি চাহে / জানে চাতক জানে/মেঘ জানে চকোর দূর গগনের / চাঁদ কেন তারে টানে।' ৪. 'কাঁদে চখা-চখি কাঁদে বনে কেকা / দীপ নিভায়ে কাঁদি আমি একা।' ৫. 'অস্ত-আকাশ অলিন্দে ঐ পাণ্ডুর কপোল রাখি' / কাঁদে মলিন ভোরের শশী, বিদায় দাও বন্ধু চকোর।' এখানেই রাখা যেতে পারে আরো কএকটি ভিন্ন-প্রাসঙ্গিক কবিপ্রসিদ্ধির উচ্চারণ : ১ 'দুইটি হিয়াই কেমন কেমন / বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন।' ২. 'পুড়ে মরার ভয় না রাখে পতঙ্গ আগুনে ধায় ; / সিন্ধুতে মেটে না তৃষ্ণা চাতক বারি-বিন্দু চায় ; / চকোর চাহে চাঁদের সুধা, চাঁদ সে আসমানে কোথায় ; / সুরুয থাকে কোন্ সুদূরে, সূর্যমুখী তা'রেই চায় ;/ তেমনি আমি চাহি খোদায়, চাহি না হিসাব ক'রে।' ৩ 'চমকে ওঠে মোর গগন ঐ হরিণ-চোখের চাওয়ায়।' ৪. 'তরু কি লতার কাছে/এসে কভু প্রেম যাচে/তরু বিনা নাহি বাঁচে/অসহায় লতা।' ৫. 'কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা তুমি সুন্দর চাঁদ/জাগালে জোয়ার ভাঙিলে আমার সাগর-কূলের বাঁধ'। নজরুলের কবিতা ও গান একাধারে এই প্রাচীন কবিপ্রসিদ্ধির নবীনতায় লগ্ন হ'য়ে একটি ভাস্বর মর্যাদা অর্জেছে।

বাংলাদেশে নজরুল ইসলামকে বলা হ'য়ে থাকে 'যৌবনের কবি' ; এ অভিধা তাঁর সমাজ-রাজনীতি-চেতন উদ্বেল উল্লাসের জন্যে। কথাটিতে অর্ধসত্য মাত্র উচ্চারিত। নজরুল নিশ্চিতভাবে যৌবনের কবি, কিন্তু সে কেবল তাঁর 'লাথি মার ভাঙরে তালা' প্রভৃতি কবিতা বা গীতোচ্ছ্বাসের জন্যে নয়, তাঁর গানের জন্যেও, যে গানের প্রসন্ন বিষাদে তার আবেদন বিধুর-মধুর, যে-গান তার উল্লোল হুল্লোড় নয়—বিজন স্বগতোক্তি, সেখানেও যৌবনের অপর লীলা আমরা দেখতে পাই। সংরাগ, রক্তিম বাসনা, শরীর ও আত্মার যৌবন-ঘন আয়তন সেখানে ছত্রে-ছত্রে বিকীর্ণ ; এক আশ্চর্য কেলাসনে যৌবন সেখানে মিশে গেছে নিসর্গে, শরীরে বা চীৎকারে নিঃশেষিত নয় বরঞ্চ সমস্ত পরিপার্শ্বের মিশোলে অনিঃশেষ। কবি নজরুলকে বুঝতে হ'লে তিনি-যে 'বিদ্রোহী কবি' এই একান্ত-আংশিক সংবাদটি অতিক্রম ক'রে যেতে হবে।

বাংলা গানের যুগ্ম আকাশপরশী মিনার রবীন্দ্র-সংগীত ও নজরুল-গীতি। উভয়ের সুরের পৃথকতা ছাড়াও কএকটি ব্যবধি সাধারণ পাঠক-শ্রোতার হৃদয়ে এসে লাগে। রবীন্দ্র-সংগীত আমাদের উর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়, এমন-সব অতিসূক্ষ্ম অনুভতির স্বরগ্রামের ভিতরে হাত ধ'রে নিয়ে যায় যা নামহীন ও শুধুমাত্র অনুভূতিগম্য; নজরুল-গীতি আমাদের এই চিরপরিচিত ফুলে-ফুলে ভরা মাটির ফুলদানি যে-অদিতি, তাকে ভালো-বাসতে শেখায়। রবীন্দ্র-সংগীতে নাথ, নারী ও নিসর্গ তাই একাকার হ'য়ে গেছে, গান শুনে অনেক সময় আমরা বুঝে উঠতে পারি না তা দয়িতার উদ্দেশে রচিত না ঈশ্বরের তিয়াষায়, "গীতবিতানে"র অতিনির্দিষ্ট প্রেম, পূজা প্রভৃতি বিভাজনগুলি তাই অবান্তর মনে হয়; পক্ষান্তরে নজরুল-গীতির দয়িতা, ঈশ্বর, নিসর্গ সবসময় আলাদা ও স্বচ্ছস্পষ্ট। রবীন্দ্র-সংগীতের পটশোভাভূমি বিশ্বচরাচর; নজরুল-গীতির পটভূমি এই আমাদের বাংলাদেশ—আবহমান বাংলাদেশ। রবীন্দ্র সংগীতের বাণী মুখ্যত নিরলংকার অপিচ দূরগামী, প্রাত্যহআচরিত শাদামাঠা শব্দাবলিই হ'য়ে ওঠে অপরতর তাৎপর্যে গরীয়ান ও গর্ভবতী; নজরুল গীতির বাণী অলংকারমুখর ও তুলনামূলকভাবে অনেক—অধিক 'কাব্যিক'। সত্যঃ রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতা-গানের পংক্তি নজরুল-গীতির ভিতরে চ'লে এসেছে; কিন্তু তা সর্বসময়েই নজরুল-রীতির ভিতরে সমন্বিত।

বাংলায় ইসলামচেতন গানের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ একা নজরুলের হাতে তৈরি। মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গান আবশ্যিক অংশ জুড়ে নেই। তবু বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিশেবে যে-প্রচলনির্ভর সংগীতের সামান্য পরিচর্যা ছিলো, তা সব অর্থেই গ্রামীণ। নজরুলের হাতে ইসলাম-জাগর ঐ গানের মার্জিত উদ্ধার হ'লো এবং তা এক উদ্ভিন্নমান নবীন সংস্কৃতির প্রাথমিক ও ধ্রুপদী ভিত্তিভূমি রচনা ক'রে দিলো। নজরুলের ইসলামি গান ও শ্যামাসংগীত একাধারে ব্যক্তিক ও সার্বজনীন; কেননা উভয়ের পিছনে আছে কবির সেই সন্ধান-টান যার কেন্দ্রে ঈশ্বর আসীন, কবি যাঁকে প্রায় ভিন্নধর্মী শারাবের মতো পান করতে চাচ্ছিলেন; আবার ঐ মরমী মন্থে ধার্মিক ব্যক্তিমাত্রেই প্রীয়মাণ। পুনরপি, শিল্প-সাহিত্যের প্রশ্নে যেটি সবচেয়ে বড়ো, ঐ ইসলামি গান ও শ্যামাসংগীত শিল্পমনীষাকে পরিপূর্ণ তৃপ্ত করে। তাইতো শ্যামাসংগীতের ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ সেন যেখানে

নিজেকে সরল সমর্পণে সঁপে দেন, নজরুলের বিহার সেখানে শিল্পসম্মত হ'য়ে ওঠে অধিকতর। একটি যুগ্মোল্লেখ প্রয়োজনীয়ঃ

১. মা বসন পর।

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো॥

পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলী গো॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে মাগো, কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো॥...
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হ'য়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে—
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥

[রামপ্রসাদ সেন]

২. আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন॥

আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন॥

পাগ্‌লী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়
লীলার রে তার নাই গো শেষ॥
সিন্ধুতে ঐ বিন্দু খানিক
তার ঠিকরে পড়ে রূপের মানিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না
মা আমার তাই দিগ্‌-বসন॥

[নজরুল ইসলাম]

রামপ্রসাদ যেখানে সরল বর্ণনায় ভুলিয়ে দ্যান, নজরুল সেখানে লাগিয়েছেন কুশলতার যাদু তথা শিল্পের হিরণ পরশ। তাই গান দুটি প্রসঙ্গে অনন্য হ'য়েও

মর্মে হ'য়ে উঠেছে আলাদা। আরো ঃ নজরুল-গীতিতে বৈষ্ণব-পদাবলীর ধারা বিসর্পিত। স্মরণীয় ঃ নজরুলের অনেক গান যে নূতন বৈষ্ণব-পদ শুধু তা নয়, তাঁর অতিব্যক্তিক গানগুচ্ছও অনেক সময় বৈষ্ণব কবিতার আবহ-মণ্ডলে রচিত। বস্তুত নজরুল-গীতি মোহানায় দুদিক থেকে এসে মিশেছে হাফিজ-ওমর-গীতি (যা তিনি নিজে অনুবাদ করেছিলেন) এবং বৈষ্ণব পদাবলি (এককালে জ'ম্মেও যা তাঁর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো ব'লে নিজে কিছু রচনা করেছিলেন)।

বৈষ্ণব-পদাবলির ছায়াসম্পাতিত দু'টি উদ্ধার ঃ ১. 'যার গানে এত প্রাণ মাতায় না জানি কি হয় দেখলে তায়, / তার সুর শুনে কেউ প্রাণ পায় / কেউ ফেলে লো প্রাণ হারিয়ে।' ২. 'এত রূপ চোখে ধরে না / তারে দেখি কি ক'রে, / বিধি দিল দুটি আঁখি আমারে / তাহে হায় পলকে পড়ে।' হাফিজ-উমরের আলোকিত একটি গীতাংশ ঃ 'দেখ রে কবি প্রিয়ার ছবি এই শারাবের আর্শিতে / লাল গেলাসের কাঁচ মহলার পার হ'তে তার শোন্ জওয়াব।' অপরূপ এক আলকেমিতে ঐ যুগলের মিশোল নজরুল-গীতি, যা আবার হ'য়ে উঠেছে নবীন ও স্বাধীন।

এ-প্রসঙ্গে এই সত্যও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, নজরুল তাঁর গীতি-প্রতিভার অপচয়ও করেছেন ; যেন রাস্তায় যেতে-যেতে নজরুল অযুত আশরফি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন চারপাশে, কোথায় গিয়ে পড়লো সন্ধান রাখেননি তার। বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি গান লেখবার প্রয়োজন অনুভব করছেন, এর ফলে নজরুল গীতিভিত্তি ঋদ্ধ হ'য়ে উঠেছে ঠিকই ঃ হাসির গান, ইসলামি গান, জাতীয় সংগীত, শ্যামাসংগীত ইত্যাদিতে নজরুলি বিশিষ্টতার বিভা বিচ্ছুরিত হয় ঃ এসবের জন্যে কৃতজ্ঞ আমরা বাঙালি। কিন্তু এ সবের বাইরে যে-ব্যক্তিক কল্পজগৎ তিনি নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে তিনি অধীশ্বর—উত্তরকালের সঞ্চয় সেখানেই প্রধানত পুঞ্জিত হ'য়ে আছে, তাঁর কবিস্বভাবের বরিষ্ঠ পরিচয়পত্র সেখানেই টাঙানো, যে তন্ময়তায় ঐ সঞ্চয় বিপুলতর করা যেতো এলোমেলো নজরুলের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যা হয়নি, তা নিয়ে আক্ষেপ বৃথা। যা হয়েছে তা থেকেই আমরা ছেঁকে নিতে পারি একজন সত্যিকার কবিপ্রতিভাকে এবং তাই বিনতি মানি যেখানে ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হ'য়ে কবির গানের বুলবুলি ।।

ছোটোগল্পে ধনুর্বাণ, ধনুর্ভঙ্গ

শিল্পসাহিত্যে কাল একটি জরুরি অপিচ জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের পরিসরেই প্রাচীন ও আধুনিক, আধুনিক ও সাম্প্রতিক, ক্লাসিক ও রোম্যাণ্টিক, শতক ও দশক—এইসব সময়-চিহ্নিত শিল্পসাহিত্যের কথা ওঠে। এই বিভাজন একান্ত সরল হ'তো, যদি আমরা কেবলমাত্র কাল বা সময় অনুযায়ী কোনো রচনা বা লেখককে বিভক্ত করতে পারতাম; কিন্তু তা তো হয় নাঃ একালের লেখা বহু রচনা গ'ড়ে ওঠে প্রাচীন রীতি ও সত্যের অবলম্বনে। সাহিত্যের প্রচলমান অনেক ইতিহাস, তাই, অনেক-সময় হ'য়ে ওঠে ঘটনাপঞ্জি,—ঐ পৃথকতা ইতিহাসকার অঙ্কিত করতে পারেন না ব'লেই; তবে এই ত্রুটি থেকে তাঁরা আবার অনেকসময় নিজের অজ্ঞাতসারে মুক্তি পেয়ে যান যখন কোনো-এক কালের প্রধান শিল্পীদের উপর তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন—কারণ, প্রধান শিল্পীবৃন্দ ঐ সময়ের বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট বাণীর বাহক।

এখন, সাহিত্যের এই কালজিজ্ঞাসার একটি মীমাংসার প্রতি যাওয়া যাক।—মনে হয়ঃ যে-কোনো কালেই শিল্পসাহিত্য মোটামুটি যুগল প্রবাহে চলতে থাকেঃ একটি প্রাক্তন ধারা, আরএকটি নূতন ধারা। এই ধারা-প্রবাহযুগে বহু লেখা ব্যর্থ হয়, কএকটি লেখা সার্থকতায় দাঁড়িয়ে যায়। এখন প্রশ্নঃ যে-কোনো ধারার ব্যর্থ লেখা বা যে-কোনো ধারার সার্থক লেখা, ঐ-ঐ ধারাপ্রবাহের মধ্যেই, সমমূল্যের কি? আমার উত্তরঃ না। প্রাক্তন ধারার ব্যর্থ লেখার মূল্য ন্যূনতম, কারণ, একটি স্থিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারাতেও লেখাটি সফলতা আয় ক'রে নিতে পারলো না। সেই তুলনায় নূতন ধারার একটি ব্যর্থ লেখার মূল্য অধিক, কারণঃ নূতন ও অনিশ্চিত পথে চলতে গিয়ে তার পতন হ'লো, ব্যর্থ সে, কিন্তু প্রচলের দুয়ারে সে ধরনা

দ্যায়নি, নূতনের জন্মে দরোজা খুলে দিতে চেয়েছিলো সে, তার আকাঙ্ক্ষা ছিলো, আকাঙ্ক্ষায় স্বাতন্ত্র্য ছিলো। আবার : প্রাক্তন ধারার একটি সার্থক রচনা মূল্যবান, কারণ : যে-কোনো সার্থক রচনাই মূল্যবান। কিন্তু নূতন ধারায় সার্থক রচনার মূল্য আরো-বেশি, কারণ : সে শুধু সফলকাম নয়, পুরোনো প্রবাহী সার্থক রচনা ঐ বিশেষ সময়ের বাণী ধারণে অক্ষম-যা তার অধিগত, এবং এক অস্পর্শিত ক্ষেত্রে সে প্রথম প্রবেশ করলো ব'লে।

ছোটোগল্প, এবং আমাদের ছোটোগল্পের প্রসঙ্গপরিসরেও, এই মীমাংসা আমার কাছে প্রযোজ্য ব'লে মনে হয়। প্রাক্তন ধারার ব্যর্থ গল্প নির্মূল্য, সার্থক গল্প মূল্যবান। নূতন ধারার ব্যর্থ গল্প একেবারে নির্মূল্য নয়, সার্থক গল্প আমাদের সময়ের জন্মে সর্বাধিক মূল্যবান। আবার : এই সবের ভিতরে চিরসময়ের জন্মে আধুনিক যে-গল্প সেই গল্পের সচলতাই তার প্রাণস্বরূপ এবং তার মহত্তম মূল্যের নির্ধারক ; কিন্তু আমাদের পক্ষে ঐ চিরসময়োপযোগী মহত্তম গল্প নির্ধারণ করা অসম্ভব, কোনো-এক নির্দিষ্ট সময়ের মানুষের পক্ষে শতশতাব্দীবাহিত গল্পের মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব ব'লেই।

যাঁরা প্রাক্তনপন্থী, নূতন ধারার বিরুদ্ধে তাঁদের ক্রোধ, অনীহা ও অভিযোগ স্বাভাবিক। তার কারণ : তাঁরা ঠিক নূতন ধারাকে বুঝে উঠতে পারেন না, এবং মানুষের অহমের পক্ষে নিজের বোধের বহির্ভুক্ত বিষয়কে সহ্য করা মুশকিল। বোধের বাইরে ব'লে নূতন বিষয়কে তাঁরা কৃত্রিম, পরান্নপালিত, পরগাছা, জীবন-অসংলগ্ন ইত্যাদি মনে করেন ; অনেক সময় মনে-মনে নূতনের সাফল্য উপলব্ধি করলেও দ্বিগুণ বিক্রমে তার ব্যর্থতার সম্প্রচারে নেমে পড়েন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একদিন নূতন কবিতার বিরুদ্ধে জ্ব'লে উঠেছিলেন—ক্রমশ অবশ্য তিনি নূতনের সংক্রাম ও চরিতার্থতায় উভমুখ স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। এবং একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যিনি অক্ষয় বড়ালের সমসাময়িক হ'য়েও সমর সেন পর্যন্ত বিহার করেন—তিনি যখন কোনো-এক পরাক্রান্ত নবীনের অভিঘাত অস্বীকার করতে চেয়েছেন, তখন অপরদের কথা তো বলা বাহুল্য ;—যদিচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রভাবপ্রতিক্রিয়া বস্তুত উত্তরবর্তীকালের শিল্পশিক্ষার একটি নিশ্চিত স্থল। সে যাই হোক,—আবার প্রাক্তনপন্থী

সমালোচক ও প্রাক্তনপন্থী লেখকের ভিতর দিয়ে একটি অতিসূক্ষ্ম ভেদ-রেখা চ'লে গেছে: এঁরা কেউই সম্পূর্ণ নূতনকে উপলব্ধি বা উপার্জন ক'রে নিতে পারেন না, কিন্তু সমালোচকের পক্ষে যা বোধাতীত মাত্র লেখকের পক্ষে তা পায়ের তলার মাটি স'রে যাবার মতো। তাঁর মনে হয়: 'এ কোন নূতন শিল্প, শিল্পী হ'য়েও যা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না।'

আমাদের ছোটোগল্পের নবীন প্রবাহ প্রাক্তন ধারাকে স্বাঙ্গীকৃত ক'রেই নবীন, যেমন মিশে যায় এক নদীর ভিতর অপর নদী অথচ উভয়ে আলাদা নামাঙ্কিত হ'য়ে থাকে। নূতন এই ছোটোগল্প সম্বন্ধেও বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন মনীষা থেকে বিভিন্ন চাহনি থেকে। এই রচনায় আমরা তার মুখোমুখি হয়েছি এবং এই সঙ্গে অতিপ্রাথমিকভাবে তার চারিত্র্যলক্ষণও চিহ্নিত করবার চেষ্টায় নিরত।

গল্প কবিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, হ'য়ে উঠেছে শব্দের বা প্রকরণের ক্রীড়াভূমি—এ-সব অভিযোগ আমাদের দেশেই উত্থিত হওয়া সম্ভব। আধুনিক শিল্পসাহিত্য প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে ও হয়েছে—কিন্তু তার চরিত্রহানি হয়নি। সাহিত্যের সব শাখা কবিতা-দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে—এ-কথার চেয়ে নিম্নোক্তিতে সত্য অধিক: সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখা একে অপরের কাছ থেকে পরিগ্রহণ ক'রে চলেছে। কবিতা গল্পের কাছে যাচ্ছে, গল্প কবিতার, উপন্যাস নাটকের কাছে, নাটক প্রবন্ধের, প্রবন্ধ গল্পের। এই তুমুল অবিচ্ছিন্ন পারস্পরিক মিশোলে সাহিত্যশিল্পের শাখাবলি নবীন ও ঋদ্ধ হ'য়ে উঠছে ফের। এই মিশোলের সূচনা এমনকি বাংলাদেশেও বহু পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা মাইকেল মধুসূদন দত্তের সৌজন্যে। তবে আমাদের সময়েই তা তুঙ্গে উঠেছে, এবং তা একে অপরের সর্বনাশ সাধন করছে—এ-রকম মনে করছেন সমারূঢ় রক্ষণশীলেরা। যে-খণ্ডিত দৃষ্টির ফলে তার সময়টিকেই মানুষ ভেবে আসছে কলিকাল এবং সর্বাধিক দুঃসহ, এ-ও সেই দৃষ্টির অপদান। কোনো ব্যর্থ রচনার কথা ব'লে লাভ নেই, কিন্তু অব্যর্থ রচনামাত্রেই তার নিজের আয়তনে সার্থক; কবিতা বা প্রবন্ধের সংক্রাম কোনো গল্পে আছে এবং গল্প হিশেবে তা অব্যর্থ হ'লে তাকে স্বীকার করবো না কেন। অপিচ, সাহিত্যের কোনো সংজ্ঞা নেই, ছোটোগল্পেরও নেই,

এবং তত্রাচ অধ্যাপক বা শিক্ষার্থীমণ্ডলী যে-সংজ্ঞায় একটি ছোটোগল্পকে চিহ্নিত করেন ছোটোগল্প তাকে অনায়াসে অতিক্রম ক'রে যায়। উপরন্তু কাজ-চালানোর জন্যে তৈরি ঐ সংজ্ঞাও চিরস্থিত, চিরবদ্ধ বা চিরঅপরিবর্তিত নয়। ছোটোগল্পও, শিল্পসাহিত্যের যে-কোনো মাধ্যমের মতোই, জীবিত জিনিশ; পুরাতন পোশাক পরিহার করলেই সে ধূল্যবলুণ্ঠিত হবে কেন; সংজ্ঞার অনুসরণে ছোটোগল্প তথা সাহিত্য রচিত হবে কেন, ছোটোগল্পের অনুসারেই সংজ্ঞা—প্রয়োজন পড়লে—পরিবর্তিত হবে। অনেকে আবার নূতন ছোটোগল্পের প্রকরণের প্রতি ক্রুদ্ধ, ছোটোগল্প লিখতে হ'লে শিল্পত্ব বিসর্জন দিতে হবে—এ-রকম আবদার চলে না, সনেটের মতো ছোটোগল্পের আঙ্গিকও তার রচয়িতার পূর্ণ অভিনিবেশ দাবি করে, এবং শিল্পসাহিত্যে আধার আধেয়ের মতোই মূল্যবান।

আজ যখন ফের ধুয়ো ওঠে সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকার, তখন বিস্মিত হই। জনগণকে শান্তিকল্যাণ দান ও উপদেশবর্ষণ নিশ্চয় ছোটোগল্পের কৃত্য নয়। 'রাম বড়ো সুবোধ বালক' একথা শৈশবে সব ছেলেই পাঠ করে, কিন্তু সকলে সুবোধ বালক হয় না ব'লেই সাহিত্য লেখা যায়। দেশোন্নোয়ন, সমাজহিত, জনগণের মঙ্গলসাধন, রাষ্ট্রের কল্যাণ রচনা যাঁদের প্রধান লক্ষ্য, তাঁদের পথ সাহিত্য নয়। লেখক ও সমাজকর্মীর ভূমিকা স্বতন্ত্র।

গল্পে হতাশা-যন্ত্রণার কথা দেখে অনেকে আতঙ্কিত। তাঁরা মনে করেন, আশাবাদ আবশ্যিক। আমার তো মনে হয়, আশা বা নিরাশা —এসব মানুষের ব্যক্তিগত,—যেমন ছোটোগল্পেরও। কেউ স্বভাবত আশাবাদী, কেউ স্বভাবত নিরাশাবাদী, কেউ হয়তো দুয়ের ভিতরে দোদুল্যমান। ব্যক্তি-মানুষকে স্বীকার করতেই হবে। 'আপনাকে আশাবাদী হ'তেই হবে' বা 'আপনাকে নিরাশাবাদী হ'তেই হবে' মানুষের উপর এই ফতোয়া জারি করা চলে না। মানুষ জন্তু বা মেশিন নয়। অপিচ, ছোটোগল্পের জন্মমুহূর্ত থেকে নাস্তির সঙ্গে তার আত্মীয়তা। "ডেকামেরন" ঐ সৃজনের শস্য। মোপাসাঁ, এডগার এ্যালান পো প্রমুখ কীর্তিধ্বজদের মধ্যে উপর্যুক্ত সৃজনশীলতা বহমান। সেই শোণিত আজো তার শিরায় ঘূর্ণি তোলে।

বস্তুত আমাদের ছোটোগল্পে তথা সাহিত্যে যে-নৈরাজ্যের কথা শুনি, তা লেখকদের শিল্পরচনার বিষয়ের ভিতরে যতো-না প্রাপ্তব্য ততোধিক তাঁদের খণ্ডিত মতের উগ্রতায় এবং প্রত্যক্ষ ও ছদ্মবেশী রক্ষণশীলতায়। অবশ্য যে-দেশের মধ্যযুগে একই বিষয়, ছন্দ, উপমা, অলংকার, প্রকরণ নিয়ে সমস্ত কবি বছরের পর বছর, দশকের পর দশক, শতাব্দীর পর শতাব্দী লিখতেন, সে দেশের আধুনিক যুগেও-যে সেই গতানুগতি চেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষণের রেওয়াজ অধিকাংশের মধ্যে বলীয়ান থাকবে—এই তো স্বাভাবিক। আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছোটোগল্পের উপরেও বাইরে থেকে ক্রমাগত নির্দেশ বর্ষেছে। তিনি কি নিয়ে লিখবেন ও কেমন ক'রে লিখবেন, একজন গল্পকারই এটা সবচেয়ে ভালো জানেন—অন্য একজন লেখক বা সমালোচক নন। যাঁরা গল্পের মুক্তির জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন, গল্পলেখকদের উপযুক্ত স্বাধীনতা রক্ষার ভার তাঁদের উপরে।

আসল অন্বিষ্ট সামগ্র্য। এবং তা সৃজনশীলতার মধ্যেই প্রাপ্তব্য। নূতন মাত্রেই বিদেশি নয়, যেমন বাস্তবতার অর্থ নিশ্চয় মফস্বলমন্যতা নয়। শুধুমাত্র 'সামাজিক বাস্তবতা'-র মধ্যেই জীবন সীমিত নয়, আরো বড়ো ও জটিল রহস্যবিগাঢ় অন্তর্লোক অপেক্ষা ক'রে আছে নূতন ছোটোগল্পের পদপাতের, যে-লোকে প্রবেশের আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি আর্ষোক্তি স্মরণ করা যেতে পারে:

> বুদ্ধিমানের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ন্যায় প্রকৃতিতে যে সমস্তই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার তাহা নহে। সমালোচকেরা যাহাই মনে করুন, প্রকৃতি অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, সর্বত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেক্ষা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রামাণ্যের অপেক্ষা অপ্রামাণ্যই অধিক।।

কৃষ্ণ থিএটার

১

পশ্চিমী শিল্পজগতে বিচিত্র বিলোড়ন ওঠে, তার কোনো-কোনোটির সংবাদ এদেশেও রাষ্ট্র হয়, অধিকাংশ আমাদের গোচরে আসে না বা ঘটে তার বিলম্বিত আগমন। কোনো-কোনোটির সুন্দর নূতন কিরণপাতে আমাদের শিল্পসাহিত্য নূতন অর্থে অন্তরাখ্যানে গর্ভবতী হ'য়ে ওঠে। তবে পশ্চিমী শিল্পালোড়ন মাত্রই নবদিঙনির্দেশী—সব দেশের উন্মূল অত্যাধুনিকদের একাংশ এই ধারণার ভ্রান্ত পোষকতা করেন। তত্রাচ তার দু-একটি যখন মর্ম স্পর্শ করে, তখন সতত হৃদয় সহসা দ্রুতস্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। উপর্যুক্ত পত্রিকাটির রচনাগুচ্ছেও কৃষ্ণ শিল্পালোড়নের এক সংহতসমগ্র বিভূতি মানবিক প্রাণবিক জয়ভাষা গেয়ে প্রবল ভালোবাসার এক অলোককোমল ছুরির মতো হৃদয় দখল ক'রে বসে।

'কৃষ্ণ শিল্পালোড়ন' নামক ল্যারী নীল্-এর প্রবন্ধটিতে প্রদীপিত এই উপপ্লবী সমাজের একটি রেখালেখ্য। বস্তুত কালো আমেরিকার প্রয়োজন ও উৎকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসৃত ও উচ্ছ্রিত এই আন্দোলন-ধারা। এঁদের বাসনা : পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের নিহিত সাংস্কৃতিক পুরুষার্থ নবমৌলিকতায় পরিবর্তিত বা চূর্ণীকৃত করতে হবে, এবং নব-মৌলিকতায় পরিবর্তন যেহেতু সম্ভব নয়, সুতরাং বিচুর্ণনই একমাত্র কৃষ্ণলোকায়তিক উপায়। কৃষ্ণ শিল্পীরা যদি কালো কান্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠা না-করেন, তাহ'লে তাঁদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই 'কালো কান্তিবিদ্যা'-র ধারণা-চেতনার

ন্যুইঅর্ক য়ুনিভার্সিটি-কর্তৃক প্রকাশিত "দ্য ড্রামা রিভিয়্যু" নামক নাট্যপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'ব্ল্যাক থিএটার'। মূল সম্পাদক : রিচার্ড শেকনার। এই বিশেষ সংখ্যার সম্পাদক : এড বুলিনস্। প্রকাশ : গ্রীষ্ম ১৯৬৮।

পিছনে আছে আফ্রো-আমেরিকান বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ইতিহাসচেতনা। প্রাক্তন কান্তিকারুবিস্তার ভঙ্গুর স্থাপত্যে নূতন কোনো নির্মাণ সম্ভব নয় আর; শ্বেত ভাবনা-বেদনা, জগতের প্রতি শ্বেত দৃষ্টিকোণের আরোপ, শ্বেত জিনিশ—সব চূর্ণ করতে হবে। আজ, শিল্পী ও শিল্পকলার এক নবস্থাপনা আবশ্যিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই শিল্পালোড়নের উত্থান শুদ্ধ নব্য কান্তিবিস্তার আয়োজন থেকে নয়, বরং কৃষ্ণসমাজব্যাপী এক রাজনীতিক ধারণাপ্রসার থেকে: প্রাথমিক ও প্রধানভাবে এটি একটি সম্প্রদায়ের—নিগ্রোদের—কথা বলে এবং এই সম্প্রদায়ের বাইরে যা-কিছু তাকেই তাড়ায় ও অস্বীকার করে এবং কালো আমেরিকার চেতন-অবচেতন চাপ কৃষ্ণপৃথিবীর আত্মকর্তৃত্ব ও এক স্বতন্ত্র জাতিগঠনের চেষ্টায়। কাজেই, কালো শিল্পালোড়নের শিকড় রাজনীতি থেকে, সম্প্রদায় ও বর্ণচেতনা থেকে এবং শেষ-পর্যন্ত এঁরা শিল্পে ও ভাবনায় এক সাংস্কৃতিক উপপ্লবের মুখের অপেক্ষী।

কৃষ্ণ শিল্পালোড়নের একটি অংশ এই কৃষ্ণ থিএটার। এই আন্দোলনের মধ্যমণি কবি-নাট্যকার লিরোয় জোন্‌স্‌—'কৃষ্ণ শিল্প' কথাটি, সুপ্রাচীন হ'লেও, যাঁর কবিতা থেকে চয়িত হয়েছে। আমেরিকায় বা সাধারণ-ভাবে য়ুরোপের নাটকে যে-নীরক্ত শ্বেতাঙ্গ পাংশুতা (এঁদের নিগ্রো-ধারণায়), এঁরা তার বদলে আনতে চাচ্ছেন আতীব্র রক্তমাংসজ বাস্তবতা। এই কালো নাট্যমাধ্যমে এঁরা সরাসরিভাবে সাধারণ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন, তার কারণ নাটক জনসাধারণের সবচেয়ে কাছাকাছি শিল্পমাধ্যম, এবং এই নাট্যচেষ্টায় তাঁরা তুলে ধরতে চান শাদা-কালোর বিরোধ—যে-বিরোধে পরাভূত নিগ্রোরা অনুভব করতে পারে তারা পরস্পর শোণিতসূত্রে যোজিত ভাই-বোন।

এই নাট্যধারার অংশী যাঁরা বর্তমান পত্রিকাপৃষ্ঠে উপস্থাপিত, তাঁরা হলেন: লিরোয় জোনস—যিনি, মনে হয়, সর্বাধিক প্রভাবসম্পাতী, এড্‌ বুলিন্‌স্‌, বেন্‌ কলড্‌ওএল্‌, হরবর্ট স্টোকস্‌, সোনিয়া স্যানশেজ্‌, রোনাল্‌ড্‌ মিল্‌নার, ডরোথি আহমদ প্রমুখ। এঁদের সকলেরই নাট্যে স্ববর্ণের প্রতি প্রবল সহানুভূতি ও শ্বেতাঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ ও কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গের বিরোধের স্থাপনা বিশেষ দ্রষ্টব্য। এবং এই স্থাপনার একটি সাধারণ সূত্র আছে। তাঁরা সকলেই অনুসরণ করেছেন নিরঙ্কুশ প্রকৃতিপন্থা। ফক্‌নর্‌ বা

মিলার্-এর মার্কিনী ঐতিহ্য ভেঙে ফেলে এঁরা স্থাপন করতে চাচ্ছেন এক অপাপ দারুণ বাস্তবতা—ঘটনা নির্মাণে, চরিত্র তৈরিতে, পটভূমি রচনায়। এইসব লেখা যদিচ এক উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত, কিন্তু আদর্শিক চৈতন্য এখানে দাঁড়ানো বাস্তবের ভিত্তিভূমিতেঃ বস্তি, জেলখানা, ভাড়াটে বাড়ি, রান্নাঘর এর রঙ্গভূমি; রাস্তার মানুষ, অপরাধী, সাধারণ জনতা এর কুশীলব; আর সব ঘটনাই এক উদ্দীপ্ত নাগরিক চৈতন্য থেকে জায়মান। এই আদর্শিক, বাস্তবিক, ফেনিল, রক্তিল জগচ্চিত্র থেকে—সুতরাং—চরিত্রপাত্রদের মুখে যে-সংলাপ উচ্চারিত তা-ও একান্ত প্রকৃতিধর্মিতায় যেমন ব্যাকরণ অস্বীকার ক'রে যায় তেম্নি শালীননীতির ধার ধারে না। উদ্দেশ্যপ্রভব হ'য়েও স্রেফ ক্ষমতালীলায় কোনো-কোনো রচনা দুর্ধর্ষ হ'য়ে উঠেছে। এড্ বুলিন্স্-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য ('কিং নিহত' শিরোনামায়) শান্তিসম্রাট মারটিন লুথার কিং-এর হত্যার সংবাদে থিএটারে বন্ধুসংঘে এক সন্ধ্যার বিবরণী সংবাদ অতিক্রম ক'রে হৃদয়দ্রাবী সাহিত্য হ'য়ে উঠেছে এবং এই মন্তব্যবিবরণীর সঙ্গে উত্তরবর্তী স্বাধীন নাট্যগুচ্ছের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না-থাকলেও ভিতরসম্পর্ক মোটেই অনচ্ছ বা অনতিদূর নয়।

অবশ্য মূল সম্পাদক রিচার্ড শেক্নার-এর 'কৃষ্ণ প্রসঙ্গে শ্বেত' নামক ভূমিকা পাঠ ক'রে বোঝা যায় যে, এ ব্যাপক কৃষ্ণ শিল্পালোড়নের একাংশমাত্র প্রকাশিত এড্ বুলিন্স্-এর সম্পাদকতায় তৈরি এই সংকলন-সংখ্যাটিতে। কিন্তু যে-কোনো সাময়িক পত্রিকার পক্ষে এই সীমায়ন স্বাভাবিক। তাহ'লেও এই বিশেষ সংখ্যার সম্পাদনায় এড্ বুলিন্স্-কে মূল সম্পাদক যে অধিক স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাঁরা অন্যান্য **বিশেষ** সংখ্যায় তাঁদের নিজস্ব নীতির যে-চতুঃসীমা আছে তার বাইরে যান না —এই উল্লেখ ও স্বাধীনতাচর্যা এই সংখ্যাটির পক্ষে আবশ্যিক ছিলো। মূল সম্পাদক শ্বেতাঙ্গ এবং বর্তমান সংখ্যার সম্পাদক কৃষ্ণাঙ্গ ব'লেই এই বন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিলো। ফলত, এই সংখ্যার লেখকদের পক্ষে সর্বাত্মক স্বাধীনতা দরকার ছিলো এবং সেজন্যেই এই খণ্ডিত, পরিচ্ছার ও সুসম্পাদিত সাময়িকী-সংখ্যাটি প'ড়ে কৃষ্ণ থিএটার সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণাবৃত্ত গ'ড়ে ওঠে। প্রাক্তনের জ্যামিতি ভেঙে এই দীপ্র ও তুমুল উদ্বোধনের তবু আর-একটি খণ্ডদৃষ্টি হ'লোঃ এক যুযুধান রাজনীতিক ইন্ধন থেকে, বর্ণভিত্তিক সম্প্রদায় থেকে, জলজল ক্রোধ থেকে এর জাগরণ। যদিচ এইসবও প্রতিক্রিয়ার প্রতিলিখন বটে।

এবং এই চলিষ্ণু সম্বন্ধের দ্বৈতে মায়াবী মানবিকী সামঞ্জস্য একদিন সব দেয়ালকে সুকুমার গ্রন্থিতে রূপান্তরিত করবে, এই ভবিষ্যৎ-আশার উদ্বেলে স'পে, এই খণ্ডিত প্রতিক্রিয়াস্নাত মানবী অনিবারণ জয়পতাকাকে আজ বন্দনা জানাই। কারণ, সহসা দেখি ঃ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ছাঁচ ভেঙে ফেলে হৃদয় আমার উড়ছে সাধারণ্যে উড়ছে হৃদয়।

[১৯৬৯]

২

কিছুকাল আগে আমার হাতে পড়েছিলো টি. ডি. আর. ('দ্য ড্রামা রিভিয়্যু',-এর কৃষ্ণ থিএটার-শীর্ষক বিশেষ সংখ্যাটি। রীতিমতো অভিভূত হয়েছিলাম ঐ নাট্যান্দোলনের মর্মবিজ্ঞাপনী আর নাট্যাবলির নবীন ও উজ্জ্বলিত সূচনায়—সেই অভিভূতির স্বাক্ষরাঙ্কিত একটি আলোচনাও লিখে ফেলেছিলাম (উপরে নিবিষ্ট)। বিলোড়িত কৃষ্ণ নাটকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়রাখী।

সম্প্রতি ব্যাণ্টাম-কর্তৃক প্রকাশিত "কৃষ্ণ থিএটার-এর নব নাট্য" সংকলন-গ্রন্থটি পেলাম। কোনো-কোনো প্রাগপরিচিত নামের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে নূতন কএকটি আনন ঃ লিরোয় জোন্‌স্‌, এড্‌ বুলিন্‌স্‌, সোনিআ স্যানশেজ, বেন কলডওএল, হর্বর্ট স্টোক্‌স্‌—চার্লস এইচ ফুলার, এন. আর. ডেভিডসন, সালিমু, মারভিন, কিংসলি বি. ব্যাস প্রমুখ। ভূমিকায় আছে মারভিন-কর্তৃক গৃহীত এড্‌ বুলিন্‌স্‌-এর অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার।

দেখে-শুনে প্রথমেই মনে আসে আমাদের ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন নাট্যযাত্রার প্রসঙ্গ। ওদিকে পশ্চিমে চলছে সাহিত্যের কতো ধারানদী—কতো উদ্যম—কতো বিভূতি। আর, আমাদের এখানে, তটিনীবাহিত বাংলাদেশে এই, নাটক-নামা শিল্পরূপটি কি-রকম নির্বাসিত—যেন প্রবাসীর জীবন যাপন করছে। সরকারসম্ভাবী স্থায়ী রঙ্গভূমির অভাবকে দায়ী ক'রে আমরা আছি নির্বিকারের উদাসীন কৈলাসে আসীন। সত্য ঃ রেডিওয় প্রচলনির্ভর নাটক, টেলিভিশনে প্রচলনির্ভর নাটক, এমনকি কলেজ-য়্যুনিভার্সিটিতে অধিকাংশ সময়েই বার্ষিক নাটক হিশেবে এমন সব উনমান

"নিউ প্লেজ ফ্রম দ্য ব্ল্যাক থিএটার"। সম্পাদক ঃ এড্‌ বুলিন্‌স। প্রকাশক ঃ ব্যাণ্টাম। প্রকাশ ঃ নবেম্বর

নাটক অভিনীত হচ্ছে যে রুচিবন্ত দর্শক-শ্রোতা এসে দাঁড়িয়েছেন ধৈর্যের সীমাদিগন্তে—এবং প্রাগুক্ত নাট্যমালা আমাদের নাট্যচেতনারই একটি সচল নিরিখ। এই ব্যাপক প্রহসন প্রসঙ্গে সকলেই সজ্ঞান। বরং নজর দিতে হবে কোথায় আছে মুক্তিদুয়ার—যেখানে বইছে সমাধানোত্তর সহজী হাওয়া। আমার তো মনে হয় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের চেয়ে ব্যক্তিক উদ্যমেই একমাত্র নূতন রাস্তা খুলতে পারে এবং যদি কোনোদিন এই বন্ধ্য-বিশদ তুষার গলে, তাহ'লে ব্যক্তিক উদ্যোগের তপন-তাপেই গলবে। বলা নিশ্চয় বাহুল্য যে একমাত্র আন্তর তাগিদেই রচিত হ'তে পারে সেই ভিত্তিভূমি—কোনো নির্দেশে, উপদেশে বা পরামর্শে নয়।

যাই হোক,—প্রাগুক্ত প্রথম-স্থাপিত সাক্ষাৎকার, যার মধ্যে এড্ বুলিন্স্-এর পাঞ্জার ছাপ বেশ উজ্জ্বলভাবে পড়েছে, তা থেকে মোটামুটি একটি কৃষ্ণ আয়তনিক নাট্যধারণা তৈরি হ'তে পারে। তাঁর ভাষ্যানুযায়ী কএকটি তথ্য এরকম।—উপপ্লবী নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, অভিজ্ঞান-কৃষ্ণ নাটক ঃ এতে সংকলিত। নাট্যকারেরা তরুণ, অতিতরুণ (সর্বকনিষ্ঠ যিনি, হর্বর্ট স্টোক্স্, মাত্র সতেরো বছরের একজন কিশোর, যিনি নিজে নট-নাট্যকার-কবি)। কৃষ্ণ শিল্প ছিলো বছর কএক আগে একটি চক্রের অন্তর্ভুক্ত—এখন গনগনে সব নাট্যে চারিয়ে গিয়েছে জনসাধারণ্যে, যাচ্ছে ক্রমশ চারিয়ে, নির্মিত হচ্ছে নব-নব কৃষ্ণ থিএটার, সৃজিত হচ্ছে নব-নব কৃষ্ণ নাটক। উপন্যাসে কৃষ্ণাঙ্গেরা আনন্দ পান না, এড্ বুলিন্স্ (এবং অন্যান্যেরা) তাই জনতাচলাচলে যাবার মাধ্যম হিশেবে নাটককে নির্বাচন ক'রে নিয়েছেন।

কবি-নাট্যকার লিরোয় জোনস এঁদের আত্মিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীপতি। সৃজনেও প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাঁর নাটক "ডাচম্যান" যখন আমি প্রথম পড়ি, কৃষ্ণ থিএটার সম্বন্ধে তখন অ-জ্ঞান, অপিচ তখনই এই উপপ্লবী কৃষ্ণ নাট্যকারের ক্ষমতা আমাকে প্রবল মুগ্ধতায় শিকার ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো। এই কৃষ্ণ শিল্পবিলোড়নের সূচনা লিরোয় জোন্স্-এরই হাতে, হারলেম-এ, এখন তিনি ন্যুইঅর্ক-এ স্পিরিট হাউজ-এ যুক্ত থেকে ক্রমিক ব্যাপক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এড্ বুলিন্স্, তাঁর নিজের ও সাধারণ-ভাবে অপরাপর নাট্যকারের উপর জোনস-এর প্রবল প্রভাবের সংবাদ সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন।

বক্ষ্যমাণ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত লিরোয় জোনস-এর একাঙ্ক 'ম্যালকমের মৃত্যু' খানিকটা চিত্রনাট্যের ধরনে রচিত। বৈদেশী অত্যুন্নত কুশলতাতেই একমাত্র এটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব। এক শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক ও কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীদের নিয়ে নাট্যিক সংলাপের সূত্রপাত ঃ

শিক্ষক ঃ এখন আমার সঙ্গে বলো। (শিক্ষার্থীরা বলবে।) শাদাই
ঠিক। ঠিক?

নিগ্রোরা ঃ ঠিক।

অনন্তর অনেক ছিন্ন চিত্রালির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে একাঙ্কটি। ম্যালকম এসেছেন, এসেছে পুলিশ ও জনতা। ম্যালকমের রসিকতা। তাঁর উক্তি 'রক্তপাত ছাড়া কোনো বিপ্লব হয় না' যেন তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই অর্থ খুঁজে পায়। অন্তিম চিত্র রচিত হয় এক ঐতিহাসিক রিচুআল-এর মধ্য দিয়ে—যে মিছিলের কণ্ঠসমাজে কেবলি ধ্বনিত হ'তে থাকে 'শাদা,' 'শাদা,' 'শাদা'। বস্তুত এই নৃত্যমান মিছিলের মধ্য দিয়ে শাশ্বত মানবযাত্রার দিকের ইঙ্গিতে আশ্চর্য নাট্যিক চরিতার্থতা অঙ্কিত। সোনিআ স্যানশেজ-এর ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা 'সিসটার সন' একাধিকভাবে দৃষ্টিআকর্ষী ঃ একটিমাত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমস্ত নাট্যপরিবেশ উন্মোচিত হয়েছে এখানে; এ উন্মোচনে এসেছে কবিতাক্রান্ত স্বগত উচ্চারণের খরস্রোত—চিৎপ্রবাহ—মনোনাট্য—তার বয়সবদলে অপাবৃত হয়েছে তার যৌবনাংশ ও কৃষ্ণাঙ্গীর জ্বলন্ত যন্ত্রণা ঃ

তুমি কী জানো সেই বুড়ি কুত্তি আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাশে কিছুতেই নাম মনে করতে পারতো না আমার—ক্লাশে আমরা ছিলাম বারোজন—তার মধ্যে মাত্র তিনজন নিগ্রো—দিন আর রাত্তিরের মতন আলাদা যারা—আর সে যতোবারই নাম করতো আমাদের মিস জোনস, মিস স্মিথ, মিস টমাস—ততোবারই তাকাতো সবার দিকে এবং কার নাম কোনটা তা কিছুতেই মনে করতে পারতো না।

আর একজন লেখিকা, সালিমু, সোনিআ-র বিপ্রতীপ ঃ তাঁর নাট্যে বাস্তবতা প্রায় প্রকৃতিবাদের ছকে গ'ড়ে উঠেছে, সাহসে দীপ্তিতে শপথে উজ্জ্বল, 'কালোয় বেড়ে ওঠা' নামটি আতীব্র লক্ষ্যভেদী। মারভিন-এর 'কালো পাখি' একাঙ্কটির মধ্যে তাঁর ধর্মবিশ্বাস (কালো-মুসলমানদের

অন্তর্ভুক্ত তিনি), শ্বেতাঙ্গদ্বেষ ও শিল্পক্ষমতা একটি স্রোতোরেখায় প্রকাশিত। উচ্চকিত ঘৃণা, উচ্চকিত দ্বেষ এখানে শিল্পাশ্রিত ঃ

প্রথম বোন : শাদা মানুষ শয়তান ?
ভাই : হ্যাঁ, শাদা মানুষ শয়তান।
দ্বিতীয় বোন : আমি-তো ভাবতুম শয়তান লাল।
ভাই : না বোন, শয়তান শাদা—খেপে উঠলে লাল হ'য়ে যায়।
প্রথম বোন ঃ শাদা লোকজন শয়তান ?
ভাই : হ্যাঁ, বোন।
দ্বিতীয় বোন : আমি-তো ভাবতুম শয়তান থাকে মাটির নিচে।
ভাই : না রে, শয়তান মাটির নিচে থাকে না—থাকে মাটির ওপরেই।

ভ্রাতা-কথিত কৃষ্ণ বিহঙ্গের একটি রূপকীকৃত কাহিনীর মধ্য দিয়েও এ মনোভাবনাই রূপ পায়। হর্বর্ট স্টোকস-এর নাট্যেও একই সরলরেখায়িত প্রতিজ্ঞা প্রস্বরিত। বেন্‌ কলডএল্‌ এর 'পারিবারিক পোর্ট্রেট'-এ বাবা, মা ও ছেলের কথোপকথনে ক্রমে রূপকের প্রতিভাস প্রস্ফুট হ'য়ে যায়—চরিত্রপরিচয়েও লেখকের ওরকম অভীপ্সা ধরা পড়ে। সঙ্গে আছে আরো এড্‌ বুলিনস্‌-এর 'নিউ ইংল্যাণ্ডের শীতে,' এন. আর। ডেভিডসন-এর 'আলহাজ মালিক,' চার্লস এইচ. ফুলার-এর 'জাগরণ' প্রভৃতি দীর্ঘাঙ্গ নাট্যমালা।

সমস্ত নাট্যের উৎসে আছে আত্মবর্ণের প্রতি প্রবল ভালবাসা। বস্তুত তার জন্য দায়ী বিরুদ্ধ প্রতিবেশ ঃ কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের দীর্ঘকালীন ঘৃণা, অত্যাচার ও অমানবিকতা ; তা থেকেই আজ কৃষ্ণ শিল্পীদের কণ্ঠে তিক্ততা ঝ'রে পড়েছে ঃ ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ হ'য়ে উঠেছে তার দুর্নিবার বিধিলিপি। নাট্যগুচ্ছে তাই ক্রোধের মুদ্রা, ঘৃণার মুদ্রা, বিদ্বেষের মুদ্রা অতিস্পষ্ট। উদ্দেশ্য ও বক্তব্য অতিপ্রবল হ'লে যা হয়, রচনা অনেক সময় শিল্পচ্যুত হ'য়েও তার লক্ষ্যের দিকে আঙুল তুলে ধরেছে—প্রচারমগ্নতা জায়গা জুড়েছে। আবার, এমনও বলা চলে ঃ বক্তব্য প্রবল ব'লেই এইসব কৃষ্ণ নাট্যকারের রচনায় একটি জীবিত, দীপিত ও অব্যবহিত অবস্থা তৈরি হ'য়ে উঠেছে—যা আমাদের সমস্ত নিবেশ দখল ক'রে বসে, কারণ তা কিছুতেই নিস্তাপ পাংশুতায় পর্যবসিত বা গদগদ অপব্যয়ে নিঃশেষিত নয়। এখানকার যাবতীয় চিত্রাবলি ধূসর রঙে নয়, উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই : কালো নাট্যের সেই প্রাথমিক (প্রাণবিক ও মানবিক) অভিভূতি, যা অর্জন করেছিলাম টি. ডি. আর. থেকে, এখানে যেন তা ঠিক পাওয়া গেলো না। তত্রাপি, কালো নাট্যগোষ্ঠীর সমবায়ী শিল্পক্ষমতা ও নাট্যগোষ্ঠীর এই অভিনব কৃষ্ণশক্তিকে অভিনন্দন না-জানিয়ে উপায় নেই,— তাঁরা যা করছেন সম্পূর্ণ সততা থেকে, এঁরা একটি অব্যবহিত চতুষ্পার্শ্বকে রেখাঙ্কিত ক'রে রাখছেন তার সব কাঁচা, বন্ধুর, প্রাকৃত, সংরক্ত, জলজলে বস্তু, ও অভিজ্ঞতা-সমেত।—এরকম সব নাট্যগুচ্ছে আমরা যদি স্বাধীনভাবে আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী যাবতীয়কে চিহ্নিত রাখতে পারতাম ॥

[১৯৭০]

'চাঁদের অমাবস্যা' ঃ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌

এরকম একটি ধারণা-ভাবনা লোকপ্রচলিত যে একজন লেখক কেবল স্বভাবেরই অবিকল অনুসারী। কি—আমার বলবার ধরন দেখে পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন যে উক্ত বিশ্বাসবলয়ের বাশিন্দা আমি নই—আমার তো মনে হয়ঃ স্বভাবী উপাদানের তুল্য গুরুত্ব বহন করে জীবনের অস্বভাবী উপাদানাবলি। এর একটি কারণ হয়তো অস্বাভাবিকে আমাদের কৌতূহলের পিয়াস মেটে, অগতানুগতিকে আমাদের আলস্য ঘুচে যায়। এবং চলিষ্ণু জীবনের ব্যতিক্রমেই গল্পউপন্যাসের ভিত রচিত হয়;—তা না হ'লে তা আমাদের আকর্ষণ করবে কেন, আমাদের শারীর মানসের জাড্য ঘোচাবে কি ক'রে। গল্পউপন্যাসে কাহিনী বা ঘটনার প্রয়োজন, তাই, কিছুতেই তিরোহিত হয় না; এমনকি অস্বভাবী কাহিনী বা ঘটনার ব্যবহার প্রায়-আবশ্যিক হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কাকে বলছি অস্বভাবী উপাদান? সে-ও কি জীবনের একটি এলাকা নয়? এবং, শেষপর্যন্ত, স্বভাবেরই অংশ? বস্তুত জীবনের স্বভাবী ও অস্বাভাবী উপাদানের পরস্পর দরাজ দখল ও সহবাসেই একটি উপন্যাসের সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। শুদ্ধ স্বভাবী উপাদানের ব্যবহার যেমন আমাদের কৌতূহলকে জাগ্রত ও টান ক'রে রাখতে পারে না, তেমনি শুদ্ধ অস্বভাবী উপাদানের প্রয়োগ উপন্যাসকে নামিয়ে নিয়ে যায় অলীকে বা অলৌকিকে। টমাস হার্ডি বলেছিলেন যে অস্বভাবী উপাদান উপন্যাসে উপস্থিত থাকবে চরিত্রপাত্রে নয়-ঘটনাবলিতে সমস্ত চরিত্রপাত্রের মনোমণ্ডলে শাশ্বতী সুর বেজে চলেছে, কিন্তু ঘটনাবলি ওরকম কেনো নির্দিষ্ট নিয়মের নিগড় মানে না ঃ—হয়তো এ থেকেই উক্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন হার্ডি। কিন্তু এর বিপ্রতীপ উদাহরণ হিশেবে আমরা স্থাপন করতে পারি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবযান' উপন্যাসটি—যেখানে মৃত্যুত্তর ঘটনাবলি যতোই অলৌকিক হোক, তার মৃত্যুত্তর চরিত্রপাত্রদের আচরণের সম্পূর্ণ মানবিকতাই আমাদের ধ'রে রাখে।

দেখা যাচ্ছেঃ জীবনের আশ্চর্যবিস্ময় উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। (বিভূতিভূষণের "দেবযান" উপন্যাসটির কথা তুলেছি ব'লে পাঠক আমাকে ভুল বুঝবেন না যেন ; আমি 'অস্বভাবী উপাদান' হিশেবে 'অলৌকিক' বা 'লোকোত্তর'-কে স্থাপন করতে চাচ্ছি না, হ'তে পারে এটি তার অংশ, আমার মূল লক্ষ্য লৌকিক জীবনান্তর্গত বিষয়সমূহই)। এবং বাংলাদেশের একটি গ্রামের একজন সাধারণ স্কুল-শিক্ষকের জীবনে যদি সেই আশ্চর্য-বিস্ময় উদিত না-হ'তো, যদি তার জীবন অতিবাহিত হ'তো আর-পাঁচজন শাদামাঠা মানুষের মতোই, তাহ'লে এই উপন্যাসটি লেখা হ'তে পারতো না। যদি কেউ বলেন যে হত্যা তো কোনো অস্বভাবী ঘটনা নয়, কাজেই তার মধ্যে আশ্চর্য কী আছে, তা'হলে আমার জবাব হবেঃ ঐ ইশকুল-শিক্ষকের সমস্ত জীবনান্বেষণ ও আত্মতদন্তই বস্তুত আশ্চর্য-অভিধার উপযোগী। বাংলাদেশের সামান্য একজন গ্রামীণ ইশকুল-শিক্ষকঃ তার এই তদন্ত কি অবাস্তব বা আরোপিত?—না, বরং জীবনের মতোই আশ্চর্য। লেখক যদি কোনো অজ্ঞাত বা অর্ধঅজ্ঞাত জগৎ উন্মোচন করেন, সেটা তো তাঁর অপরাধ নয়। আসলে আরেফ আলীর সমস্ত জীবনটাই সেই আশ্চর্যঅন্বেষী। এখানে যা দ্রষ্টব্য তা হচ্ছে এই যে লেখক ঐ অস্বাভাবী উপাদানের সঙ্গে স্বভাবী উপাদানের কতোটা মিশোল ঘটিয়েছেন, এবং কতোটা সফলতার সঙ্গে। তবু এখানেই কবুল করা ভালোঃ যাকে বলেছি অস্বভাবী উপাদান, যার সূত্রহীন সম্মিলনে 'রোমান্স' রচিত হয়, এখানে তা অনুপস্থিত ; এখানকার আশ্রয় চলতি ঘটনার ব্যতিক্রম,—এবং সেই সূত্রে অস্বভাবী উপাদানের মধ্যে এককদম ঢুকে-যাওয়া জীবনের আশ্চর্যবিস্ময়। এক কথায়ঃ এ উপন্যাসের বিষয়ের ঘুড়ি শূন্যে উড্ডীন বস্তুলোকী অভিজ্ঞতার জমি থেকেই।

অতি সংক্ষেপিত কাহিনীসূত্রটি এই। —কোনো এক গ্রামের জনৈক যুবক শিক্ষক, আরেফ আলী, এক রাত্রে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে, ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোয়। চন্দ্রিকাস্নাত রজনীতে একটি ছায়াশরীরের আকর্ষণে পরে সে গ্রামপথে বেরিয়ে পড়ে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে নিহত এক রমণীর লাশ ভাখে সে। ঘটনাটি আরেফ আলীর মনোলোকে বিলোড়ন তোলে, এবং সে দিবারাত্রি আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটায়ঃ আসল ঘটনাটি ঘটেছিলো

কি : যে-বড়ো বাড়ির সে আশ্রিত, সেই বাড়ির একজন কর্তাপুরুষ, কাদের, গ্রামীণ একজন রমণীকে নিয়ে এসেছিলো বাঁশঝাড়ে সঙ্গমের আশায়; সে-ই আরেফের পদশব্দে ভয় পেয়ে রমণীকে গলা টিপে হত্যা করে। উপন্যাসের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে আরেফের উপর উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ার বিচিত্রবিধ বর্ণনায়। শেষ পর্যন্ত সে পুলিশকে ঘটনাটি জানায়। পুলিশ জেনেশুনেই কাদেরের বদলে তাকেই খুনী সাব্যস্ত করে। আরেফ আলী, প্রায় স্বেচ্ছায়, নিজের উপরেই এই হত্যার শাস্তি ডেকে আনে।

কাহিনীর এই সংক্ষেপীকরণে উপন্যাসটির কিছুই ব্যক্ত হ'লো না। কেননা সমগ্র কাহিনীটি এমন-একটি ভিতরমুখী বুনুনির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে গেছে যার বিস্তারণ বা সংক্ষেপন প্রায়-অসম্ভব। কুয়াশা ও জ্যোৎস্নাময় রজনীতে বেরিয়ে এসেছিলো আরেফ আলী; তা থেকে তার মানসযাত্রা যেন স্পষ্ট দিবালোকের প্রতি। প্রথম পরিচ্ছেদে 'আলো অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধউলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়।' কিন্তু এই দৃশ্যের উপর প্রহেলি ও অর্ধালোক এরকমভাবে লুণ্ঠিত হ'য়ে আছে যে ঐ আকস্মিক লাশদর্শন যেন পাঠককেও একটি ঘোরের মধ্যে নিয়ে যায়। এখানে আরেফ আলীর প্রতিটি মুহূর্ত ও শারীরমুহূর্ত, জ্যোৎস্না ও কুয়াশা আশ্চর্য উদ্ভাসিত : চলনশীল কুয়াশা ও পরিবর্তমান জ্যোৎস্না সমস্ত দৃশ্যপ্রেক্ষিত রচনা করেছে। 'চাঁদের মুখ' এই মুহূর্তে 'স্নিগ্ধ-প্রশান্ত', পরমুহূর্তে 'নির্দয়'। এই কুজ্ঝটি-জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ক্রমাগত প্রতীপাভাস (oxymoron) ব্যবহারে :

১. পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। [পৃ. ৯]
২. তারপর বাঁশির আওয়াজ সুতীব্র হ'য়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শোনে নাই। [পৃ. ৯]
৩. ঝলমলে জোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু, হয়তো তা ঠিক বোঝে না। [পৃ. ১০]
৪. সামনে কিছু নাই, তবু একেবারে নিশ্চল নয়। [পৃ. ৯১]
৫. অর্ধউলঙ্গ দেহে প্রাণ নাই, তবু একেবারে নিশ্চল নয়। [পৃ. ১১]
৬. এক মুহূর্ত আগে যা সত্য মনে হয়েছিলো, তা যে সত্যই সে কথা কে বলতে পারে। [পৃ. ২০[

'অজাগতিক এবং রহস্যময়' আবহ সৃজিত হয়েছে এরকম কিছু প্রয়োগে :

১. কুয়াশা না আর কিছু, হয়তো সে ঠিক বোঝে না। হয়তো একদল সাদা বকরী দেখে, যার শিং-দাঁত চোখ কিছুই নাই। [প. ১০]

২. একটু দূরে বটগাছ, আবছা-আবছা চোখে পড়ে। শিকড়ে-শিকড়ে দৃঢ়বদ্ধ গাছটি অস্পষ্ট আলোর ভাসে, যেন পানিতে আমজ্জ হয়ে আছে গাছটি।

[পৃ. ১২]

৩. ঈষৎ হেসে এবার সে সজোরে ব'লে ওঠে, "কাদের মিঞা! বাঁশঝাড়ে কাদের মিঞা!" কথাটা সজোরে বলেছে কী বলে নাই, অবশ্য সে বিষয়ে এখন সে হলফ করে কিছু বলতে পারে না।

[পৃ. ১৮]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে এই অবস্থা পরিবর্তিত হ'য়ে বাস্তব ও লৌকিক জগতের আলো প্রবেশ করেছে। কিন্তু সেই কুহেলি ও চন্দ্রিমা আরেফ আলীর মাথার ভিতর থেকে কখনো স'রে যায়নি। তারই মধ্যে শুরু হয়েছে তার আত্মসন্ধান ও আত্মতদন্ত। বহির্জাগতিক কাজগুলি নিয়মমাফিক ক'রে চলেছে সে, কিন্তু ভিতরে চলেছে সুচিক্কণ এক অবাস্তব অন্তঃস্রোত। প্রথম দৃশ্যে 'বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ' দেখে 'গ্রামবাসী অনভিজ্ঞ যুবক শিক্ষক' উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করেছিলো; ক্রমশ এই উন্মাদনা শমিত হ'য়ে আসে; কিন্তু ভিতরে চলতে থাকে তুমুল ঝর্ঝর। ইশকুলে ও বাড়িতে তার এই বহির্জাগতিক অভিনয় চলে; তারই মধ্যে তার মানস-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'তে থাকে এক প্রতিদ্বন্দ্বে সংরক্ত নাট্য। দ্বিতীয় নিশীথে কাদের আসে আরেফ আলীর ঘরে; মৃতদেহ সরানোর জন্যে আরেফ আলীর সহায়তালাভ তার উদ্দেশ্য। এখানে লেখকের আশ্চর্য বাচংযম দ্রষ্টব্য:

১, একটু ইতস্তত করে অবশেষে খনখনে গলায় [কাদের] বলে, "চলেন যাই।" যুবক শিক্ষক সহসা কোন উত্তর দিতে সক্ষম হয় না। শেষে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করে,
"কোথায়?"
"এখনো বাঁশঝাড়ে পড়ে আছে। কেউ খবর পায় নাই।" [পৃ. ৫০]

২, একবার কাদেরের কণ্ঠস্বর তার কর্ণগোচর হয়। অনুচ্চ কণ্ঠ, তবু সন্দেহ থাকে না যে যুবক শিক্ষককে সে তিরস্কার করে। "শক্ত করে ধরেন না কেন?" সে বলে।
কী সে শক্ত করে ধরবে? তার হাতে দুই খণ্ড হিমশীতল কাঠ।

[পৃ. ৫৬]

বস্তুত সারা উপন্যাসে যেমন, তেম্নি এখানেও আরেফ আলীর মানস-প্রতিক্রিয়ার প্রতিই লেখকের চোখ তীক্ষ্ণ হ'য়ে আছে। তটিনীজলে লাশ ভাসিয়ে দেবার পর আরেফ আলীর বুক 'নদীর শূন্য বুকের মত···শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে'। পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে আরেফ আলীর মানসযাত্রার ক্ষীণ ও তীর ফল্গুনদী ক্রমশ ভীষণ ও চওড়া হ'তে থাকে।

> গতরাতে নদী থেকে ফিরবার সময় তার মনে হয়, তার চিন্তাশক্তি সত্যিই যেন লোপ পেয়েছে। কেবল সে বোঝে তার কিছুই করার নাই, শুধু অপেক্ষাই করতে পারে। হয়তো কোথাও কিছু ঘটবে, কোথাও আলো দেখতে পাবে, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মর্মার্থ বুঝতে পারবে।

এভাবেই শুরু হয়েছিলো—প্রায় একটি শূন্য থেকে। কিন্তু ক্রমশ 'খই ফোটার মত' একরাশ জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতে থাকে। এর পর ক্রমাগত আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মতদন্ত, আত্মবিশ্লেষণ; যুযুধান ব্যক্তি-মানসের বিচিত্র ফলন-প্রতিফলন; ছায়া-উপচ্ছায়া; প্রতিচ্ছায়া; নৈর্ব্যক্তি, আত্মদৃষ্টিপাত, কাদের-চক্ষু। প্রথমে একান্তরভাবে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ); পরে অন্তর্গত ফল্গুনদী অন্তর্গত মোহানায় গিয়ে পড়েছে (নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদ): আত্মতদন্ত এখানে এসে পড়েছে বিশাল বিস্তারে। প্রথমে ছিলো প্রায়-গোপন রুদ্ধশ্বাস এক কুট পরিধি:

> ১. না, আরেকটি কথা আছে যা হয়তো সে কাদেরকে কেন, কাউকে বলতে পারবে না। তার মনে হয়েছিলো, বাঁশঝাড়ের কথাটি প্রকাশ করা যায় না। সে-টি কাদের আর তার মনের গোপন কথা। শরীরের গোপন স্থানে গুপ্তক্ষতের মত। এমন কথা কাউকে বলা যায় না।
>
> [পৃ. ৬৬]
>
> ২. নদীপথ-স্টীমারের এ-নিরীহ বিবরণেই যুবক শিক্ষকের বুক কাঁপতে শুরু করে। সে বোঝে, বক্তা এখনো আসল কথা পাড়ে নাই। সে নদীরই মত এঁকেবেঁকে সর্পিল গতিতে অগ্রসর হচ্ছে কেমন উদ্দেশ্যহীনভাবে, কিন্তু উপযুক্ত মুহূর্তে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবে। তার গন্তব্যস্থল যুবক শিক্ষক জানে। তবু তা শোনবার বাসনা এমন তীব্র হ'য়ে ওঠে যে সে শীঘ্র শ্রান্তিবোধ করতে শুরু করে।
>
> [পৃ. ৭৫]

ঘটনাবলির বিশ্লেষণ নব-নব বিন্যাস পায় আরেফ আলীর মানসলোকে; বয়স্ক শিশুর মতো ঘটনা, যুক্তি-ও কারণগুচ্ছকে সে বারংবার নূতন-নূতনভাবে

সাজায়। কিংবা এ এক অভিযাত্রা, মানসলোকী অভিযাত্রা—যেখানে যুক্তি ও কারণের সমস্ত সঙ্গীকে হারাতে-হারাতে যখন সে অভীষ্ট চূড়ায় এসে দাঁড়ায় তখন সে একা। একসময় তার 'চিন্তাশক্তি সত্যিই যেন লোপ' পেয়েছিলো, শূন্যের কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলো সে, ছিলো 'শুধু অপেক্ষাই'। এই নাস্তির বিবর থেকে উঠে এসেছিলো সে অচিরাৎ অস্তির ডাঙায়। তাই ৬১ পৃষ্ঠার নিশ্চেষ্ট 'অপেক্ষা' থেকে ৯৭ পৃষ্ঠায় সক্রিয় অর্থসন্ধিৎসা বস্তুত মাইল-মাইল মানস-পৃথিবী পেরিয়ে আসার দীপিত

> একটু পরে দুর্বলকণ্ঠে সে উত্তর দেয়, "ভেবেছি এই কারণে যে আমি কিছুই বুঝতে পারি না।"
> একটু ভেবে কাদের প্রশ্ন করে, "কী বুঝতে পারেন না?"
> যুবক শিক্ষকের দুর্বলকণ্ঠের ওপর দিয়ে হঠাৎ দমকা হাওয়া বয়ে যায়। সজোরে মাথা নেড়ে সে উচ্চস্বরে বলে, "কিছুই বুঝতে পারি না।"
> [পৃ. ৯৭]

এই অর্থসন্ধিৎসার যাত্রাপথেই নৈর্ব্যক্তি-কে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে গিয়ে অংশগ্রহণের ভয়াল অবস্থা সূচিত হয়ঃ

> বাড়ী ফেরবার পথে যুবক শিক্ষকের তৃপ্ত মনে হঠাৎ অপ্রীতিকর একটি সন্দেহের ছায়া উপস্থিত হয়। যুবতী নারীর হত্যাকারী কে, সে নিজেই নয়? সে যদি কাদেরকে অনুসরণ না করতো, অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অকারণে বাঁশঝাড়ের সামনে উপস্থিত না হতো তবে দুর্ঘটনাটি ঘটতো না।
> [পৃ ১২০]

এমনিভাবে সে, আরেফ আলী, অন্তর্গত এক ক্ষমাহীন দায়িত্বচক্রে জড়িত হ'য়ে পড়েঃ 'সে কি একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নেয় নাই?' (পৃ. ১২৩) এই দায়িত্বজড়িত হ'লেই সে হন্তা কাদেরের সপক্ষে যুক্তিমালা আহরণ করে। যুক্তির একটি ভিতঃ কাদের হয়তো নিহত নারীকে ভালোবাসতো। এই উদ্দেশে, নিশ্চিত হবার জন্যে কাদেরকে সে বলে, 'মেয়েলোকটির জন্যে আপনার মায়া মহব্বত ছিলো, সে-কথা একবারও বল্লেন নাই।' তার উত্তরে কাদের যখন তাকে 'পাগল' বলে, তখন সে বোঝেঃ 'কাদেরের পক্ষে দরিদ্র মাঝীর বউয়ের প্রতি কোন ভাবাবেগ বোধ করা সম্ভব নয়।' (পৃ. ১৩১) এই বোধের সঙ্গে-সঙ্গে

আরেফ ভিতরে নিঃস্ব ও নিঃশেষিত হ'য়ে যায়, তার উক্তি 'আমার আর কোন উপায় থাকলো না' যেন কোন অন্তর্গত জলোচ্ছ্বাসে প্লবমান ব্যক্তির আকুল মুষ্টি থেকে শেষ নির্ভরটি খ'শে যাওয়ার মতো। তার-পরই সে সিদ্ধান্ত নেয় খুনের রহস্য ফাঁশ ক'রে দেয়ার। ঘটনাটি জানায় সে দাদাসাহেব বা আলফাজউদ্দীন চৌধুরী ও পুলিশকে। বিশ্লেষণরত আরেফ আলী জানতো এর ফলে তার মতো গরিব ইশকুল-শিক্ষকের পক্ষে বিশালনির্ভর যে-বড়োবাড়ি তার আশ্রয় তাকে হারাতে হবে, এমনকি তাকেই হ'তে হবে সমালোচনার পাত্র। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো: পুলিশ কাদের তথা বড়োবাড়ির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না; হত্যা প্রসঙ্গে নিশ্চুপ থাকলে পুলিশ কাদেরকেও মুক্তি দেবে। কিন্তু

> বাঁশঝাড়ে যুবতী নারীর জীবন শেষ হলেও, সে-দৃশ্য স্মরণ করে যুবক শিক্ষকের মনে কোন ভাবের আভাসও না দেখা গেলেও, সেখানেই যুবতী নারীর কথা শেষ হয় নাই। কারণ, তার জন্যে এখনো কি কারো শাস্তি পাওয়া বাকী নাই? [পৃ. ১৭৯]

আরেফ আলী নিজের উপরে এই শাস্তি টেনে আনে।

এই উপন্যাসে ব্যক্তিসত্তা উন্মোচনের বা ধারাবর্ণনার পশ্চাদজমিতে সমাজসত্তাও সক্রিয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব এই যে ব্যক্তির আত্মতদন্তে নিবিষ্ট থেকেও সমাজসত্তার পশ্চাদজমির প্রতি সম্পূর্ণ নজর ছিলো তাঁর; ফলে ব্যক্তিকে তিনি বিচ্ছিন্ন, শূন্যচারী ও নিরবলম্ব ক'রে তোলেননি। যে-গ্রামটি তাঁর উপজীব্য, তার সম্বদ্ধময় পরিবার বড়োবাড়ি, তার ইশকুলের শিক্ষকবৃন্দ, পুলিশ-কর্মচারী, সাব-ইন্সপেক্টর সবই যথাযথ স্ফুট। কিন্তু অন্তরালশায়ী সামাজিক দেশটিকে স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা যেন লেখকের; ঐ সব ব্যক্তির চেয়ে তাদের আচরণের ভিতরবর্তী ফোঁপরা অবস্থাটিই যেন লেখকের লক্ষ্যের অন্তর্ভূত। এজন্যই লেখকের সামাজিক উচ্চারণগুলি কোথাও খুব উচ্চকণ্ঠ নয়, বরং প্রায় ইশারালেখে অঙ্কিত। এর চমৎকার উদাহরণ কাদের চরিত্রটি।

> কাদেরের দরবেশীলাভের ইতিহাস একদিন কিছুটা সংগোপনে দাদাসাহেব ছেলেদের বলেছিলেন। তখন সে অবিবাহিত। একদিন মধ্যরাতে সে জেগেই শুয়েছিলো, হঠাৎ বাড়ীর দেউড়ীর কাছে কে যেন তাকে ডাকলো।...সে-

> রাতে বুজুর্গের সঙ্গে তার প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়। পরদিন যখন সে ঘরে ফেরে, তার মুখ ফ্যাকাশে, রক্তহীন, কিন্তু চোখে অত্যুজ্জল দীপ্তি, অলৌকিক তৃপ্তি-সন্তোষ ভাব। সেই থেকে বুজুর্গের সঙ্গে তার প্রায় সাক্ষাৎ হয়। [পৃ. ৩৭]

কাহিনীক্রমে আমরা কিন্তু বুঝতে পারিঃ বুজুর্গের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বুজরুকিঃ তার নৈশ ভ্রমণ কোনো দিব্য প্রেরণায় নয়—স্রেফ জৈব বাসনায়। এ আমাদের মনে পড়িয়ে দ্যায় মধ্যযুগের বোকাশিও-র‍্যাবেলে-বর্ণিত কাহিনীগুচ্ছ; এবং এক হিশেবে ঐ মধ্যযুগীয়তা তো বাংলাদেশে বিরাজমান বটেই। কিন্তু বোকাশিও-র‍্যাবেলে-র মতো কাহিনী এখানে প্রকাশ্য ও হাস্যস্ফারিত নয়; বরং নিগূঢ় ও আচ্ছাদিত। তবে এই উপন্যাসে অন্তত একবার লেখক সমাজদৃষ্টিকে খোলাখুলি কশাঘাত করেছেনঃ

> "বিবস্ত্র?" একটি শিক্ষক অশক্ত নীতিবিদের কণ্ঠে উক্তি করে। কলাগাছের মত ফাঁপা-ফোলা ভাসমান প্রাণহীন নারীদেহের পক্ষেও বিবস্ত্র হওয়া যেন দূষণীয়। [পৃ. ৬৭]

এবং সমস্ত মিলিয়ে সমাজদেহে একটি পরোক্ষ বৈদ্যুতিক চাবুক পড়েনি কি? আরেফের উদ্দেশে পুলিশ-কর্মচারীর উক্তি, 'হয় অপরাধ স্বীকার করেন, না হয় আজগুবি কথাটা ছাড়েন,' তার প্রতিধ্বনিত সাব-ইন্সপেক্টরটি—এদের জগৎটিকে প্রায় স্বচ্ছ তারল্যে উদ্ভাসিত ক'রে দ্যায়। এই-তো আমাদের সমাজঃ যেখানে অপরাধ করে একজন, শাস্তিভোগ করে অন্য-কেউ। লেখকের গন্তব্য নিশ্চয় এ থেকে ভিন্ন এক তলে; কিন্তু প্রাথমিক ঐ তথ্যটির প্রতি তাঁর একটি আঙুলের নির্দেশও সম্ভবত বর্তমান—যেমন এসবের মধ্য থেকে সো'আব ও গো'না-র দার্শনিক অর্থসন্ধানও তাঁর একেবারে অগুপ্ত নয়। বস্তুত সামাজিক চাঁদের 'অন্ধকার অংশে'-ই (পৃ. ৯০) লেখক আলো ফেলেছেন, যেখানে চলেছে ক্রমাগত কৃষ্ণ সুতোর সীবন।

আরেফ আলীর অন্তর্অভিযাত্রা এই উপন্যাসের বিষয়। তার ঐ অন্তর্অভিযাত্রা কি বিশ্বাস্যতার চৌকাঠ মাড়িয়ে যায়? আমার তো মনে হয়ঃ আরেফ আলী ও তার মনোলোক-কে আবিষ্কার করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এই আবিষ্কার কিছুতেই অক্ষিত নয়—দেশমৃত্তিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ্রিত, সমাজসত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংলগ্ন। এবং শেষপর্যন্ত

একটি-যে জিজ্ঞাসার বিন্দু জ'লে ওঠে, জলতে থাকে, তা দার্শনিক বটে কিন্তু সমাজোৎসারিতও বটে। বিশ শতাব্দীর উপন্যাসে যে-অনায়কোচিত নায়ক তৈরির ঐতিহ্য বিতত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র যাত্রা বরং সেই পথেই। আরেফ আলী সেই পান্থিকে সম্পূর্ণ মানিয়ে যায়। জীবনের তলহীন-কুলহীন রহস্য-বিস্ময়ের সঙ্গে যাঁরা অচেনা, তাঁদের পক্ষেই বলা সম্ভব যে এ বিশ্বাস্যতার ওপারে। সাধারণের মধ্যে থেকে অসামান্যের আবিষ্কার তো শিল্পীচিত্তের একটি লক্ষণ। এবং সেই বিশ্বাস্যতার সোপানপরম্পরা ওয়ালীউল্লাহ্‌ এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যা অন্তত আমাদের সহজ বুদ্ধির কাছে গ্রাহ্য। এই বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায়ক ঔপন্যাসিক-শোভন শিল্পকুশলতা (artistry)—যে শিল্পকুশলতার অভাবে বাংলাদেশের বিস্তর উপন্যাস স্খলিত বা পতিত হ'য়ে গেছে। পক্ষান্তরে আরেফ আলীর মনোভাবনার স্তরগ্রাম প্রায় জ্যামিতিক প্রস্তাবের মতো অধিষ্ঠিত। কিন্তু জ্যামিতি নয়, আছে বরং জ্যামিতিশাসন: আরেফ আলীর দরদ ও সংবেদন উচ্ছ্বাসী বা সীমাতিক্রমী নয়, যুক্তিগ্রথিত মানবিক রীতিই স্বীকার করেছে বরং। প্রথম হত্যা-রজনীর সেই উম্মাতাল অবস্থা থেকে সুস্থ হ'য়ে উঠে—ঘটনাপরম্পরাকে ক্রমাগত নব-নব নকশায় বিন্যস্ত ক'রে—স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎকে মানসের একটি আধারে ধারণ করতে গিয়ে কেবলি এক অনিদ্র যাতনার শিকার হয়েছে সে। এবং কাদেরের অবিবেকী নির্মমতার ঋণ সে চুকোতে চেয়েছে আপন সদসদ্‌জ্ঞানেরই সাক্ষ্যে—কোনোরকম মহত্ত্বের প্ররোচনায় বা আবেগের তাড়নায় নয়—প্রায় অপ্রাকৃত নৈর্ব্যক্তিকতায়। ব্যক্তিমানসলোকী উপন্যাস ব'লেই এই উপন্যাসের শিল্পকুশলতার যে-স্বাভাবিক দাবি ছিলো, ওয়ালীউল্লাহ্‌কে নিশ্চয় তারই সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। সেই শিল্পকুশলতার কএকটি নজির আমরা পূর্বাহ্ণেই স্থাপন করেছি, এবং জ্ঞাপন করেছি বর্তমান আলোচনার সমগ্র জুড়ে। আরো কিছু:—যেমন সংলাপ এম্নিতেই অত্যল্প, তদুপরি বাচংযত। সংলাপ-যে এই উপন্যাসে লক্ষণীয় রকমে কম, তার কারণ চরিত্রের মানসলোকে আলোক-সম্পাতই লেখকের প্রধান অভীষ্ট,—এবং আরেফ আলীর মতো ভিতরসন্ধানী নায়কের জন্যে প্রয়োজন ছিলো এটাই। সংলাপের ভাষাও—অনন্য কারণে—নির্বহুল ও গূঢ়ভাষী; তা নাহ'লে ঔপন্যাসিক লক্ষ্য হয়তো ভ্রষ্ট হ'তো। মানসতত্ত্ব বিশ্লেষণের

উদাহরণ ভরা এই উপন্যাসে ; আমরা ইতস্তত কিছু উদ্ধার করেছি ; আরো ঃ

১. হাতে যে সামান্য টাকা আসে মায়নাবাবদ, তা প্রায় না ছুঁয়ে বৃদ্ধা মায়ের হাতে দিয়ে আসে। মাকে টাকা দেবার সময় প্রতিবার তার অন্তরে কী একটা ভাব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, চোখে প্রায় পানি আসে। কিন্তু সে-আবেগ অপ্রীতিকর ঠেকে না। অন্তর শান্ত হলে একটা সুখবোধ আসে। তখন তার মনে হয়, জীবনে যেন এই সর্বপ্রথম সে সুখবোধ অনুভব করছে। তবে নবজাত এই সুখবোধকে সরাসরি আলিঙ্গন করতে সাহস হয় না, লাজুক মানুষের মত অজ্ঞাত আগন্তুকটিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। তবু তার সহবাস ভালোই লাগে। একটি হাসিখুশী প্রফুল্লচিত্ত সঙ্গী জুটেছে যেন। [পৃ. ৪৫]

২. কাদের কোন উত্তর দেয় না। যুবক শিক্ষকের প্রশ্নটি নিস্তব্ধ ঘরে কতক্ষণ বিসদৃশভাবে ঝুলে থাকে, তারপর প্রশ্নকারীকেই তা নির্মমভাবে লজ্জা দিতে শুরু করে। সেটি যেন তার প্রশ্ন নয়, তারই উলঙ্গ দেহ। সে-দেহ কড়ি-কাঠ থেকে ঝুলছে। একটি কথা তার কাছে অত্যাশ্চর্য মনে হয়। অনতিদূরে হত্যাকারী সম্পূর্ণভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে সুস্থির হয়ে বসে, কোথাও একটু অসংলগ্নতা নাই। [পৃ. ১৩১]

কএকটি উপমারূপকের ব্যবহার প্রমাণ করে মানসের পাতালপরশা পৃথিবী নির্মাণে নিষ্ণাত লেখক ঃ

১. ওপরে ঝলমলে জ্যোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু হয়তো সে ঠিক বোঝে না। হয়তো একদল সাদা বকরী দেখে, যার শিং দাঁত চোখ কিছুই নাই। [পৃ. ১০]

২. আবার কাদেরের গলা কোত্থেকে ভেসে ওঠে। তখন কালোস্রোতে যুবক শিক্ষক ভাসছে। কাদেরের কণ্ঠ অনেক দূরে অজানা কোন পানির জন্তুর মত লাফিয়ে ওঠে। [পৃ. ৫৬]

৩. বাঁশে আলোয়ান আটকে গেছে। একহাতে মৃত নারীর পা দুটি ধরে সে বিষম বেগে আলোয়ানটা ছাড়িয়ে নেয়। হিংস্র জন্তুর মুখগ্রাস থেকে সে যেন হাত ছিনিয়ে নেয়। সারা বাঁশঝাড় কেঁপে ওঠে। [পৃ. ৫৬]

কখনো আছে শব্দব্যবহারে শানিত শায়ক ঃ

১. সে-রাতে বুজুর্গের সঙ্গে তার প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়। পরদিন সকালে যখন সে ঘরে ফেরে, তার মুখ ফ্যাকাশে, রক্তহীন, কিন্তু চোখে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, অলৌকিক তৃপ্তি-সন্তোষ ভাব।

২. পুলিশ কর্মচারীর চোখ একবার ক্রোধে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যুবক শিক্ষকের দৃষ্টির সামনে সে-ক্রোধ হয়তো অর্থহীন মনে হয় বলে সে নিজেকে সংযত করে। তারপর তার সরকারী ভ্রূকুটিও প্রত্যাবর্তন করে।

[পৃ. ১৮০]

অস্তিত্বপন্থার সাঁৎ´-প্রোক্ত রীতির খুব স্পষ্ট ফলন পড়েছে আরেফ আলীর উপরে। ঈশ্বর-বা সমাজকর্তৃক মানুষের নিয়তি পূর্বনির্ধারিত নয়, স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার আছে, যে-ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার দায়িত্ববোধ। সে তো ঘৃণার্হ, যদি বাইরের চাপের কাছে নতি মানে। তাই কর্মবৃত্তিতেই মুক্তি—স্বদায়িত্ববহ কর্মবৃত্তিতে। আরেফ আলীর যে-সমাধান, তা তাই নিশ্চেষ্ট ও অক্রিয় হ'তে পারে না, অক্রিয় প্রতিরোধেও নয়। শেষ দৃশ্যে তার নিজেকে সমর্পণ তাই আত্মসমর্পণ নয়; সমর্পণ নয়, প্রতিবাদ বরং, নিঃশব্দ প্রতিবাদ। আকস্মিক একটি হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে প'ড়ে যে-দায়িত্ববহন করছিলো আরেফ আলী তা থেকে মুক্তি। এখানেই আর-একটি স্বতঃপ্রশ্ন উত্থিত হয়ঃ আরেফ আলী কি মর্ষকামী? নাঃ মর্ষকামিতার পাড় ঘেঁষে যদিও তার অভিযাত্রা, তবু শান্তিলোভ এখানে আনন্দের সমর্থন পায়নি—বিষাদিত বরং। এখানে সে নিহিতার্থযাত্রী, এখানে সে দায়িত্ববাহী। মর্ষকামিতাকে বহুদূরে ছাড়িয়ে অনেক মহত্তর ভাবাবেগে দেদীপ্য সেঃ আপন পারিপার্শ্বিকে সে এক গোপন খ্রীষ্ট। চালাক, বদমাশ ও মুখোশ-পরা সমাজের বিরুদ্ধে এই আত্মসন্ধিৎসু সত্যিকার মানুষটিকে দাঁড় করিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মানবেরই জয়-গল্প রচনা করেছেন ॥

জীবনানন্দ দাশ ও পূর্বজেরা

জীবনানন্দ দাশের কবিতা আপাতভাবে যতো অভিনবই লাগুক-না কেন, তিনি বাংলা কবিতার প্রবাহবিচ্যুত নন্ কিছুতেই। তাঁর পূর্বজ কবিদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের তুলনাতেই এ কথা স্পষ্ট হবে। বিশেষভাবে তাঁর প্রাথমিক কবিতাই এ উক্তির অবলম্বন; —কিন্তু সেই প্রাথম কবিতা পেরিয়েই তো জীবনানন্দ নূতন হ'য়ে উঠেছিলেন। জীবনানন্দের সঙ্গে তিনজন পূর্বসূরীর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামের—তুলনাই আমরা বিশদভাবে করেছি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরও কিছু প্রভাব তাঁর উপর অর্শেছিলো; তার কথাও প্রসঙ্গত এসেছে; কিন্তু প্রধান প্রভাব ও সাযুজ্য প্রথমোক্ত তিনজনের সঙ্গেই। এই প্রভাবসূত্রেই আর-একবার প্রমাণিত হয় যে, সাহিত্য কোনোদিন উদ্ভিদের মতো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে না, সাহিত্যে রাতারাতি কোনো কিছু সাধিত হয় না—তাকে আসতে হয় ধারাবাহিকতার পথ ধ'রে, উত্তরাধিকারের চেনা রাস্তায়।

জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

অগ্রজ মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়েছিলেন অনুজ মহান কবি জীবনানন্দ দাশের একটি প্রতিভূ-কবিতা: 'মৃত্যুর আগে' (ধূ. পা.); প'ড়ে মন্তব্য করেছিলেন 'চিত্ররূপময়'। অনুজ অনেক লেখক সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ যেমন সূক্ষ্ম ও সংহত মন্তব্য করেছিলেন—এমন-সব মন্তব্য যা ঐ লেখকদের চারিত্র্য-সম্পর্কে আশ্চর্যভাবে লক্ষ্যভেদী, তেমি জীবনানন্দ সম্পর্কেও উক্ত ঐ একটি মাত্র শব্দ নিপুণরকমে অর্থময়। বস্তুত জীবনানন্দ জীবনভোর ক্রমাগত ছবি এঁকে গেছেন শব্দে-শব্দে—এরকম সুপ্রচুর ও অবিরলধারে আর-কোনো বাংলা কবির হাত থেকে শব্দচিত্র নিক্রান্ত

হ'য়ে আসেনি। "ঝরা পালক" থেকে "বেলা অবেলা কালবেলা" পর্যন্ত উপর্যুপরি ফলেছে ছবির পরম্পরা। বস্তুত চিত্র (এবং চিত্রকল্প) অনেক সময় বক্তব্য হ'য়ে উঠেছে কবির। "সাতটি তারার তিমির" থেকে অবশ্য তাঁর চিত্রলতা ক'মে এসেছে, তাঁর চিত্ত যেন স্থূল বাস্তবের হাতে অনেকগুলি রঙ ঝরিয়ে ফেলেছে, শেষ পর্যায়ে ধূসর-ধূসরতর হ'য়ে উঠেছেন তিনি, কিন্তু রঙ-তুলি তাঁকে একেবারে ছেড়ে যায়নি : তখনো মননের মধু আহরণের ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ এক-একটি খণ্ড ছবি অঙ্কিত হ'য়ে গেছে।

জীবনানন্দ তিনটি শ্রদ্ধার্ঘ্য কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে : তিনটি কবিতারই শীর্ষনাম 'রবীন্দ্রনাথ'।[১]

এর মধ্যেকার ছোটো কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্র চারিত্র্য উদ্‌ঘাটন করেছেন কবি : ছোটো, মধুর, রবীন্দ্র-চারিত্র্যজ্ঞাপক এই কবিতাটি বারো পংক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বসূচকতা চমৎকার ব্যক্ত করেছে। এখানকার রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে 'সার্বভৌম' শব্দটির ব্যবহার দেখে মনে প'ড়ে যায় : রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তীতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন।[২] দু'টি কবিতাতেই সময়-পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র কবিতাটিতে যেমন হিমনিমজ্জিত আজকের ইতিহাস ভেদ ক'রে 'মূল্য ফিরে আসে/ নতুন সময় তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন', তেম্নি দীর্ঘকবিতাটিতেও এই সত্যোচ্চারণ সম্ভব হয়েছে : 'অনন্ত আকাশ-বোধে ভ'রে গেলে কালের দু'ফুট মরুভূমি।' দ্বিতীয়োক্ত দীর্ঘ কবিতাটিতে 'নিরাময়' শব্দটির একাধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। অন্যান্য কএকটি কবিতায় আছে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ।

তাঁর গদ্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথকে নিবিড়তর সাহচর্যে উদ্‌ঘাটন করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে যে-প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৩৪৮), উপরের কবিতাদ্বয়ের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে পাঠ করা যেতে পারে। এখানে বলছেন তিনি, '. রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবন-দর্শন ও সময়ের ভিতর দিয়ে সময়াস্তরের গরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ যে-রকম নিরঙ্কুশভাবে গঠন ক'রে গেছেন পৃথিবীর আদিম কালের মহাকবি ও মহাসুধীরাই তা পারতেন; ইদানীং বহু যুগ ধরে পৃথিবীর কোনো দেশই এরকম লোকোত্তর পুরুষকে

ধারণ করেনি।' তৎসত্ত্বেও এ সিদ্ধান্ত করতে হ'লো তাঁকে, 'তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ-ও-ইতিহাস চেতনা একটি নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে। আধুনিকের কবিতা সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে' অগ্রসর হ'য়ে গেছে। আধুনিক প্রচারধর্মী ক্ষণভঙ্গুর কবিতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে তিনি শেষ-পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসছেন, 'ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে-যুগে ঘুরে-ফিরে শেক্সপীয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে' 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়—এমন একটি অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতারই সম্ভব—অন্য কারু কবিতায় নয়।' 'উত্তর-রৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে তিনি একই কথা বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতনভাবে মুক্তির জন্যে যে বিপ্লব চলেছিল কুঁড়ি-পঁচিশ বছর আগে বাংলা কবিতায়—তা এখন একদল জ্যেষ্ঠ কবিদের ভিতরে অবচেতনলোকে বিদ্রোহের মূর্তি ধরেছে, রবি-কাব্যলোকের বিরুদ্ধে ঠিক নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে।' সুতরাং জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করেননি, যেমন করেছিলেন চিত্তরঞ্জন-দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ, বরং তিনি আশ্চর্যভাবে ধরেছিলেন নূতন সময়-স্বভাবের জন্যেই কবিতার শরীর-মন স্বতন্ত্র হ'য়ে যায়—জীবনানন্দ, কবি, নিজেই সেই নূতন কবিতার জনক। কাব্যবিচ্যুত হ'য়ে রবি-কাব্যলোক থেকে স'রে যেতে চাননি তিনি, গিয়েছেন কবিতার অন্তঃসারের ভিতর দিয়েই।

রবীন্দ্রনাথের উপর আলাদা একটি সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন তিনি; তাহ'লেও রবীন্দ্রনাথকে অধিকাংশ সময়ে বিচার করেছেন উত্তরকালিক কবিতার সঙ্গে সংলগ্ন ক'রে, বিচ্ছিন্ন মন্তব্য অথবা।

'আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধে বলছেন, '.. কৃতী আধুনিক কবিদের সামনে তেমন কোনো পরিচ্ছন্ন বিশ্বাসভূমি নেই—উপনিষদের ধর্মে ও বিজ্ঞানের ফলাফলকে অধিগত করেও স্বাভাবিক আত্মিকতার (আধ্যাত্মিকতার)

ক্রমপরিণতির ভূমিতে রবীন্দ্রনাথের নিকটে যা প্রায় কোনো সময়ই (রবীন্দ্রনাথও মাঝে-মাঝে দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন যদিও) খুব দুরধিগম্য ছিল না।' তারপর: 'আধুনিক কবিতা আজ পর্যন্ত ওরকম কোনো বিশ্বাসের প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেনি—কোন ধর্ম বা দর্শনের চলিত মীমাংসাকে একান্তভাবে স্বীকার করে।' রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কবিতা এই আলোয় বিচার্য: রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিশ্বাসভূমিতে স্থিত থাকতে পেরেছেন, জীবনানন্দে সেখানে রূপায়িত দোলাচল-বৃত্তি।

জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি প্রাথম রবীন্দ্রবিধর্মী কবিদের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছিলেন। এই দিক থেকে তাঁর কবিতা বাংলা কবিতার ধারা-স্রোতেরই ফসল—খুব স্বাভাবিক পথে স্রোতে বেড়ে উঠেছে। তাঁর কবিতা উত্তরকালে মোড় ঘুরে গেছে—কিন্তু অলংকাররণনের পথ ধ'রেই অগ্রসর হয়েছে।

"ঝরা পালক"-এ জীবনানন্দ প্রধানত প্রাথম রবীন্দ্রবিধর্মী কবি নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-যতীন্দ্রনাথের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয়েছিলেন, এই সব রবীন্দ্রবিধর্মীদেরই সহবাসে তিনি রবীন্দ্রবিপ্রতীপী এক ভূমিকা দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর 'সাহিত্য-স্বভাব' ও 'সময়-স্বভাব' তখনই আলাদা আলোয় চ'লে গিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধু-পারে' "চিত্রা") ও জীবনানন্দের 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' ("ঝরা পালক") তুলনীয়। দু'টি কবিতাতেই আছে পরিবেশগত সাযুজ্য:

১. পউষ প্রখর শীতে জর্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি:
নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নির্বাণদীপ বাতি।...
পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা,
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ শিহরে নগ্ন শাখা
[সিন্ধু-পারে]

তখন নিভিয়া গেছে মনিদীপ—চাঁদ শুধু খেলে লুকোচুরি—
ঘুমের শিয়রে শুধু ফুটিতেছে—ঝরিতেছে ফুলঝুরি,
স্বপনের কুঁড়ি!
অলস আতুল হাওয়া জানলায় থেকে থেকে ফুঁপায় উদাসী
কাতর নয়ন কার হাহাকারে চাঁদিনীতে জাগে গো উপাসী।
[ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল]৩

২. দূর নদী-পারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি,
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন নিশাচর পাখী।
দেখিনু দুয়ারে রমণীমূরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
[সিন্ধু-পারে]

মোর জানালার পাশে তারে দেখিয়াছি রাতের দুপুরে—
তখন শকুনবধূ যেতেছিল শ্মশানের পারে উড়ে উড়ে।
মেঘের বুরুজ ভেঙে চাঁদ দিয়েছিলো উঁকি
সে কোন্ বালিকা একা অন্তঃপুরে এল অধোমুখী!
[ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল]

জীবনানন্দের কবিতার নায়িকা 'বাসর-রাত্রির বধূ,' রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও সেই বাসর-রাত্রির বিস্তারিত বিবরণ 'অজানিত বধূ'র রূপে বর্ণিত। দু'টি কবিতারই নিশীথ-বর্ণনায় আছে ভয়ঙ্করের আভাস।[৪] কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৃথক হ'য়ে গেছে ওরা ঃ রবীন্দ্রনাথের 'অজানিত বধূ'-র মুখে আভাসিত এক চিরপরিচিতার মুখ[৫]—'সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি,' আর জীবনানন্দের বাসর-রাত্রির বধূর রূপ ঃ

অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল,—নরম লালিমা
জ্বলে গেছে,—নগ্ন হাত,—নাই শাঁখা,—হারায়েছে রুলি,
এলোমেলো কালো চুল খ'সে গেছে খোঁপা তার,—বেণী গেছে খুলি।
সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁশা,—হিম স্তন, —হিম রোমকূপ।

রবীন্দ্রনাথের বাসর-রাত্রির বধূর মুখে অঙ্কিত হ'য়ে গেছে তাঁর জীবন-দেবতার আনন; আর জীবনানন্দের জীবনদেবী এই ভয়ঙ্করীকেই শনাক্ত করা যায়। এই দু'টি কবিতায় দু'জন আলাদা কবির 'সময়-স্বভাব' ও কবি-স্বভাবের পার্থক্যও ধরা পড়েছে।

শুধু তাই নয়, ''ঝরা পালক''-এই জীবনানন্দের কবিতার ঋতু স্থির হ'য়ে গেছে—সেই ঋতু হেমন্তের। তারপর প্রথম থেকে শেষাবধি জীবনানন্দের কবিতার মূল ঋতু হেমন্ত—যা রিক্ততা ও বিনষ্টির প্রতীক; কবি দু-একবার হেমন্তকে পূর্ণতার রূপেও অঙ্কন করেছেন অবশ্য। তাঁর সব কাব্যগ্রন্থ থেকেই এর সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যাক ঃ

১. হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া জুড়ে
বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে।
হয়তো শুনেছ তারে, তার সুর—দুপুর আকাশে
ঝরা পাতা-ভরা মরা দরিয়ার পাশে
বেজেছে ঘুঘুর মুখে—জলডাহুকীর বুকে পউষ নিশায়
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পুবালি হাওয়ায়।
[কবি, ঝ. পা.]

২. হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মত তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?—অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!
[নির্জন স্বাক্ষর, ধূ. পা.]

৩. চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরি :
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নাই আর দেরী,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।
[দুজন, ব. সে.]

৪. তোমার সংকল্প থেকে খ'শে গিয়ে ঢের দূরে চ'লে গেলে তুমি ;
হ'লেও বা হয়ে যেতো এ জীবন ঃ দিনরাত্রির মতো মরুভূমি ;—
তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে এমন স্তব্ধতা
জীবনের নেইকো অন্যথা,
হেমন্তের সহোদর র'য়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন ;
[প্রেম-অপ্রেমের কবিতা, মহা.]

৫. হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ;
এ রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায় ;
মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে
তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে। [নাবিকী, সা. তা. তি.]

৬. হেমন্ত খুব স্থির
সপ্রতিভ ব্যাপ্ত হিরণ-গভীর সমন্ন বলে
ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে
উন্নতি প্রেম কাম্য মনে হলে
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক ভাবি ;
[শতাব্দী, বে. অ. কা.]

জীবনানন্দের মৌল ঋতু হেমন্ত ; রবীন্দ্রনাথের বর্ষা ও বসন্ত। লক্ষণীয় : জীবনানন্দের কবিতায় কবিপ্রসিদ্ধ ও রবীন্দ্র-আচরিত এই দুই ঋতুর সাক্ষাৎ ক্বচিৎ পাওয়া যায়।[৩]

"ঝরা পালক"-এ রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে গেলেও কবির "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর তুলনা অপ্রতিরোধ্য। উভয় কবিতার নামের মধ্যে যেমন, তেম্নি তার বিষয়ের মধ্যেও আছে গোধূলির ছায়ার সঞ্চার। কবিহৃদয়ের অস্ফুট ভাব যেমন "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এ রূপায়িত, তেম্নি হৃদয়ের গোধূলিলোক "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র জগৎ নির্মাণ করেছে। বিষাদ উভয় কাব্যেরই মৌল স্বর। উভয় কাব্যেই আছে পার্থিবতার ঊর্ধ্বে উড্ডয়ন :

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার। [গান আরম্ভ, সন্ধ্যাসঙ্গীত]

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয় বেদনা জমে,—স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই। [স্বপ্নের হাতে, ধূ. পা.]

"সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি' কবিতাটির সঙ্গে "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র 'বোধ' কবিতার তুলনা অনিবার্য। দু'একটি অংশ উদ্ধার করা যাক :

১. আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোনো এক বোধ কাজ করে।
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ;

আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;

[বোধ, ধূ. পা.]

ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার ?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই—অবিরাম অনিবার
ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার ?

[হৃদয়ের গীতিধ্বনি, সন্ধ্যা.]

২, আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে ঃ
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !

[বোধ, ধূ, পা.]

তবে থাম থাম ওরে প্রাণ,
পারিনে শুনিতে আর একই গান একই গান ।

[হৃদয়ের গীতিধ্বনি, সন্ধ্যা.]

"সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর শিল্পকুশলতারও কিছু-কিছু স্বাক্ষর পড়েছে "ধূসর পাণ্ডুলিপি"তে। যেমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি—"সন্ধ্যাসঙ্গীত" থেকে ঃ

১. তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত দহিত তারে, দহিত কেবল।

[তারকার আত্মহত্যা]

২. তবে কেন হেন ম্লান মুখ
তবে কেন হেন দীন বেশ ?
তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে
এ হৃদয়ে করিস প্রবেশ ?

[আঁধারে নৈরাশ্য]

৩. একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি ?
বুঝি চেয়েছিল।
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি ?
বুঝি কেঁদেছিল।
বুঝি ভেবেছিল—

লয়ে যাই—নিতান্ত কি একেলা কাঁদিবে?
তাই বুঝি ভেবেছিল।
তাই চেয়েছিল।

[পরিত্যক্ত]

৪. গাহিতেছে একই গান একই গান একই গান
পারিনে শুনিতে আর একই গান একই গান।

[হৃদয়ের গীতিধ্বনি]

• এই বেলা প্রাণপণ কর।
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিস নে আর।
যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর—
সম্মুখে অসীম পারাবার,
সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ।

[পরাজয়-সঙ্গীত]

"ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকে ঃ

১. আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত

যে নক্ষত্র ম'রে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে—৭ [নির্জন স্বাক্ষর]

২. আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মত হয়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিম্বা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি?—তাহাদের মন
আমার মনের মত নাকি?—
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী।

[বোধ]

৩. পথে পথে—থেমে—থেমে—থেমে
খুঁজিব কি তারে [পিপাসার গান]

৪. একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা।
এক রাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
একদিন—এক রাত; তারপর প্রেম গেছে চ'লে—
[প্রেম]

উভয় কবিতাগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় লক্ষণীয় যুক্তবর্ণের বিরল ব্যবহার; এর ফলে হৃদয়স্থ বিষাদলোকের আবহ ফোটানো সহজসাধ্য হয়েছে। তেমি লক্ষণীয় উভয় কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় অসমান অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার—যা ঐ অব্যক্ত হৃদয়ী আবেগের প্রস্ফুটনে সহায়ক ।।

১. এর মধ্যে যেটি দীর্ঘ সেটি বেরিয়েছিলো 'পূর্বাশা' রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যায়।

২. জীবনানন্দ তাঁর একটি প্রবন্ধেও 'কবি সার্বভৌম' কথাটি ব্যবহার করেছেন।
[উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, ক. ক.]

৩. এই পংক্তিটিও রবীন্দ্ররচনা থেকে আহৃত।

৪. উভয় কবিতাই এডগার এ্যালান পো-র কবিতার স্মারক।

৫. রবীন্দ্রনাথের 'অজানিত বধূ'-র রহস্যোন্মোচনে ধরা পড়ে 'পরিচিত মুখ,' আর সুধীন্দ্রনাথের 'সিনেমায়' ("ক্রন্দসী") কবিতার সিনেমাশেষের ভিড়ের ভিতরে হঠাৎ দেখা দিয়ে চিরতরে মিলায় জন্ম-জন্মান্তরের প্রেয়সী। প্রাপ্তি ও ব্যর্থতার এই দুই বিপরীত চিত্র আসলে দুই কালের দৃষ্টির পৃথকতা।

৬. দু-ঋতুর দুটি আকস্মিক উদাহরণ:

ক. শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে
চোখ আর চায় না ঘুমাতে;
জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয়; [পাখিরা, ধূ. পা.]

খ. এই জল ভালো লাগে;—বৃষ্টির রূপালী জল কতদিন এসে
ধুয়েছে আমার দেহ—বুলায়ে নিয়েছে চুল—চোখের উপরে
শান্ত স্নিগ্ধ হাত রেখে কত খেলিয়াছে, আবেগের ভরে
ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চলে গেছে কুমারীর মতো ভালোবেসে,
[এই জল ভালো লাগে, রূ. বা.]

৭. "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতায় একটি নক্ষত্রের মৃত্যুর বর্ণনা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

জীবনানন্দ ও মোহিতলাল

তাঁর প্রথম পর্যায়ে, জীবনানন্দ দাশের উপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলে-ছিলেন, নজরুল ইসলাম বাদে, মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) প্রভাবচ্ছায়া অংশত অনুভূত হয়। লক্ষণীয় যে এঁরা সবাই—নজরুল, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও এঁদের চেয়ে ন্যূন আকারে সত্যেন্দ্রনাথ—ছিলেন প্রথম রবীন্দ্রবিধর্মী কবি, রবিমণ্ডলের বাইরে যাবার চেষ্টা প্রথম এঁদের মধ্যেই রূপ পেয়েছিলো। তিরিশের যে-কবি রবীন্দ্রলোক ভেঙে বেরিয়ে এসে, কিংবা সেই লোক-কে একেবারে অস্বীকার ক'রে, নূতন কবিতা সৃজন করলেন, তাঁর কবিতায় উপর্যুক্তদের ছায়াপাত—সুতরাং—অত্যন্ত তাৎপর্যময়। সত্য, জীবনানন্দের 'পতিতা'-র (ঝ. পা.) উপর নজরুলের 'বারাঙ্গনা'রই "সাম্যবাদী" মুখ্য আলো এসে পড়েছে, তত্রাচ সত্যেন্দ্রনাথের 'কুস্থানাদপি' ("বেণু ও বীণা") ও যতীন্দ্রনাথের 'বারনারী'-র ("মরীচিকা") সঙ্গে তুলনা একেবারে নিরর্থক নয়;—অন্তত বিষয়-সাযুজ্যের মানবমুক্তির সেই কালটিকে চিহ্নিত ক'রে নেওয়া যায়। আর জীবনানন্দের 'দেশবন্ধু' (ঝ. পা.) কবিতার ছন্দোপ্রকরণের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'গান্ধিজী' ও মোহিতলালের 'প্রশ্ন' ("হেমন্ত-গোধূলি") ইত্যাদি কবিতার সাযুজ্য আত্মপ্রকাশিত। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবচ্ছায়া দ্রষ্টব্য জীবনানন্দের 'সাগর-বলাকা,' 'বনের চাতক—মনের চাতক', 'ছায়া-প্রিয়া', 'মিশর', 'মরুবালু' প্রভৃতি কবিতায়। সত্যেন্দ্র-প্রভাবী কবিতা থেকে কএকটি অংশ উদ্ধার ক'রে দিই:

১. বাস। তোমার সাত সাগরের ঘূর্ণি হাওয়ার বুকে।
ফুটছে ভাষা কেউটে-ঢেউয়ের ফেনার ফণা ঠুকে'।
প্রয়াণ তোমার প্রবালদ্বীপে, পলার মালা গলে
বরুণ-রাণী ফিরছে যেথা,—মুক্তা-প্রদীপ জ্বলে।
যেথায় মৌন মীন-কুমারীর শঙ্খ ওঠে ফুঁকে'।

[সাগর-বলাকা, ঝ. পা.]

২. সাসি ঘরের উঠছে বেজে
উঠছে কেঁপে পর্দ্দা।
বাতাস আজি ঘুমিয়ে আছে
জলডাহুকের বুকের কাছে
এ কোন বাঁশী সাসি বাজায়

ঐ কোন হাওয়া ফর্দা।
দেয় কাঁপিয়ে পর্দা। [ছায়াপ্রিয়া, ঝ পা]

৩. নীলার ঘোলা জলের দোলায় লাফায় কালো সাপ।
কুমীরগুলোর খুলির খিলান,—করাত-দাঁতের খাপ
উর্দ্ধমুখে রৌদ্র পোহায়; ঘুম পাড়ানির ঘুম
হানছে আঘাত,—আকাশ বাতাস হচ্ছে যেন গুম।
ঘুমের থেকে উপচে পড়ে মৃতের মনস্তাপ। [মিশর, ঝ, পা.]

জীবনানন্দের 'বনের চাতক—মনের চাতক' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের 'কুহু ও কেকা' কবিতার স্মারক। সত্যেন্দ্রপ্রভাবী জীবনানন্দের উপর্যুক্ত কবিতাগুলি সবই স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। আত্মকণ্ঠ আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে জীবনানন্দ অবলম্বন করেছিলেন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। উপান্ত্যজীবনে স্বরবৃত্ত ছন্দ যখন ফিরে এসেছিলো, তখন তার সঙ্গে প্রাথমিক স্বরবৃত্ত ছন্দের বিরাট ব্যবধি দেখা দিয়েছিলো;—এ এই প্রমাণ করে যে বক্তব্যই ছন্দকে রূপান্তরিত ক'রে ছায় খুব ভিতর থেকে। উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব শূন্যে এসে পৌঁছেছে—কেবল প্রাকৃত শব্দব্যবহারে বাকব্যবহারে জীবনানন্দ পূর্বজ কবির ঋণ ব'য়ে গেছেন, ঋদ্ধ করেছেন আরো। আর যতীন্দ্রনাথের প্রভাব হয়তো র'য়ে গেছে প্রাথমিক জীবনানন্দের অত্যধিক মরুচারিতায়।

প্রাথমিক জীবনানন্দে ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছে মোহিতলালের শারীররতি, এই একবারই, আর কোনো সময় জীবনানন্দ অমনভাবে আত্মসমর্পণ করেননি তার কাছে (হয়তো তার কারণঃ তাঁর দৃষ্টি ও ভাষার পরবর্তী বিমূর্ততা)। দুটি উদ্ধৃতাংশঃ

১. হয়তো তাহারা মদঘূর্ণনে নাচিত কাঞ্চীবাঁধন খুলে'
এম্নি কোন-এক চাঁদের আলোয়—মরু-'ওয়েসিসে' তরুর মূলে।
বীর যুবাদল শত্রুর সনে বহুদিন ব্যাপী রণের শেষে
এম্নি কোন-এক চাঁদনি বেলায় দাঁড়াত নগরী-তোরণে এসে।
কুমারীর ভিড় আসিত ছুটিয়া, প্রণয়ীর গ্রীবা জড়ায়ে নিয়া
হেঁটে যেত তারা জোড়ায় জোড়ায় ছায়াবীথিকার পথটি দিয়া।
[চাঁদিনীতে, ঝ. পা.]

২. এসেছে নাগর,—যামিনীর আজ জাগর রঙীন আঁখি—
কুয়াশার দিনে কাঁচুলি বাঁধিয়া কুচ রেখেছিল ঢাকি,
আজিকে কাঞ্চী যেতেছে খুলিয়া,—মদঘূর্ণনে হায়।
নিশীথের স্বেদ সীধুধারা আজ ঝরিছে দক্ষিণায়।
[দক্ষিণা, ঝ. পা.]

এ-সব উচ্চারণ মোহিতলাল-নজরুলের ইন্দ্রিয়বেদী কবিতার সান্দ্র ছায়ায় আচ্ছন্ন। অল্পকাল পরেই এই পূর্বজ ছায়া সর্বাংশে সরিয়ে-হঠিয়ে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ। উদ্ধৃত কবিতার অভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত দুটি পরবর্তী কবিতার অংশ পাশাপাশি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে :

১. চারিপাশে বনের বিস্ময়
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন,
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে। [ক্যাম্পে, ধূ. পা.]

২. আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
[পাখিরা, ধূ. পা.]

জীবনানন্দের আত্মোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাকব্যবহৃত মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্তে পরিবর্তিত হ'য়ে যায়।

প্রাথম জীবনানন্দে আরো প্রভাব ফেলেছে মোহিতলালের দূরপিপাসা ও জীবনোল্লাস। কএকটি উদাহরণ :

১. স্বপন সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা করে'।
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হ'লো না আমার সাধা,—
পায় পায় নাচে জিঞ্জির হায়,—পথে পথে ধায় ধাঁধা।
নিমিষে পাসরি' এই বসুধার নিয়তি মানার বাধা
সারাটি জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভরে।
[আমি কবি—সেই কবি, ঝ. পা.]

২. জীবন-পথের তাতার দস্যুগুলি
হুল্লোড় তুলি' উড়ায়ে দিয়েছে ধূলি
মোর গবাক্ষে কবে!

কণ্ঠ-বাজের আওয়াজ তাদের বেজেছে স্বচ্ছ নভে !
আতুর নিদ্রা চকিতে গিয়েছে ভেঙে
সারাটি নিশীথ খুন-রোশনাই প্রদীপে মনটি রেঙে।
একাকী রয়েছি বসি'
নিরালা গগনে কখন নিভেছে শশী
পাইনি যে তাহা টের।
—দূর দিগন্তে চ'লে গেছে কোথা খুশরোজী মুসাফের।
কোন সুদূরের তুরাণী প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার ফিঙ্গিরে কেঁদে মরে।১
[জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, স্ব. পা.]

৩. মসজেদ-সরাই-শরাব
ফুরায় না তৃষা মোর,—জুড়ায় না কলেজার তাপ।
[একদিন খুঁজেছিনু যারে, স্ব. পা.]

৪. আমি গো লালিমা,—গোধূলির সীমা,—বাতাসের 'লালা' ফুল।
দুই নিমিষের তরে আমি জ্বালি
নীল আকাশের গোলাপী দেয়ালি !
আমি খুশরোজী,—আমি গো খেয়ালী
চঞ্চল,—চুলবুল। [যে-কামনা নিয়ে, স্ব. পা.]

তাঁর প্রথম পর্বে মোলিতলালের প্রতিধ্বনি ও অনুরণন ধ্বনিত রণিত হয়েছে বারংবার। কএকটি দ্বি-গুচ্ছ ঃ

১. তাতার-দস্যু ভেঙে ফেলে যেন ঘর-দুয়ার।
[হাফিজের অনুসরণে, স্বপনপসারী ঃ মোহিতলাল]
জীবন-পথের তাতার-দস্যুগুলি
হল্লোড় তুলি উড়ায়ে গিয়েছে ধূলি।
[জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, স্ব. পা.]

২. কালো পশমের বোরকা ছিঁড়িয়া দেখা দিল মোর সবজা হুরী—
নাকে মুখে মোর পিয়ালা পিয়ায়, পুরানো সে গান হাওয়ার পুরি'।
[বেদুঈন,২ স্বপনপসারী]
পিয়ালা চুমিয়া পিয়াই গো রাঙা
পিয়ালার মধু,—তুলি রাত-জাগা
হোরীর হা রা রা সাড়া।
[যে-কামনা নিয়ে, স্ব. পা.]

৬. জ্যোৎস্না-জরীন ঘাসের ফরাস—ছায়ারা সব কোণ খুঁজে'
'সরো'র সারির তলায় জোটে, নিঝুম রাতির মন বুঝে'।

[ইরানী, স্বপন-পসারী]

হয়তো সেদিনও ডেকেছে পাপিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া সরোর শাখে
হয়তো সেদিনও পাড়ার নাগরী ফিরেছি এমনি গাগরী কাঁখে।

[চাঁদিনীতে, স্ব. পা]

জীবনানন্দ আরবি ফারসি শব্দব্যবহারে নজরুলের চেয়ে মোহিতলালের কাছেই বেশী ঋণী। জীবনানন্দের ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের একটি বর্ণানুক্রমিক সঙ্কলিতা :

আখের* ; আশেক* ; ইয়োসোফ* ; ইবলিশ * ; ঈদ* কলেজা* ; কাফন* ; কাফের* ; কারবালা* ; খেয়াল * ' খারাবী* ; খুন* ; খুনসুড়ি* ; খুন রোশনাই ; খুশরোজী*;

খোশ* ; গজল-এলাহি* ; গুলজারিয়া[৩] ; জমিন[৪] ; জর্দা ; জিঞ্জির* ; জিন-সর্দার* ; জৌলুস* ; তখত* ; তালাস * ; তাবিজ ; দরিয়া ; দরাজ* ; দস্তুর ; দাস্তানা ; দরদ* ; দিওয়ানা ; দিল* ; দিলদার *[৫] ; দিলওয়ার * ; নার্গিস* ; পশমিনা* ; পানসী ; পায়েলা* ; পাঁয়জোর ; পিয়ালা * ; পুছে ; বহিন ; বুরুজ* ; বেহুঁশ* ; বান্দা* ; বাঁদী* ' মসজেদ* ; ময়দান* ; মস্তানা* ; মশগুল* ; মশলাদার ; মেজাজ ; মেহেরাব* ; মোতিয়া ; মুসল্লা* ; মুসাফের* ; রবাব * ; রেওয়াজ ; রোজা * ; রোশনাই* ; শফর ; শরাব; শরাবখানা*[৬] ; শুড়িখানা ; শাহদারা* ; শের* ; শাহানশাহা* ; শামিয়ানা* ; সরাই* ; সরাইখানা* ; সাকী * ; সারেঙ*[৭]; সোনেলা *[৮] ; সোয়ার* ; হাওয়া*।

উপরের তারকা-চিহ্নিত শব্দগুলি মোহিতলাল মজুমদার-ব্যবহৃত। সত্যেন্দ্রনাথ এর মাত্র কএকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন 'ঈদ,' 'খুশরোজী', 'দরিয়া', 'মশগুল,' 'মোতিয়া', 'শের', প্রভৃতি)। নজরুল-প্রযুক্ত শব্দ (এই তালিকা থেকে) হয়তো আর-একটু বেশি। কিন্তু এ প্রমাণ করছে জীবনানন্দ আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে মোহিতলালের দ্বারাই প্রধানত উদ্বোধিত হয়েছিলেন। জীবনানন্দের আরবি-ফারসি শব্দগুচ্ছের এই তালিকা "ঝরা পালক" থেকে আহৃত ; 'ময়দান,' 'হাওয়া,' 'সোনেলা',

'জমিন' প্রভৃতি মাত্র কিছু শব্দ তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকেই আরবি-ফারসি শব্দব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে ক'মে যায়, কেননা ততোদিনে তিনি স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারের যে রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিলো সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের হাতে, তা কিছুকাল বাহিত হ'য়ে চলে জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের লেখনীতে। ভিন্ন অনুষঙ্গ ও আবহ রচনার তাগিদে এইসব আরব্য-পারস্য সন্দীপন যেমন দরকার হয়েছিলো এক-সময়, তেমি দেশজ চিত্রাঙ্কনেও এ প্রয়োজনীয় হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। অজস্র আরবি-ফারসি শব্দ আমাদের দৈশিক বাকব্যবহারে মিশেছে। বাংলা গল্প-উপন্যাসের মতো বাংলা কবিতা যখন সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের ছন্দ আয়ত্ত করতে শিখলো, তখন সে দেশজ শব্দাবলিও প্রয়োগ করতে থাকে ব্যাপকভাবে ঃ কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র-বুদ্ধদেব বসু, গদ্যে অচিন্ত্যকুমার-নজরুল-মনীশ ঘটক প্রমুখ। অতঃপর মোহিতলালের আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারের একটি চয়নিকা নির্মাণ করা যাক ঃ

> আওরাত, আওয়াজ, আকবর, আখের, আখেরি-জমানা, আফসোস, আবরু, আরজ, আরজমন্দ, আল্লা, আশেক, আবরু, আবেহায়াত, ইজ্জত, ইবলিশ, ইল্লত, ইয়োসোফ, ইশারা, এনসান, ওক্ত, কওসর, কমবক্ত, কমজাত, কলিজা, কাফন, কাফের, কেয়ামত, কিনারা, কুদরত, খুন, খুন-খোশরোজ, খোদা, খোশহাল, খোশনাম, গজব, গজল-ইলাহী, গর্দান, গুণা, গুল, গুলশান, গুলজার, গুলবাগ, গুলেস্তান, গাফুর, গোলামখানা, চেরাগ, জান্নাত, জমিন, জবান, জবাব, জলুস, জাহান্নাম, জিন, জিন-সর্দার, জিঞ্জির, জোয়ান, জরীন, জাম, তখত, তখত-তাউস, তহুরা, তাজ, তাজ্জব, তাঞ্জাম, তামিল, তামাশা, দরদ, দরিয়া, দরবার, দুনিয়া, দুষমন, দুষমনি, দিলদার, দিল্লগী, দিলাওয়ার, দোজোখ, দোস্তি, নজর, নওরোজ, নওবৎ (ও নহবত), নওশা, নসীব, নার, নার্গিস, নিশানা, নুর, পর্দা, পয়মাল, পসরা, পশমিনা, পায়েলা, পিরাহান, পিয়ারী, ফেরেস্তা, বখরা, বাঁদী, বান্দা, বাগিচা, বাদশাহী, বেদরদী, বেল্লিক, বেঈমান, বেতমিজ, বেহোঁস, বিলকুল, বুরুজ, বুজদেল, বাহার, বোখার, বোস্তান,

মসনদ. মঞ্জিল, মশগুল, মজলিশ, মসজেদ, ময়দান, মস্তানা, মগরেব, মাতোয়ারা, মাফ, মুর্দা, মুসল্লা, মুসাফের, মুলুক, মেহেরবান, মেহেরাব, মিনার, রবাব, রহিমর-রহমান, রোজা, রোজ- কেয়ামত, রোশনাই, রুহ, লড়াই, লহমা, লালা, লোহু, লোকশান, শরবত, শরাব, শমশের, শয়তান, শামাদান, শাহানশাহা, শাব্বাস, শামিয়ানা, শাহদারা, শিরিন, সওদা, সওয়াব, সহেলি, সমঝদার, সিরাজী, সোনেলা, হরদম, হয়রান, হাওদা, হাওয়া, হাল, হামাম, হায়াত, হুকুম, হুঁশ।

শব্দগুচ্ছ সমাহৃত হ'লো মোহিতলাল মজুমদারের সমগ্র কাব্যসংগ্রহ থেকে। এইসব কাব্যের কএকটি বিশেষ কবিতাই আরবি-ফারসি শব্দঋদ্ধ : 'দিলদার,' 'নাদিরশাহের জাগরণ,' 'নাদির শাহের শেষ', 'ইরানী,' 'শেষশয্যায় নুরজাহান,' 'বেদুঈন', 'গান', ("স্বপনপসারী" , 'নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর' ("বিস্মরণী"), 'শরাবখানা সুফী কবিতা', 'গজল',/জালালউদ্দিন রুমি, 'ফার্সি-ফরাস'/ফার্সির ইংরেজী থেকে, 'রুবাই গুচ্ছ' ("হেমন্ত-গোধূলি") ও 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরঙ্গজীব'। লক্ষণীয় যে মোহিতলাল আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন ইতিহাসের পটভূমি রচনায় কিংবা অনুবাদ-কাব্যে; আর জীবনানন্দ কাল্পনিক দূর-পিপাসায়, ইতিহাস-ভূগোলের দূরস্মৃতি দূরবিহার নির্মাণে।

যে-যৌগিক শব্দব্যবহারে নজরুল ইসলাম অসাধারণ বিশিষ্ট, মোহিত-লালে জীবনানন্দে আছে তারও প্রয়োগ। জীবনানন্দ-ব্যবহৃত যৌগিক শব্দাবলি :

দাদুরী-কাঁদানো, শাঙন-দরিয়া, স্বপ্ন-ময়ূর, মানব-দেব, দাব-মরুভূমি, জৌলুশ-রাঙা, ছলা-মরীচিকা, মরণ-সাহারা, কেউটে-ঢেউ, অতীত-আখের, ফেনা-সই, জলধি-পাখী, জল-বেদিয়া, উর্মি-নাগবালা, ছায়া-বৌ, হৃদয়-মাস্তুল, আকাশ-মরু, সাগর-মরু, জীবন-বীণা, আকাশ-শুঁড়িখানা, আগুন-ছড়ি, নাশপাতি-গাল, কপোত-ব্যথা, মেঘ-বৌ, পৌষ-নীরবতা, শকুন-বধূ, ঘুম কুমারী, ময়ূর-নীলিমা, কামনা-সাহারা, করাত-দাঁত, হিমানী-পাথার, নীহার-নীল, প্রেত-প্রাণ, চাঁদিনী-শরাব, শিশির-শীর্ণা, আকাশ-শিথান, সৃষ্টি-বধূ, প্রেত-চোখ, প্রেত-জ্যোৎস্না, ভ্রূণ-ভ্রষ্ট, গরল-মদির, মায়া-

ভুজঙ্গিনী, নভো-নীল, বীর-শের, স্পন্দন-পাগল, সাগর-শকুন্ত, সিন্ধু-বেদুঈন, দিল-পিয়ালা, স্বপন-ফানুষ, রাত্রি-কুমারিকা, আঁধার-সাগর, আঁধার-সাহারা, নিশি-মরু, প্রেম-খঞ্জর, করুণা-প্রদীপ, চিতা-ফণা, বিধবা-নয়ন, অশ্রু-অমানিশা, মশলা-দরাজ, নটকান-রাঙা, খুন-রোশনাই, সাগর-বলাকা, প্রেত-চাঁদ, কপাল-কবর, মুসাফের-হিয়া, জীবন-রবাব, দূর-সোহাগী, ঘর-বিবাগী।

মোহিতলাল ব্যবহৃত যৌগিক শব্দপুঞ্জ ঃ

মর্ত-মরু, কেশ-তপোবন, অধর-গোলাপ-কানন, জ্যোৎস্না-চিকন (২), বাসনা-ব্যথা, কুহেলি-নিচোল, মানস-মরাল (২), রেশমী-রঙীন, আলোক-তুফান, পরাগ-উত্তরীয়, চাঁদিনী-চাঁদোয়া, জ্যোৎস্না-রূপসী, মেঘ-গুণ্ঠন, পীরিতি-মধু, দিল-পিয়ারা, আগুন-ফুল, মানুষ-মেষ, প্রাণ-বাজপাখী, খুন-খোশরোজ[৯], নর-শির-পর্বত, কস্তুরী-কালো, মরু-সন্তান, কুমারী-উষা, আঁধার-বিলাসী[১০], রূপ-বৃন্দাবন, অলখ্-চন্দ্রালোক[১১], ফাগুন-ফুল, আগুন-খেলা, দিল-ভোলা, নটকান রাঙা[১২], প্রেম-কোকনদ, বাদশা-বাড়ী, রৌদ্র-শরাব[১৩], অলখ-সেতার, আগুন-গান, আশমান-গাঙ, গোলাপ-আনন, গোলাপ-গাল, স্মৃতি-মেঘ, শিশির-সন্ধ্যা[১৪], অলোক-আলোক-আঁখর, শিশির-স্নিগ্ধ, জীবন-সায়র, নিশীথ-নীরব, স্বরগ-সুধা, স্বপন-কারা, রূপ-হর্ম্য, দেহ-পঞ্চবটি, দেহ-দ্রুম, হৃদয়-বাঁশরী, চিত্ত কুহর, সোমসূর্য-রথচক্র, পরিণয়-যূপ, মৃত্যু-নীল, মর্ম-মধু, চিত্ত-চূড়া, বাসনা-বহ্নি, তিমির-দুকূল, উল্কা-হার, জন্ম-পারাবার, অন্ধ-আরতি, ময়ূখ-হার, মর্মর-মসৃণ, দৃষ্টি-চুমা, স্মরণ-শিখা, দুপুর-নিঝুম, আলোক-দুকূল, গোধূলি-ধূসর, পাপ-ভীরু, সুখ-লম্পট, শৈল-চুচুক, জ্যোৎস্না-স্নেহ, চাহনি-বাণ, মরণ-নদী, জ্যোৎস্না-গোধূলি, স্মৃতি-বিষ[১৫], স্বর্গ-পথিক, পল্লব-পারাবার, আকাশ-মরু[১৬], অভিজ্ঞান-তারকা-অঙ্গুরী, কুয়াশা-রঙীন, জীবন-যমুনা, ছায়া-তরু, প্রাণ-প্রবাহিনী, বুদ্বুদ-বিলাস, অশ্রু-শিশির, রৌদ্র-মদিরা, তুমি-মদ।

জীবনানন্দের যৌগিক শব্দগুচ্ছ "ঝরা পালক" থেকে আহৃত; মোহিতলালের যৌগিক শব্দব্যবহার ক্রমশ শমিত হ'য়ে এসেছে; কিন্তু একেবারে অবলেশ হ'য়ে যায়নি কখনো। জীবনানন্দের যৌগিক শব্দ "ঝরা পালক"-উত্তর কাব্যে প্রায় প্রযুক্তই হয়নি আর (প্রায় গোয়েন্দা লাগিয়ে খুঁজে বের করতে হয় 'হিম-চোখ', 'তিমির-বিলাসী', 'তিমির-বিনাশী' ইত্যাদি শব্দ)। যৌগিক শব্দে যে-অর্থঘনিমা ও বাচংযম দ্রষ্টব্য মোহিতলালের কাব্যচারিত্র্য ছিলো তারই অনুরূপ, আর জীবনানন্দের বিস্তারিত ও বহুলাঙ্গ কবিতার প্রয়োজনেই পরে তাঁকে বর্জন করতে হয়েছিলো যৌগিক শব্দভাণ্ডার। জীবনানন্দ-যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে তা করেছিলেন তা নয়, কিন্তু যে-কবিস্বভাব কবির চারিত্র্য নির্মাণ করে, তা-ই তার নিজের নিয়মে কবিতার প্রকরণেরও ঈশ্বর। বস্তুত উত্তরকালে জীবনানন্দ কএকটি যৌগিক শব্দে যে-উপমা বা প্রতিমা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাকেই বের ক'রে এনে শিথিল সাজিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়। মোহিতলালের 'রৌদ্র-মদিরা' বা 'রৌদ্র-শরাব' যৌগিক শব্দ জীবনানন্দে কীভাবে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়েছিলো তার সাক্ষ্য ধ'রে রেখেছে জীবনানন্দের একটি অগ্রন্থিত কবিতা 'জীবন-সঙ্গীত'। মোহিতলালের মতোই মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনের গান রণিত হয়েছে এই কবিতায়; এখানে 'রৌদ্র-মদিরা' বা 'রৌদ্র-শরাব' শব্দটিকে ভেঙে একটি দীঘল ইমেজে পুষ্পিত ক'রে তুলেছেন তিনি—এবং ফলত তা একটি নূতন স্বাদের সূচনা করে। অন্য একটি কবিতা: 'ডালিম-ফুলের মতো ঠোঁট যার—রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,/চুল যার শাঙনের মেঘ,—আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙীন'—এই উপমা-চতুষ্টয়কে চারটি যৌগিক-শব্দে সংকুচিত করা যেতে পারতো: ডালিম-ঠোঁট, আপেল-গাল, মেঘ-কেশ, গোধূলি-আঁখি। এই কবিতাটি, 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' "ঝরা পালক"-এরই অন্তর্ভুক্ত, এবং তখনো জীবনানন্দ নজরুল-মোহিতলালের মতো যৌগিক শব্দব্রতে সঞ্চারী, কিন্তু উত্তরকালে তাঁর যৌগিক শব্দের স্থান ক'রে নিয়েছিলো উপমা ও উৎপ্রেক্ষা, চিত্র ও চিত্রকল্প।

প্রকরণনিষ্ঠ মোহিতলাল তাঁর একটি কবিতায় স্পেনসরীয় স্তবক নির্মাণ করেছিলেন; জীবনানন্দও তাঁর দুটি কবিতায় ঐ ছন্দ অনুসরণ করেন। সম্ভবত কবির ভিতরমহলে তখনো চলছিলো মোহিতলালের অনুবৃত্তি:

সেই এক মূর্তি-নারী।—গৃহলক্ষ্মী, জায়া ও জননী—
সেই ভোগসুখ-তরে সেই নিত্য আত্মবলিদান।
দেহের মৃত্তিকা দলি' রাসমঞ্চ গড়িছে তেমনি,
শিশুরে পিয়ায় সুধা, রতি-বিষে পুরুষ অজ্ঞান।
হৃদয়ের ক্ষুধা তার মানে না যে ন্যায়ের বিধান,
যত দুঃখ তত সুখ, নাই পুণ্য-পাপের ভাবনা;
সর্ব্বত্যাগী অন্ধ কাম—সেই তার প্রেমের প্রমাণ।
নিঃশেষে বিলায়ে দেহ হয় তার স্নেহ-উদ্দীপনা,
যে তার সর্বস্ব হরে—সেই পতি, তারি কণ্ঠে সুচির-লগনা।

['নারীস্তোত্র,' স্মরগরল]

চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর—
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান।
ফসল উঠিছে ফ'লে,—রসে রসে ভরিছে শিকড়,
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ।
সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীর ছিলো যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো' আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে।
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ—
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে।
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে—তার সাথে সেও আছে জেগে।

[জীবন, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র' উনিশ স্তবকে সমাপ্ত; জীবনানন্দের স্পেনসরীয় স্তবকে নির্মিত কবিতাযুগ 'জীবন' চৌত্রিশ স্তবকে ও 'অনেক আকাশ' বাইশ স্তবকে সমাপ্ত। জীবনানন্দের 'প্রেম' দশ পংক্তির স্তবকে গঠিত, তেরোটি স্তবকে সম্পূর্ণ। এরকম দীর্ঘ স্তবকবন্ধে মোহিতলালের বেশ-কিছু কবিতা আছে: 'বুদ্ধ' ("স্মরগরল") ছয় পংক্তির তেইশ স্তবকে, 'পান্থ' ("বিস্মরণী" সাত পংক্তির আটাশ স্তবকে (এটি স্পেনসরীয় স্তবক-সজ্জার একটি রূপান্তর; মিলসজ্জা: ক খ ক খ ক খ খ—শেষ পংক্তিটি অন্য পংক্তির চেয়ে দীর্ঘতর), 'কালাপাহাড়' ('বিস্মরণী") সাত পংক্তির বারো স্তবকে, 'সত্যেন্দ্র-বিয়োগে' ("বিস্মরণী") ছয় পংক্তির নয় স্তবকে, 'আবির্ভাব' ("স্বপনপসারী") ছয় পংক্তির ষোলো স্তবকে। জীবনানন্দও বেশ দীর্ঘ-দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। তাঁর দীর্ঘকবিতার স্তবক-বন্ধের নিবিড়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবি পালন করেননি উপান্ত্যকালীন দীর্ঘ কবিতাগুচ্ছে তো নয়ই।

মোহিতলাল ও জীবনানন্দঃ দুই কবিই রূপান্বেষী। দু'জনের আকাঙ্ক্ষার ভাষাও এক হ'য়ে দেখা দিয়েছেঃ মোহিতলালের 'কামনা' ("স্বপনপসারী") ও জীবনানন্দের 'যে-কামনা নিয়ে' (ঝ. প'.) কবিতাদ্বয়ের পাশাপাশি স্থাপনায় তার সাক্ষ্য প্রাপ্তব্য। মোহিতলাল বলছেন 'মধুপিপাসায় রঙের নেশায় ভুলাইব মধুকরে' আর জীবনানন্দ 'যে-কামনা নিয়ে মধুমাছি ফেরে বুকে মোর সেই তৃষা খুঁজে মরি রূপ...।' 'রতি ও আরতি' ("স্মরগরল") কবিতায় মোহিতলাল জানিয়েছেন, 'আমি কবি, অন্তহীন রূপের পূজারী।' এই চিন্তারই কি ভাবরূপ নয় জীবনানন্দের 'আমি কবি,—সেই কবি' ও 'কবি' (ঝ পা.) কবিতাদ্বয়? মোহিতলাল তাঁর একটি পত্রে জ্ঞাপন করেছেন, 'আমি "রূপবিলাসী" নই—"রূপতান্ত্রিক"।' জীবনানন্দ কি শুধুই রূপবিলাসী?

যে-মরণস্বামীর দখলে চ'লে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ, কালের যে-ক্ষুৎচেতনার শিকার হয়েছিলেন জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ, তার সূচনা হয়েছিলো মোহিতলালে ও যতীন্দ্রনাথে। মোহিতলালেই আধুনিক অর্থে প্রথম উদ্‌গত হয়েছিলো মৃত্যুচেতনা, কিন্তু মৃত্যুঅতিকামী জীবনোল্লাসও; জীবনানন্দ প্রাথমিকভাবে আরো গাঢ়ভাবে এই মৃত্যুপটভূমিকায় জীবনার্থ সন্ধান করেছিলেনঃ 'ভূস্তরের অন্ধকারে চূর্ণ তারা;' কিন্তু আমাদের আয়ু সানস্পট গিলে ফেলে সূর্য্যের মতন ব্যক্তিগত' ('জীবনসংগীত') ও 'রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালির ডাক/শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!' ('মৃত্যুর আগে', ধূ. পা.) এইসব উচ্চারণে সেই মনোভাবনা উৎকীর্ণ। মোহিতলালের 'জীবনদর্শন' জাগৃতির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মরণভাবনাও উচ্চকিত, এবং "বিস্মরণী" থেকেই দু'এর সূচনাঃ এতে পার্থিব রূপ ও পার্থিব প্রেমের প্রতি কবিচিত্ত আকর্ষিত হয়েছে—১. 'দেহী আমি মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ ভিখারী' ('স্পর্শ-রসিক'); ২. 'জ্বেলে নে রে দেহ-দীপে স্নেহ-ভালোবাসা/—নবজন্ম আশা' ('মোহমুদ্গর'; ৩. 'সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ পিপাসা/দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন।' 'পান্থ') মৃত্যুভাবনায় আচ্ছন্ন কবিতা 'মৃত্যু' ("স্বপনপসারী") ও 'মৃত্যু ও নচিকেতা' "বিস্মরণী"), প্রভৃতি কবিতা। আরোঃ ১. 'অমানিশার

মুখের' পরে বৃষ্টিধারার ঝালর ঝরে/সিঁথির 'পরে বিজলী-সিঁদুর, মরণ-বিয়ের বাসরঘরে।' ('শবসঙ্গীত') ২. 'আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ-আঁখি মরণ-শয়নাগারে; /প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে।' ('দীপ-শিখা'; ৩. 'উৎসব শোভা ম্লান হ'য়ে যায়/আলোকের অবসানে/মরণের ফুল বড় হ'য়ে ফোটে জীবনের উদ্যানে' 'মৃত্যু-শোক')।—জীবনানন্দ জীবন-মৃত্যুর এই কিনারা থেকেই তাঁর কবিতার সূত্র তুলে নিয়েছিলেন, নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছিলেন আরো গভীর গহনে ।।

১. জীবনানন্দের তৎকালীন চিঠিতেও আছে ঝ. পা.-এর এইসব কবিতার ভাষা ও আবহ :

চারদিকে সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর সফেদা মেঘের সারি, বাজপাখির চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সবজি বাগের ভেতর বসে আছি, দূরে-দূরে তাতার-দস্যুর হল্লোড়। আমার তুরাণী প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।...হঠাৎ কোত্থেকে কত কি তাগিদ এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় একেবারে বেসামাল বিশ-মাল্লার ভিড়ে! সারাটা দিন—অনেকখানি রাত—জোয়ার ভাটায় হাবুডুবু।

[অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা পত্র, "কল্লোল যুগ": অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১০৬]

২. 'বেদুঈন' শীর্ষে জীবনানন্দও একটি কবিতা লিখেছিলেন ('কল্লোল,' বৈশাখ ১৩৩৩)।

৩. মোহিতলাল (ও সত্যেন্দ্রনাথ) ব্যবহার করেছেন 'গুলজার', জীবনানন্দ বাংলা প্রত্যয় ব্যবহার ক'রে এর নবীভূত রূপ দিয়েছেন।

৪. শব্দটি কবির উত্তরকালীন একটি কবিতায় প্রাপ্তব্য : 'অবশেষে একদিন থেমে/মনে হয় ক্লান্তির সাগর/মাঝে মাঝে চেনাতে চেয়েছে তার/দুই ফুট জমিনের ঘর।' ('ভালবাসা নড়ে বারবার', জীবনানন্দ দাশ)।

৫. 'দিলদার' শীর্ষে মোহিতলালের একটি কবিতাই বর্তমান ("স্বপনপসারী")।

৬. 'শরাবখানা' মোহিতলালের একটি অনুবাদ-কবিতার নাম ("হেমন্ত-গোধূলি")।

৭ মোহিতলালে 'সারং'—সারেঙ্গী ('শরাবখানা,' "হেমন্ত গোধূলি")। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন ('সারেং,' 'মেঘলা মোহ,' "প্রথমা")।

৮. শব্দটি কবির উত্তরকালীন কবিতায় প্রাপ্তব্য : 'পশ্চিমের মেঘে আলো একদিন হয়েছে সোনেলা।' ('প্রেম,' ধূ. পা.)।

৯. জীবনানন্দে : 'খুন-রোশনাই'।

১০. জীবনানন্দ বহুকাল পরে ব্যবহার করেছেন 'তিমির-বিলাসী' ('তিমির-হননের গান,' "সাতটি তারার তিমির"); স্পষ্টত মোহিতলাল থেকে আহৃত।

১১. জীবনানন্দে : 'অলখ অরুণোদয়' ('সময়ের কাছে,' সা. তা. তি.)।

১২. জীবনানন্দ এই যৌগিক-শব্দটি অবিকল ব্যবহার করেছেন; পরে পরিবর্তিত ব্যবহার করেছেন : 'নটকান-রক্তিম'।

১৩. জীবনানন্দে : 'চাঁদিনী-শরাব'।

১৪. সুধীন্দ্রনাথে : 'বৈদেহী বিচিন্তা আজি সঙ্কুচিত শিশির-সন্ধ্যায়' ('হৈমন্তী,' "অর্কেস্ট্রা")।

১৫. এই যৌগিক শব্দটি সুধীন্দ্রনাথ একটি অনুবাদ-কবিতার নাম হিশেবে ব্যবহার করেছেন ("প্রতিধ্বনি")।

১৬. জীবনানন্দ এই শব্দটি অবিকল ব্যবহার করেছেন।

জীবনানন্দ ও নজরুল

জন্মেছিলেন একই বর্ষে, ১৮৯৯-এ, জীবনানন্দ দাশ ও নজরুল ইসলাম। কিন্তু দু-জন হ'য়ে রইলেন দু'যুগের কবি, দুই আলাদা ও পরস্পর সময়স্রোতের কবি-স্তম্ভ, প্রাক ও উত্তর-পুরুষ কাব্যেতিহাসে। এর কারণ, বিষয়বিন্যাসের প্রশ্নপ্রসঙ্গটি যদি সরিয়ে রাখি, নজরুলের উত্থান কিছু আগে, ১৩২৬ (১৯১৯) সালে, যখন তাঁর প্রাথমিক গদ্য-পদ্য প্রচেষ্টা বেরোতে থাকে পত্রালিপুঞ্জে; আর জীবনানন্দের—যতোদূর জানা যায়—আদি কবিতাবলি প্রকাশিত হয় ১৩৩২ (১৯২৫) সালে। 'বঙ্গবাণী', 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকায় এই দুই পরিণাম-বিধর্মী কবির কবিতা একই সঙ্গে বেরোতো। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'তে-হ'তে 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' পরিণত হন 'নজরুল ইসলাম'-এ, 'জীবনানন্দ দাসগুপ্ত' 'জীবনানন্দ দাশ'-এ। নজরুলের প্রথম কবিতাগ্রন্থ "অগ্নিবীণা"-র প্রকাশসময় ১৩২৯ (১৯২২), আর জীবনানন্দের প্রথম কবিতাগ্রন্থ "ঝরা পালক" বেরোয় ১৩৩৪ (১৯২৭) অব্দে। জীবনানন্দের প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের আগে বা সমপর্যায়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো নজরুলের "অগ্নিবীণা" (১৩২৯), "দোলনচাঁপা" (১৩৩০), "বিষের বাঁশী" (১৩৩০), "ভাঙার গান" (১৩৩০), "চিত্তনামা" (১৩৩২), "ছায়ানট" (১৩৩২), "পূবের হাওয়া" (১৩৩২), "সাম্যবাদী" (১৩৩২), "সর্বহারা" (১৩৩২), "ঝিঙেফুল"

(১৩৩২), "ফণিমনসা" ১৩৩৪), "সিন্ধুহিন্দোল" (১৩৩৪) প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ, এবং আরো অজস্র কবিতা পত্রালিতে পরিকীর্ণ হ'য়ে ছিলো। অর্থাৎ, ততোদিনে নজরুলের পরিপূর্ণ স্ববিকাশ সংঘটিত হয়েছিলো। এদিকে নজরুল তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থেই অবিসংবাদিতভাবে আত্মমুদ্রা চিহ্নিত করেছিলেন; আর জীবনানন্দকে দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ (ধূ. পা.) পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয়ে ছ। নজরুলের অগ্রগতি হয়েছিলো দ্রুত তালে, আর জীবনানন্দের মন্থর বেগে। নজরুলের প্রভাবরশ্মি দ্রুত বিকীর্ণ হ'য়ে যায় বাংলা কাব্যমণ্ডলে, আর যাঁরা তাঁর সেই অভিনব, বিস্তীর্ণ ও মোহন খর্পরে পড়েছিলেন জীবনানন্দ তাঁদের অন্যতম।

পরে, ক্রমশ পূর্বোক্ত নজরুলী খর্পর থেকে মুক্ত হ'য়েই বেরিয়ে এসেছিলেন জীবনানন্দ, খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর স্বকণ্ঠ আর আত্মভাষা। কিন্তু তাঁর উত্থান, কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)-এর, বাংলা কাব্যেতিহাসের একেবারে স্বভাবী ধারায়। উত্তররাবীন্দ্রিক কবি তিনি, রবীন্দ্রপ্রভাবের চেয়ে প্রথম রবীন্দ্রবিধর্মী কবিদের ছায়াপাত তাঁর উপর স্বাভাবিক এবং সেই সম্পাত যথাযথভাবেই নিপতিত হয়েছিলো। তাঁর প্রাথমিক কবিতাগুচ্ছে, প্রথম কবিতাগ্রন্থ "ঝরা পালক" ও তৎসাময়িক গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলিতে, প্রথম রবীন্দ্রবিধর্মী কবিবৃন্দ, নজরুল ইসলাম (১৮৯৯) সহ মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৪২), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)-এর খুব স্পষ্ট প্রভাব এসে পড়েছিলো। সত্য, রবীন্দ্ররশ্মি থেকে জীবনানন্দও একেবারে বিমুক্ত নন: তাঁর দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থে (ধূ. পা.) কবি-সার্বভৌমের প্রাথমিক কবিতাচক্র একটি আবর্ত তুলেছিলো।

কিন্তু তাঁর উত্থান ঘটেছিলে নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-যতীন্দ্রনাথের হাত ধ'রেই। জীবনানন্দের জীবৎকাল মোটামুটিভাবে প্রাথমিক রবীন্দ্রবিধর্মীদেরই সমসাময়িক বটে, কিন্তু কবিতা ক্ষেত্রে তিনি এসেছিলেন আরো পরে, এবং কাব্যেতিহাসে তাঁর অবস্থান পূর্বোক্তদের পাশে নয়—উত্তরে। প্রথম-রবীন্দ্রদ্রোহিরা যে-রবীন্দ্রবিধর্মী কবিতার সূচনা করেছিলেন, যেন তিনি তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আয়তনে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সাহিত্যেতিহাসে ট্র্যাডিশন ব'লে যে-কথাটি প্রচলিত, জীবনানন্দের কবিতাভূমির অবস্থান তারই উৎসঙ্গে।

প্রাথমিক জীবনানন্দের উপর সর্বাধিক প্রভাব পতিত হয়েছে নজরুল ইসলামের। বাংলা কবিতায় যে-বিচিত্র প্রভাবধারা উৎসারণ করেছিলেন নজরুল, তা প্রধানত তিনটি স্রোতঃপথে প্রবহমান : রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার ; দ্রোহজনিত ভাবনা-বেদনার ; ইসলামি ভাবাদর্শশীল কবিতার। জীবনানন্দ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার বিশ্ব ; নজরুলী দ্রোহজনিত ভাবনা-বেদনাও তাঁর প্রথম পর্বে তরঙ্গ তুলেছিলো। কবির প্রথম পর্ব, "ঝরা পালক", থেকে সন্দীপনমূলক নজরুল-প্রভাবিত ক'একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করি, যে-ধরনের কবিতা উত্তরকালে কবি আর লেখেননি :

১ গাহি মানবের জয় !
– কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয় !
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি বুকে কোটি দেউটি জ্বলিছে,—কোটি কোটি শিখা জাগে,
প্রদীপ নিভায়ে মানব দেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমরা তাঁদের শস্ত্র, শাসন, আসন করিব ক্ষয় !
–জয় মানবের জয় ![১] [নব নবীনের লাগি, ঝ. পা.]

২. জয়,—তরুণের জয়
জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক,—জয়,– জয় চিন্ময়।
স্পর্শে তোমার নিশা টুটেছিল,–উষা উঠেছিল জেগে,
পূর্ব্ব তোরণে, বাংলা-আকাশে,—অরুণ-রঙীন মেঘে ,
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া,—জগত গেছিল রেঙে। [২]
[বিবেকানন্দ, ঝ. পা.]

৩. মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নামাজের সুরে সুরে।
আহ্নিক হেথা সুরু হ'য়ে যায় আজান বেলার মাঝে
মুয়াজ্জেনের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে ;
জাগে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা উষার বেদবাণী যায় মিশে কোরাণের স্বরে :

সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির।[৩]
[হিন্দু-মুসলমান, ঝ. পা.]

৪।   জড়িয়াছে বুঝি ঠাঁই

আমার চোখের অশ্রু-পুঞ্জে নিখিলের বোন ভাই।[৪]
আমার গানেতে জাগিছে তাদের বেদনাপীড়ার দান,
আমার প্রাণেতে জাগিছে তাদের নিপীড়িত ভগবান।[৫]
[নিখিল আমার ভাই, ঝ. পা.]

জীবনানন্দের পরবর্তী কবিতা জাগরণের এই সুর থেকে বঞ্চিত। বস্তুত বিষয়ের দিক থেকেই জীবনানন্দ সম্পূর্ণ অন্য ঘাটে চ'লে গিয়েছিলেন; তাই সেই প্রাথমিক উচ্চারণ 'গাহি মানবের জয়/—কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয়' (নব-নবীনের লাগি', ঝ. পা.) আর উত্তরকালীন উক্তি 'জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়,' ('সময়ের কাছে,' সা. তা. তি.) মর্মত পৃথক একেবারে।

যে-মানবপ্রেমে জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'নিখিল আমার ভাই' বা 'হিন্দু-মুসলমান'-এর মতো কবিতা, তাই তাঁকে দিয়ে রচনা করিয়েছে 'পতিতা':

ছোঁয়াতে তাহার ম্লান হ'য়ে যায় শশীতারকার শিখা,
আলোকের পারে নেমে আসে তার আঁধারের যবনিকা।
সে যে মনন্তর,—মৃত্যুর দূত—অপঘাত-মহামারী,—
মানুষ তবু সে,—তার চেয়ে বড়,—সে যে নারী সে যে নারী।
[পতিতা, ঝ. পা.]

এরই সঙ্গে তুলনীয় নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতার মনোভাবনা:

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে;
নাই হ'লে সতী তবু তো তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি,[৬]
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত তারা আমাদের জ্ঞাতি;
[বারাঙ্গনা, সাম্যবাদী : নজরুল]

নজরুলের রোম্যান্টিক স্বপ্নকল্পনার বিশ্ব জীবনানন্দের উপর গভীরতর প্রভাবসম্পাতী। মর্ত্যপৃথিবীর টান দুই কবির উচ্চারণকে এক সূত্রে বেঁধেছে:

বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখী
ক্লান্ত কণ্ঠে জয় চির-মুক্তি ধ্বনি হাঁকি'—
উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে,
অবসাদ-ভগ্ন ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে।
মা আমার! মা আমার! একি হ'ল হায়!
কে আমারে টানে মাগো উচ্চ হতে ধরার ধূলায়?
মরেছে মা বন্ধ-হারা বহ্নি-গর্ভ তোমার চঞ্চল,
চরণ-শিকল কেটে পরেছে সে নয়ন-শিকল।

মা! তোমার হরিণ-শিশুরে
বিষাক্ত সাপিনী কোন্ টানিছে নয়ন-টানে কোথা কোন্ দূরে!
[মুক্ত-পিঞ্জর, বিষের বাঁশী : নজরুল]

শকুনের মত শূন্যে পাখা বিথারিয়া
দূরে, দূরে, আরো দূরে চলিলাম উড়ে'
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা,—অনন্তের শুক্ল অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে!
স্ফীত সমুদ্রের মত আনন্দের আর্ত কোলাহলে
উঠিলাম উথলিয়া দুরন্ত সৈকতে,
দূর ছায়াপথে!
পৃথিবীর প্রেত-চোখ বুঝি
সহসা উঠিল ভাসি তারকা-দর্পণে মোর অপহৃত আননের প্রতিবিম্ব খুঁজি
ভ্রূণ-ভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এল বুক-ফাটা মিনতির ভরে,—
[সে-দিন এ ধরণীর, ঝ পা. : জীবনানন্দ]

জীবনানন্দের 'চাঁদিনীতে', 'দক্ষিণা' (ঝ. পা.) প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সঞ্চারী কবিতা নজরুলের অনুরূপ কবিতার—'চাঁদনী রাতে', 'ফাল্গুনী', 'রাখীবন্ধন', 'মাধবী-প্রলাপ' (সিন্ধু-হিন্দোল) -কবিতার স্মারক। জ্যোৎস্নারাত্রি ও বসন্তবাতাস—নিসর্গের এই দুই বিপ্রকৃতির বর্ণনায় দুই কবির সাযুজ্য স্বয়ম্প্রকাশিত :

তৃতীয়া চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি' চলিছে আকাশ-প্রিয়া
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া
তৃতীয়া 'চাঁদের' বাকী 'তের কলা' আবছা কালোতে আঁকা,
নীলিম প্রিয়ার নীলা 'গুল রুখ' অব-গুণ্ঠনে ঢাকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী
সেহেলী 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলী মশারি টানি'।
দিকচক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি,
নীহার নেটের কুয়াশা-মশারী—ওকি বর্ডার তারি?
সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।
[চাঁদনীরাতে, সিন্ধুহিন্দোল : নজরুল]

কাহার পরশে পলাশ-বধূর আঁখির কেশরগুলি
মুদে' মুদে' আসে,—আর বার করে কুঁদে কুঁদে কোলাকুলি।
পাতার বাজারে বাজে হল্লোড়,—পায়েলার রুণ রুণ,

কিশলয়দের ভাঁশা পেয়ে কে গো—চোখ করে ঘুম ঘুম।
এসেছে দখিনা—ক্ষীরের মাঝারে লুকায়ে কোন এক হীরের ছুরি।
তার লাগি তবু ক্ষ্যাপা শাল নিম, তমাল বকুলে হুড়াহুড়ি।
আমের কুঁড়িতে বাউল বোলতা খুনসুড়ি দিয়ে খসে যায়,
অঘ্রাণে যার ঘ্রাণ পেয়েছিল, পেয়েছিল যারে 'পোষলা'য়.
সাত্তাশে মাঘের বাতাসে তাহার দর বেড়ে গেছে দশগুণ,—
নিছক হাওয়ায় ঝরিয়া পড়িছে আজ মউনের ক'স' গুণ।

[দক্ষিণা, ঝ, পা. : জীবনানন্দ]

—জীবনানন্দের উপর নজরুলের প্রভাব পড়েছে এই যুগল ধারায়ঃ একদিকে সন্দীপনমূলক কবিতায়; অপরদিকে রোম্যান্টিক উন্মীলনে। রোম্যান্টিক উন্মীলনের একটি শাখা চ'লে গেছে ইতিহাস-ভূগোল বিহারে। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-চর্চিত কবিতার দৈশিক বাংলা বাতাস (কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জসীম উদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখ অসংখ্য কবি) থেকে সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল বাংলা কবিতার আবহ-মণ্ডলকে স্থাপন করেন দূরাঞ্চলে। লক্ষণীয় যে কবিতার পটদেশ যাঁরা পরিবর্তন করেছিলেন, তাঁরা নূতন বাংলা কবিতার জনক। সেই মুহূর্তেই বাংলা কবিতা দাবি করছিলো এই পটপরিবর্তন—অন্তরের দাবি ছিলো তার বহিরাঞ্চলে যাবার। সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল—এঁরা কেউই অবশ্য মুখ ফিরিয়ে থাকেননি বাংলাদেশের প্রতি, বরং এঁদের কাব্যের অধিকাংশ শিকড় বাংলা মাটিতেই প্রোথিত, কিন্তু একাংশ বৈদেশি ইতিহাসভূমি ভূগোলভূমির উপর।[৭] উত্তরকালে জীবনানন্দ দাশ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে এই ইতিহাস-ভূগোল-বিহার নূতন ভাবে ও উদ্যমে কাজ করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের মধ্যপ্রাচীকেন্দ্রিকতা তথা মুসলিম ইতিহাসপুরাণ-বৃত্তকে এঁরা আরো ব্যাপক বলয়ে নিয়ে যান। ইতিহাসযান হ'য়ে ওঠে জীবনানন্দের কেন্দ্রাকর্ষ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূগোলভূমি।[৮] "ঝরা পালক"-এর কবিতাগুচ্ছে সাধারণভাবে দূরতৃষ্ণা ধ্বনিত; বিশেষভাবে স্মরণীয় কএকটি কবিতাঃ 'বেদিয়া', 'সাগর-বলাকা', 'নাবিক', 'চলছি উধাও', 'একদিন খুঁজেছিনু যারে', 'অস্তচাঁদে', 'পিরামিড', 'চাঁদিনীতে', 'মিশর', 'মরুবালু' প্রভৃতি কবিতা।

জীবনানন্দের উত্তর-কাব্যেও এই ইতিহাস-ভূগোল ভ্রমণ শমিত হ'য়ে যায়নি; বরং নূতন আয়তন সৃষ্টি করেছে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" ও "বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে। "ঝরা পালক"-এই অবশ্য নজরুল মোহিতলাল-

সত্যেন্দ্রনাথের ইতিহাসোত্থ কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দের কবিতার ইতিহাস-ভূগোলের স্বপ্নকল্পনা-পাশ পৃথকতা রচনা করেছিলো। এ-কথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে ইতিমধ্যে "রূপসী-বাংলা"-র সনেট পরম্পরায় জীবনানন্দ দৈশিক দেনা চুকিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর জীবনানন্দের কবিতা থেকে ঐতিহাসিক খ্যাতনামাদের ও বিখ্যাত স্থানগুলির একটা চয়নিকা তৈরি করা যাক।

ঐতিহাসিক খ্যাতনামাগণ :

দেশবন্ধু, বিবেকানন্দ, শাক্য, আকবর, সেলিম, সাজাহাঁ, ইয়োসোফ (ঝরা পালক); বিম্বিসার, অশোক, মহেন্দ্র (বনলতা সেন); মৈত্রেয়ী, আত্তিলা, নচিকেতা, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কুইসলিং, হিটলার, গর্গাঁ, জরাথুষ্ট্র, লাওৎ-সে, এঞ্জেলো, রুশো, লেনিন, এম্পিডোক্লেস (সাতটি তারার তিমির)।

ভৌগোলিক স্থানগুলি :

মিশর, ব্যাবিলন, উর, এশিরিয়া, স্পেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, উজ্জয়িনী, মথুরা, বৃন্দাবন, পাটলীপুত্র, শ্রাবস্তী, কাশী, কোশল, ভারত, এশিয়া, তক্ষশীলা, অজন্তা, নালন্দা, দিল্লী, লাহোর, গ্রীস, ফতেহপুর, কার্থেজ, রোম (ঝরা পালক); সিংহল, মালয়, বিদর্ভ, নাটোর, বিদিশা, শ্রাবস্তী, বেবিলন, দ্বারকা, এশিরিয়া, মিশর, ইউরোপ, গ্রীস, কলকাতা (বনলতা সেন); মালাবার, ভারত, চীন, আফ্রিকা, কলকাতা, মিশর, ব্যাবিলন (মহাপৃথিবী); মালয়, কুয়ালালাম্পুর, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, বালি, হঙকঙ, সাংহাই, বেবিলন, নিনেভ, মিশর, চীন, উর, বৈশালী, আলেকজান্দ্রিয়া, লিবিয়া, হনলুলু, ম্যানিলা, হাওয়াই, গ্রীস, টাহিটি, বোর্নিও, আলাস্কা, জুহু, ভিয়েনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ, মি· : চীন, ইউরোপ, এশিয়া, লণ্ডন, দিল্লী, কলকাতা, (সাতটি তারার তিমির)।

নজরুল (ও সতেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল)-প্রভাবিত হ'য়ে, এবং বৈদেশিক আবহ নির্মাণের প্রয়োজনে জীবনানন্দ তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থে অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন। পরে এরকম অজস্রতায় আরবি-ফারসি

শব্দ ব্যবহার করেননি তিনি আর, তাঁর কবিতার আবহও অন্য লোকে প্রস্থান করেছিলো। কিন্তু জীবনানন্দে ছিলো প্রাকৃত শব্দ ব্যবহারের একটি ঝোঁক, এবং বাঙালির মৌখিক ভাষায় যেহেতু অনেক আরবি-ফারসি শব্দ মিশে গেছে, অতএব প্রাকৃত বাকব্যবহার করতে গিয়ে কিছু আরব্য-পারশ্য শব্দ স্থান ক'রে নিয়েছে তাঁর কবিতাধারে। "ঝরা পালক" থেকে কবির আরবি ফারসি শব্দ নির্মাণের একটি সঞ্চিতা :

> দরিয়া, দিওয়ানা, জিঞ্জির, খেয়াল, খোশ, আখের, রেওয়াজ, পশমিনা, তালাস, সোয়ার, দিলদার, খুন, খারাবী, দরাজ, বেহুঁশ, দিলওয়ার, মেজাজ, দস্তানা, বান্দা, রোশনাই, খুশরোজী, মুসাফের, রোজা, ঈদ, মসগুল, তাবিজ, মশলাদার, মুসল্লা, একশা, মেহেরাব, শফর, [১] গজল-ইলাহী, দরদ, শের, শরাব, আসর, মোতিয়া, পানসী, জর্দা, আঙিয়া, পায়েলা, কলেজা।

প্রথম পর্যায়ে কবির উপর নজরুলের কবিতার আরো বহু কুশলতা কাজ ক'রে গেছে। যেমন, মধ্যমিল :

১. এস **দক্ষিণা**,—কাননের **বীণা**—বনানী পথের বেণু! [দক্ষিণা]
২. আজ দখিনার **ঝর্দা** হাওয়ায় **পর্দা** মানে না মানা! [ঐ]
৩. **মুদে মুদে** আসে,—আর বার করে **কুঁদে কুঁদে** কোলাকুলি [ঐ]
৪. এসেছে দখিনা—**ক্ষীরের** মাঝারে লুকায়ে কোন এক **হীরের** ছুরি! [ঐ]
৫. এসেছে **নাগর** যামিনীর আজ **জাগর** রঙীন আঁখি! [ঐ]
৬. আমি **দক্ষিণা** দুলালীর **বীণা**, - পড়শপরশ হারা [যে-কামনা নিয়ে]
৭. আমি গো **লালিমা**,—গোধূলির **সীমা**—বাতাসের লালা **ফুল** [ঐ]
৮. হয়তো সেদিনও আপেলের **ফুল** কেঁপেছে **আকুল** হাওয়ার সনে [চাঁদিনীতে]
৯. হয়তো সেদিনও ডেকেছে **পাপিয়া** কাঁপিয়া **কাঁপিয়া** সরোর শাখে [ঐ]
১০. হয়তো সেদিনও পাড়ার **নাগরী** ফিরেছে এমনি **গাগরী** কাঁখে [ঐ]

অনুপ্রাস ঃ

১. কণ্ঠ-বাজের আওয়াজ তাদের বেজেছে স্তব্ধ নভে।

[জীবন মরণ দুয়ারে আমার]

২. ঘুম-কুমারীর মুখে চুমো খায় যখন আকাশ।

[অস্তচাঁদে]

৩. নীলার ঘোলা জলের দোলায় লাফায় কালো সাপ।

[মিশর]

৪. চাঁদের আলোয় চাঁদমারী জুড়ে,—সবুজ চরায় সবজী ক্ষেতে।

[চাঁদিনীতে]

৫. শিশির-শীর্ণা বালার কপোলে কুহেলির কালো জাল।

[দক্ষিণা]

যৌগিক শব্দ ঃ

দাদুরী-কাঁদানো, [১০] শাঙন-দরিয়া, স্বপ্ন-ময়ূর, মানব-দেব, দাব-মরুভূমি, জৌলুশ-রাঙা, ছলা-মরীচিকা, মরণ-সাহারা, কেউটে-ঢেউ, অতীত-আখের, ফেনা-সই, জলধি-পাথী, জল-বেদিয়া, উর্মি-নাগবালা, ছায়া-বৌ, বাদল-বৌ, হৃদয়-মাস্তুল, আকাশ-মরু, জীবন-বীণা, আকাশ-শুঁড়িখানা, আগুন-ছড়ি, নাসপাতি-গাল, কপোত-ব্যথা, মেঘ-বৌ, [১১] পৌষ-নীরবতা, শকুন-বধু, ঘুম-কুমারী, ময়ূর-নীলিমা, কামনা-সাহারা, হিমানী-পাথার, করাত-দাঁত, নীহার-নীল, প্রেত-প্রাণ, চাঁদিনী-শরাব, [১২] শিশির-শীর্ণা, আকাশ-শিথান, সৃষ্টি-বধূ, প্রেত-জ্যোৎস্না, ভ্রূণ-ভ্রষ্ট, গরল-মদির, মায়া-ভুজঙ্গিনী, নভো-নীল, স্পন্দন-পাগল, বীর-শের, [১৩] সাগর-শকুন্ত, সিন্ধু-বেদুঈন, দিল-পিয়ালা, [১৪] স্বপন-ফানুষ, রাত্রি-কুমারিকা, আঁধার-সাগর, আঁধার-সাহারা, নিশি-মরু, প্রেম-খঞ্জর, করুণা-প্রদীপ, চিতা-ফণা, বিধবা-নয়ন, অশ্রু-অমানিশা, মশলা-দরাজ, নটকান-রাঙা, খুন-রোশনাই, সাগর-বলাকা, প্রেত-চাঁদ, কপাল-কবর, মুসাফের-হিয়া, [১৫] রবাব, [১৬] দূর-সোহাগী, ঘর বিবাগী।

উক্ত উদাহরণসমুচ্চয় "ঝরা পালক" থেকে আহৃত। নজরুলের এইসব কুশলতা—আরবি-ফারসি শব্দনির্মাণ, মধ্যমিল, অনুপ্রাস, যৌগিক শব্দ—জীবনানন্দের উত্তরকালিক কবিতায় ক'মে এসেছে, তাঁর নিজেকে খুঁজে পাওয়ায় সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু এইসব কুশলতা-যে জীবনানন্দে উপকারী

হয়েছিলো, আত্মসন্ধানের কাজেই লেগেছিলো, তাতে সন্দেহ নেই ;—বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে জীবনানন্দ ও নজরুল দু'জনেই অলংকাররণিত কবি। ছন্দ বিষয়েও প্রাথমিকভাবে তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন নজরুলের কাছ থেকে: "ঝরা পালক" এর 'দেশবন্ধু' [১৭] ও 'বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রশস্তি-কবিতাদ্বয় নজরুলের 'খালেদ', 'উমর ফারুক' প্রভৃতি কবিতার স্মারক ছন্দে ও বাক্যবন্ধে। নজরুলের প্রাথমিক প্রভাব-যে জীবনানন্দে বহুলভাবে উপকারী ও দূরতাৎপর্যশীলিত হ'য়ে উঠেছে তার প্রমাণ নজরুলের মতো জীবনানন্দও শব্দব্যবহারে, ইমেজপুঞ্জে, অলংকাররণনে, হয়তো-বা আত্মোৎসারী শিথিলতায়ও কবি হ'য়ে রইলেন, কাব্যেতিহাসে দুজনই হ'য়ে রইলেন প্রতিমাপ্রধান কবি। অবশ্য এই দুই কবির প্রতিমানির্মাণ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা: নজরুল প্রতিমা এনেছিলেন বহিঃপৃথিবী থেকে, জীবনানন্দের চিত্রকল্পে মিশে আছে তাঁর মানসলোকী আবহ ; নজরুলের প্রতিমা কবিপ্রসিদ্ধি থেকে জাত, উপমার সন্নিকটবর্তী, পরিচ্ছন্নভাবে আহরণযোগ্য. জীবনানন্দ রচনা করেছেন চূর্ণ চিত্রকল্প, মিশ্র চিত্রকল্প, আপাতভাবে বিপ্রতীপের সম্মিলন যার স্বাভাবিক, তাই তাঁর কবিতা থেকে সযত্নে মুছে দিয়েছিলেন নজরুলের প্রভাব, অথবা তাঁর কবিতা দারুণ মৌলিক হ'য়ে উঠেছিলো তাঁর আত্মার উচ্চারণ মুদ্রিত ক'রেই। কিন্তু এই প্রভাব সম্পাত ক'রে নজরুল প্রমাণ করেন তিনি 'বিদ্রোহী কবি' নন—তিনি বহুভূমিক কবি।

অন্তর্গত ঐ কৃতজ্ঞতাবশেই কি জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'নজরুলের কবিতা' শীর্ষক সন্দর্ভটি? আলাদাভাবে আর-কোনো বাঙালি কবির উপর লিখবার প্রয়োজন বা অবসর ঘটেনি তাঁর? সত্য, নজরুল সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটি নিবন্ধ রচনা করলেও, সেখানেও নজরুলকে তিনি স্থাপন করেছিলেন তৎসাময়িক পটে ;—সেই হিশেবে লেখাটি খুবই সাময়িক রচনা, যদিচ তা থেকে নজরুল সম্বন্ধে ও সাধারণভাবে কবিতা তথা শিল্প সম্বন্ধে তার একটি ধারণা পরিষ্কার পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলাদা কোনো নিবন্ধ জীবনানন্দ রচনা করেননি ; যে-ক'টি রচনায় রবীন্দ্রনাথ মুখ্য আলোচ্য, সেখানে কবি-সার্বভৌমের সঙ্গে পরবর্তীদের সম্বন্ধই মূলত নির্ণীত হয়েছে।

নজরুলের উপর জীবনানন্দের লেখাটি, 'নজরুলের কবিতা' ('কবিতা', নজরুল-সংখ্যা), ১৩৫১ সালে লেখা—মন্বন্তরের, দ্বিতীয় মহাসমরের ছায়া

প'ড়ে আছে তখন দেশের উপর ; স্থূল, ব্যর্থ, জাগরণমূলক, উদ্দেশ্যপ্রধান গদ্যকবিতা লেখার যুগ চলছে তখন। ততোদিনে নজরুল অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন (১৩৪৯-এর দিকে), 'নজরুল ইসলাম অনেক দিন থেকে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন', একথা তাই সত্য। 'জনগণ, ভদ্রসাধারণ এখনও ম'রে আছে; আসছে সার্বিক মৃত্যু এদের জন্যে—এবং তার ভিতর থেকে আরও একবার বেঁচে উঠবার অধ্যায়—জীবনকে নতুন করে প্রতিপালন করবার প্রয়োজনে।' এই উক্তির পটভূমিকায় কবির তৎসময়ে রচিত একটি অগ্রন্থিত কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে :

এই শতাব্দী-সন্ধিতে মৃত্যু

(অগণন সাধারণের)

সে এক বিচ্ছিন্ন দিনে আমাদের জন্ম হয়েছিল
ততোধিক অসুস্থ সময়ে
আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়।
দূরে কাছে শাদা উঁচু দেওয়ালের ছায়া দেখে ভয়ে
মনে করে গেছি তাকে—ভালোভাবে মনে করে নিলে—
এইখানে জ্ঞান হতে বেদনার শুরু,—
অথবা জ্ঞানের থেকে ছুটি নিয়ে সান্ত্বনার হিম হ্রদে
একাকী লুকালে
নির্জন স্ফটিকস্তম্ভ খুলে ফেলে মানুষের অভিভূত উরু
ভেঙে যাবে কোনো এক রম্য যোদ্ধা এসে।
নরকেও মৃত্যু নেই—প্রীতি নেই স্বর্গের ভিতরে ;
মর্তে সেই স্বর্গ-নরকের প্রতি সৎ অবিশ্বাস
নিস্তেজ প্রতীতি নিয়ে মনীষীরা প্রচারিত করে।

['পরিক্রমা', শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫০]

কবির এ কথা সত্য যে 'এখনকার বাংলা কবিতার এই দুটি স্বভাবই লক্ষিত হয়' : তার একটি 'অত্যন্ত স্থূল' 'নিশান হাতে অগ্রসর হয়েছে' : অপরটি 'একান্তভাবে ভাবনানিষ্ঠ', 'তনু সূক্ষ্ম'। 'এই দুই প্রকৃতির মিশ্রণে ভালো কবিতাও' রচিত হয়েছে ;—এবং 'এই শতাব্দী-সন্ধিতে মৃত্যু' তার অন্যতম। নজরুলের কবিতাকে জীবনানন্দ একটি বিশেষ সময়-পর্বের ফল ব'লে মনে করেছেন ; কিন্তু অভিযোগ করেছেন তিনি নজরুলের ছিলো না 'মননপ্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতা'। ফলে 'তাঁর কবিতা চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়।' তাহ'লেও, জীবনানন্দের

বিবেচনায় নজরুলের কোনো-কোনো কবিতা 'সফল' ও 'সার্থক' হয়েছিলো, এবং নজরুল ভিড়ের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন—যা তাঁর (জীবনানন্দের) সময়ের কবিতা পারছে না। 'আধুনিক অনেক কবিতা থেকে তাঁর কোনো-কোনো কবিতার অঙ্গীকার......বেশী, ধ্বনিময়তাও উৎকর্ণ না করে এমন নয়। কিন্তু নিজেকে বিশোধিত করে নেবার প্রতিভা নেই এসব কবিতার এমন বিধানে শেষ রক্ষার কোন বিধান নেই।'—নজরুল সম্বন্ধে জীবনানন্দের এই উক্তি আমাদের সরলমনা সমালোচকদের বিভ্রান্ত করতে পারে; সেই আশঙ্কায় এখানে শুধু এটুকু স্মরণ করতে বলি ঃ নজরুল ও জীবনানন্দ, দুই কবি, দুই কালের দুই কবি, দুই আলাদা পথে সত্যের সন্ধান করেছিলেন; এবং যে-কবির প্রভাব তাঁর কাব্যচর্চার উন্মেষকালে সবচেয়ে গভীরভাবে পড়েছিলো, এ উক্তি তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন নয় —এ হচ্ছে কবি জীবনানন্দ দাশের স্বতন্ত্র যাত্রাপথের ইশারাবাহী আত্মোচ্চারণ।।

---

১. নজরুল ইসলামের "সাম্যবাদী" কবিতাগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় অনুরূপ বিষয় ও বিন্যাস দ্রষ্টব্য। যেমন:

ক. গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খৃস্টান।
[সাম্যবাদী, সাম্যবাদী]

খ. গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
[মানুষ, ঐ]

২. বিবেকানন্দের উদ্দেশে নজরুল একটি গান রচনা করেন। দ্র. "রাঙাজবা"।

৩. নজরুলের গদ্য-পদ্য বহু রচনায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনবাণী রূপায়িত।

৪. তুলনীয় ঃ

সাম্যের গান গাই!—
যত পাপী-তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই। [পাপ, সাম্যবাদী]

৫. মাত্রাবৃত্তের যে-বিশেষ চালে "ঝরা পালক"-এর এই সব সন্দীপনমূলক কবিতা ('নব নবীনের লাগি', 'বিবেকানন্দ', 'হিন্দু-মুসলমান', 'নিখিল আমার ভাই') রচিত, তা নজরুলের অনুরূপ কুশলতাকে স্মরণ করিয়ে দ্যায়। নজরুলের বহু কবিতা এই রীতিবিন্যাসে রচিত: "সাম্যবাদী"-র একাদশটি কবিতা

('সাম্যবাদী', 'ঈশ্বর' 'মানুষ', 'পাপ', 'চোর-ডাকাত', 'বারাঙ্গনা', 'মিথ্যাবাদী', 'নারী', 'রাজাপ্রজা', 'সাম্য', 'কুলি-মজুর') ছাড়াও "সন্ধ্যা" কাব্যের কএকটি কবিতা ('আমি গাই তারি গান', 'জীবন-বন্দনা', 'ভোরের পাখী', 'জাগরণ', 'যৌবন', 'অন্ধদেবতা'), "প্রলয়শিখা" কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা ('নমস্কার', 'হবে জয়') এই পর্যায়ী। নজরুল মাত্রাবৃত্তের এই বিশেষ বিন্যাসরীতি গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "মরীচিকা" কাব্যের অন্ত:পাতি 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাগুচ্ছ থেকে—কিন্তু সেই ব্যঙ্গনিমিত্ত পূর্বজ কবিতাকে তিনি রূপান্তরিত করেন সন্দীপ্ত কাব্যে। জীবানানন্দ স্পষ্টত নজরুলের কাছে ঋণী, এবং তাঁর পরবর্তী কবিতায় মাত্রাবৃত্তের অনুরূপ চাল প্রয়োগ করেননি তিনি আর।

৬. বারবনিতার উদ্দেশে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা এরই সঙ্গে তুলনামূলক পঠনীয়:

ক. দেখি তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরে.
তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের ক্ষণেকের তরে।

[কুস্থানাদপি, বেণু ও বীণা: সত্যেন্দ্রনাথ]

খ. নহ মা ঘৃণ্য, কৃপার পাত্র,
আজ যে বুঝেছি খাঁটি—
মায়ের পূজায় কেন লাগে তোর
চরণে দলিত মাটি।

[বারনারী, মরীচিকা: যতীন্দ্রনাথ]

৭. দ্রষ্টব্য নজরুলের 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার' (অগ্নিবীণা), 'খালেদ', 'চিরজীব জগলুল,' 'আমানুল্লাহ,' 'উমর ফারুক' (জিঞ্জীর); মোহিতলালের 'নাদিরশাহের জাগরণ,' 'নাদিরশাহের শেষ.' 'ইরাণী,' 'শেষ-শয্যায় নূরজাহান,' 'বেদুইন' (স্বপনপসারী), 'নূরজাহান' ও জাহাঙ্গীর' (বিস্মরণ); সত্যেন্দ্রনাথের 'মমতাজ,' 'মমি', 'মমির হস্ত' (বেণু ও বীণা) 'কবর-ই- নূরজাহান' প্রভৃতি কবিতা।

৮. স্মরণীয় জীবনানন্দ ও প্রেমেন্দ্রের আত্মজ্ঞাপক দুটি কবিতাংশ:

ক. সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে-জন্মে ফিরে-ফিরে-ফিরে
মাঠে ঘাটে একা-একা,—বুনো হাঁস—জোনাকীর ভিড়ে।
দুশ্চর দেউলে কোন্—কোন্ যক্ষ-প্রাসাদের তটে,
দূর উর—ব্যাবিলোন—মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড তলে—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মত নীলা যেইখানে ফণা তুলে' উঠিয়াছে ফুলে'
কোন মন-ভুলানিয়া পথ-চাওয়া দুলালীর মনে
আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না—চোর চোখে—অলস নয়নে।

[অস্তচাঁদে, ঝ পা.: জীবনানন্দ]

৮. সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে ;—
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,
খোরাশান থেকে বাদক্‌শান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।
চমরীর ক্ষুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা।

[পথ, সম্রাট : প্রেমেন্দ্র মিত্র]

৯. বহুপরবর্তী একটি কবিতায় 'শফর' শব্দটি দ্রষ্টব্য :
পর্বতের পথে-পথে রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত শফরে
খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে ?

[হে হৃদয়, বে. অ. কা.]

১০. তুলনীয় নজরুল : 'কপোত-কাঁদানো'।

১১. জীবনানন্দের কোনো-কোনো যৌগিক শব্দে যে-নারীত্ব ও শারীরিকতা সূচিত (মেঘ-বৌ, ছায়া-বৌ, বাদল-বৌ, ফেনা-সই, ঊর্মি-নাগবালা, সৃষ্টি-বধূ, শকুন-বধূ, ঘুম-কুমারী, নাসপাতি-গাল, বিধবা-নয়ন ইত্যাদি), তা নজরুলের অনুরূপ চেনা শব্দমিশ্রণ স্মরণ করিয়ে দ্যায় (তমাল-চোখ, বিরহী, আঁখি, আঁখি-পাখি, কমল-পা, অধর-আঙুর, হেম-কপোল, গোলাপ-কপোল, গোলাপ-গাল ইত্যাদি)।

১২. তুলনীয় নজরুল : 'চাঁদিনী-শিরাজী'।

১৩. তুলনীয় নজরুল : 'শের-নর'।

১৪. তুলনীয় নজরুল : 'হৃদয়-পেয়ালা'।

১৫. জীবনানন্দের কোনো-কোনো যৌগিক শব্দ বাংলা ও আরবি-ফারসি শব্দ-যোগে সিদ্ধ (চাঁদিনী-শরাব, দিল-পিয়ালা, বীর-শের, মুসাফের-হিয়া ইত্যাদি), অনুরূপ শব্দসৃজনে নজরুল দক্ষ (শরম-শাড়ী, শিরাজী-শোনিমা, খুন-খচা, তড়িৎ-তাজাম, খুন-গৈরিক, আঁসু-পরিমল ইত্যাদি)।

১৬. তুলনীয় নজরুল : 'জীবন-বাঁশি'।

১৭. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে (১৩৩২ সাল) অজস্র কবিতা উৎসারিত হয়েছিলো বাঙালি কবিদের হাত থেকে। নজরুল লিখেছিলেন একটি সম্পূর্ণ বই "চিত্তনামা" (১. অর্ঘ্য, ২. অকাল-সন্ধ্যা, ৩. সান্ত্বনা, ৪. ইন্দ্র-পতন, ৫. রাজভিখারী); মোহিতলাল লিখলেন 'জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়' নামে চিত্তরঞ্জন শোকগীতি; যতীন্দ্রনাথ লিখলেন "মরুশিখা" কাব্যান্তর্গত 'নাই' ও 'শৃঙ্খলমোচন' কবিতাদ্বয়। দেশবন্ধুর স্মৃতিতে জীবনানন্দ আর একটি কবিতা লেখেন : "রূপসী বাংলা"র 'অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া'।

পঁচিশ বছরের ছোটোগল্প ঃ একটি আন্তর্জরিপ

কএক বছর আগেও বাংলাদেশের ছোটোগল্পে প্রাণের যে-স্রোত ছিলো প্রবহমান, সম্প্রতি তা প্রায় স্তিমিত-স্থির-নিশ্চল হ'য়ে এসেছে। এই স্তিমিতির মুখ্য কারণ আমাদের সাহিত্যধারাই সাধারণ-ভাবে সহসা নিরংশু পাংশুতায় ও গতানুগতির নিরঙ্কুশ চর্যায় পর্যবসান মেনেছে। বাংলাদেশের জন্মের অব্যবহিত পরেই এখানকার সাহিত্যে যে-উদ্দাম ঢল নেমেছিলো, কএক বছরের মধ্যেই তা কেন এ রকম চলস্রোত হারালো—তার পিছনে সামাজিক কারণ রাজনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঃ এরকম বলবেন অনেকে। সন্দেহ নেই, এ-কথা বহুলাংশে সত্যি। কিন্তু পরিপার্শ্বের উপর সমস্ত অপরাধ চাপিয়ে নিজেকে গ্লানিহীন মনে করবার একটি বদভ্যাস তৈরি করেছি আমরা। গত পঁচিশ বছরে আমাদের সাহিত্যিক অভাবগুচ্ছকে রাজনীতিক নিরুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক'রে আত্মতৃপ্তির যে-চমৎকার একটি কোটর তৈরি করেছি আমরা, আবার সেই মোহন খোড়লে প্রবেশের একটি চেষ্টা চলছে। আজকের রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষ রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার শিকার, চিরকালের সব মানুষই তাই; রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষ হিশেবে একজন শিল্পীর নিয়তিও এর অংশভাগী, শিল্প-সাহিত্যের উপর কোনো-না-কোনো পোশাক প'রে সরকারি বিধিনিষেধ নেমে আসেই। কিন্তু শিল্পের গতি চিরকালই তো সরকারের প্রতীপ গতি-রেখায়—সরকার-উদাসীন গন্তব্যে, শিল্পকে চিরকালই পরিপ্রেক্ষিতের প্রভু হ'তে হয়, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকেই পারিপার্শ্বিকের উপর বিজয়ী হ'য়ে উঠতে হয়, তাঁর চৈতন্যের উচ্ছলতায় শিল্পী চিরকালই উপপ্লবী। এই উপপ্লব তাঁরই অপর আয়তনের মধ্য দিয়ে রচিত হয়—কোনো বহিরাগত চাপে বা মতপন্থায় নয়, সরকার-পোষ্যতায় বা সরকার-বিরুদ্ধতায় নয়। বাংলাদেশের সাহিত্য এই আত্মআয়তন সর্বাংশে আজো

তৈরি ক'রে নিতে পারেনি, কেননা এদেশের সাহিত্য গত পঁচিশ বছরের সাহিত্য মুখ্যত রাজনীতি-নির্ধারিত, শিবির-বিভক্ত ও শিবির-নির্দেশিত। রাজনীতি-নির্ধারিত হওয়ায়, স্বনির্ভরশীল না-হওয়ায়, এদেশের সাহিত্যের বিকাশ স্বসমুখ হ'তে পারেনি; সাহিত্যের কোনো মাধ্যমেই কোনো নির্দিষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারা তৈরি হ'তে পারেনি। সেই স্বনির্ভরিত সাহিত্য রাজনীতিপ্রমুক্ত মানবিক সুস্থ সহিষ্ণু সহজতার পথ ধ'রেই কেবল আসতে পারে ব'লে আমি বিশ্বাস করি।

নিঃস্রোত সাহিত্যধারার একটি উপনদী হিশেবে ছোটোগল্পও ক্ষীণ-তোয়া হবে, এ তো স্বাভাবিক। অন্য একটি কারণও নির্দেশ করা যায়। আজকের সাহিত্য হ'য়ে উঠেছে বাণিজ্যিক—এবং সেই সার্থ-বাহতার কারণেই, বাণিজ্যিক কারণেই সাহিত্য ব্যাপক ও বিচিত্রভাবে লোকশানে গ্রস্ত হয়েছে, এ-ও সন্দেহাতীত। সাহিত্যে ছোটোগল্পের বাণিজ্যমূল্য ন্যূনতম। পত্রপত্রিকায় আবশ্যিক অংশ হিশেবেই ছোটো-গল্প নামধারী রচনা পৃষ্ঠা পূরণ ক'রে যাচ্ছে—কোনো-কোনো ভালো গল্প অগ্রন্থিত থেকে চির-পাঠকের গোচরের বাইরে র'য়ে যাচ্ছে কোনো-কোনো ভালো গল্পরচয়িতা ধূসর থেকে ধূসরতরতায় লীন হ'য়ে যাচ্ছেন কেবল গ্রন্থিত গল্পগুচ্ছের অভাবে। ফলত গল্পে কোনো একলক্ষ্য চেষ্টা বা তন্ময় স্রোতোপ্রবাহ নজরে পড়ে না। সচল লেখকেরা গল্প ছেড়ে তাঁদের নিবেশ অন্য কোনো সাধু ও বৈসয়িক দিগন্তে স্থাপন করেছেন —করছেন। আমাদের প্রবীণ গল্পকারদের কেউ মৃত (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্), কেউ প্রবাসী (আবু রুশদ ও শামসুদ্দীন আবুল কালাম), কেউ স্তব্ধ হ'য়ে আছেন (আবু ইসহাক, মীর্জা আ. মু. আবদুল হাই ও শাহেদ আলী) কেউ সাহিত্যের অপর শাখায় নিবিষ্ট (শওকত ওসমান)। '৫০-এর ও '৬০-এর গল্পলেখকদের কেউ একাগ্রভাবে গল্পচর্চা করছেন না আর: অনেকে এ মাধ্যমটি ত্যাগ করেছেন, অনেকের কলম একেবারে থেমে গেছে। ধারা রক্ষা করছেন তরুণ-অতিতরুণ গল্পলেখকরা—যাঁরা জাত মধ্য-'৬০, প্রান্ত-'৬০ কিংবা '৭০-এর পাদদেশ থেকে। কিন্তু এঁদের লেখা এক বায়ব্য নির্মোকে ভরা: প্রাণের উচ্ছল উৎসারণ তাতে যেমন অনুপস্থিত, তেমি অবর্তমান তার মধ্যে মননজীব কারুতা। অথবা যে-একক বা সমধর্মী গল্পচিন্তা থেকে একটি তরঙ্গ তৈরি হয়, গ'ড়ে ওঠে একটি

গল্পলেখক-গোষ্ঠী, কোনো বিশিষ্ট ছোটোগল্পের ধারা উৎসৃত হয়, সে-রকম ঢেউএর ও গোষ্ঠীর শোচনীয় অভাবে সমস্তই যেন বিচ্ছিন্ন, একক, আত্মমুখ প্রচেষ্টা হ'য়ে থাকছে। গল্পকারদের মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধুতা হয়তো কোথাও-কোথাও আছে, কিন্তু সাহিত্যিক অর্থে বন্ধুতা নেই। ফলে আমাদের গল্পের অগ্রসরণে নির্দিষ্ট কোনো নদী তৈরি হয়নি, কোনো সম-ভাবনাশীলতা নেই—গল্পকারগণ, শেষ পর্যন্ত, আপনাপন ব্যক্তিগত ব্যর্থতা বা সার্থকতার বিজন দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভাবনাধারার এই বিচ্ছিন্নতা আমাদের সব গল্পকারেরই বিধিলিপি ঃ প্রবীণ, '৫০ ও '৬০-এর এবং '৭০-এর তরুণ গল্পকারদেরও। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, মাহবুবুল আলম, আবু ইসহাক, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, মীর্জা আ. মু. আবদুল হাই, সরদার জয়েনউদ্দীন, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শাহেদ আলী, আবদুল হক—আজ দূর থেকে দেখে এইসব প্রবীণ গল্পকারদের লেখার একটি সমন্বিত অর্থতাৎপর্য গ'ড়ে নেওয়া যায়, যদিচ এদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ব্যাপক। শিল্পসফল গল্প এঁরা অনেক রচনা করেছেন, এ-কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে—অন্তত বাংলা ছোটোগল্পের বিশাল পটশোভাভূমির উপর এঁদের স্থাপনা ঘটলে—এবং এরকম স্থাপনার প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই আসে। তাহ'লেও এঁরা অন্তত এই কাজ করেছিলেন ঃ এনেছিলেন বিষয়ের দিক থেকে সমবায়ী ব্যাপকতা আর দেশজ নূতন অস্পর্শিত জমির উপর গল্প রচনার সাহস। '৫০-এর লেখকদের হাতে ঐ ব্যাপ্তিচক্র সংকীর্ণ হ'য়ে আসে। এ কথা এখানে শ্রোতাদের স্মরণ রাখতে বলি ঃ প্রবীণ রচয়িতারা যে '৫০-এ ও '৬০-এ গল্প রচনা বা চর্চা করেননি তা নয়, বরং অনেকেরই রচনাকাল উক্ত সময়-পরিসরেই, তাহ'লেও তাঁদের হৃদয়-মানস মোটামুটি পূর্বাহ্নেই গড়ন পেয়ে গিয়েছিলো (যদিচ এঁদের কেউ-কেউ আজকের দিনের চেতনায় আধুনিক গল্প লিখেছেন); '৫০-এর গল্প-রচয়িতা প্রসঙ্গেও এ-কথা সত্যি যে তাঁদের চর্চা ঐ দশক ডিঙিয়ে এসেছে যদিচ তাঁদের শারীর-চারিত্র্য ঐ দশকে প্রোথিত। যাই হোক, '৫০-এর গল্পকারদের গল্পবিষয়-যে অগ্রজদের চেয়ে ঈষৎ সংকীর্ণ হ'য়ে আসে তার একটি কারণ হয়তো প্রবীণ গল্প-লেখকগণ অনেকেই ছিলেন (বা, এঁদের সমকালিক অনেকে, যাঁরা গল্প লেখার চেষ্টাও করেননি) মুখ্যত ঔপন্যাসিক চেতনায় উদ্বোধিত। হয়তো এই ঔপন্যাসিক-শোভন মনোচেতনার জন্যেই

এঁদের হাত থেকে খুব-সফল ছোটোগল্প নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে আসেনি; কিন্তু প্রধানত এঁরাই আজো এ দেশের ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টা ও প্রবাহকে ধারণ ক'রে আছেন। '৫০-এর কথাশিল্পীদের মধ্যে ঔপন্যাসিক-শোভন সেই আততি অদর্শনীয় ব'লে তাঁদের হাত থেকে (দু-একজন বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম বাদে ভালো উপন্যাস নির্মিত হ'লো না; আর '৬০-এর লেখকেরা, ক্রমশ, উপন্যাসবিন্যাস থেকে দূরে—আরো দূরে স'রে রইলেন। '৫০-এই এ দেশের গল্প-কবিতার এক কথায় সমগ্র সাহিত্যের, প্রথম ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। একা '৫০ এর লেখকদের হাতে নয়, প্রবীণ ও '৫০-এর লেখকদের যৌথ সৌজন্যে। এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা পরবর্তী বংশধর। কিন্তু শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতায় সাহিত্যিক দায়িত্ব নিঃশেষিত হয় না, বরং প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন তুলে যেমন নিজেদের বিবেকেরও সম্মুখীন হওয়া যায়—শিল্পবিবেক জাগ্রত রাখা যায়, তেমনি ঐ কৃতজ্ঞতাটুকুও খাঁটি ও নিপট হ'য়ে ওঠে। '৫০ এর গল্পলেখকেরা যে বড়ো কারণে আমাদের স্মরণীয়, তা যতোখানি সাহিত্যগত তার চেয়ে অনেক বেশি ইতিহাসগত ঃ আমাদের গল্পেতিহাস, তথা সাহিত্যেতিহাসের, একটি বিশেষ লগ্নে তাঁরা দণ্ডায়মান। মোটামুটিভাবে '৫০-এর গল্পকারগণ একটি বৃহৎ বিচিত্র বৃত্ত তৈরি করেছিলেন ঃ জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, হাসান হাফিজুর রহমান, আতোয়ার রহমান, আবুবকর সিদ্দিক, মুর্তজা বশীর, আনিস চৌধুরী, ফজল শাহাবুদ্দীন, হুমায়ুন কাদির, হাসনাত আবদুল হাই, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, আহমদ মীর, মনসুর আহমেদ, শওকত আলী, টিপু সুলতান, ফজলুল হাসান ইউসুফ, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, হাসান আজীজুল হক, রাজিয়া খান; ছিলো রোম্যান্টিক বলয়, কল্প-বাস্তব বলয়, বাস্তব বলয়; ছিলো আহমদ মীরের প্রযত্নপ্রসাধিত বিস্ময়জাগৃতির গল্প, সৈয়দ শামসুল হকের লিরিক উৎসারণ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের স্বগত সন্ধান, হাসান আজীজুল হকের আঞ্চল আবহ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্‌র অসাধারণ বাক্‌-ও অর্থ-ঘন গল্পসমুচ্চয়—যা সমগ্র বাংলা গল্পেতিহাসেই আলাদা আসন দাবি করতে পারে, জহির রায়হানে '৫০-এর কল্প-ও বস্তু ঘন দু-রকমের প্রতিভূ-গল্পের ধারাই প্রবহমান। এইসবেরই মধ্য দিয়ে 'আধুনিক' চেতনার সঙ্গে ছোটোগল্প বিবাহিত হ'লো। কিন্তু আলাদা ভাবে দেখলে '৫০-এর অনেক গল্পই অসফল বা অসফলপ্রায়, অনেক

গল্পকার কাহিনীকারিগর মাত্র। '৬০-এর গল্পকারদের মূল সাহসের সাথে দেখা হয়েছিল মাত্র কএকজন '৬০-এর গল্পলেখকের ; এঁরা : হুমায়ুন চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। এঁদের গল্প আন্তর-ও বহিঃপৃথিবীর দোলাচলে রচিত হ'তে থাকে। এঁরা সবাই জীবনের পীড়ায়, বা উচ্চাশায়, গল্প রচনা ছেড়ে দিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে এখানকার গল্প সহসা এক বালুগ্রাসে পতিত হয়েছে। উত্তরাধিকারচ্যুত হ'য়ে ছোটোগল্প অন্ধ অশ্বারূঢ়ের মতো ঘূর্ণ্যমান।

কাহিনীকেন্দ্রিক বা কাহিনীশূন্য অজস্র রচনা উৎসারিত হচ্ছে বিখ্যাত, স্বল্পখ্যাত ও খ্যাতিহীন অজস্র লেখকের কলমে। এগুলি ছোটোগল্পের আকাঙ্ক্ষায় রচিত হচ্ছে বটে, কিন্তু অতোদূর যেতে পারছে না। তার কারণ: কবিতা লেখার জন্যে যেমন ছন্দচর্চা আবশ্যিক, গল্প রচনার জন্যে ও-রকম কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে না। ফলে আরো অবাধ সুবিধা হয়েছে ছোটোগল্প নামধারী রচনা প্রকাশে ; এবং ও-রকম প্রাথমিক নিরিখও নেই ব'লে ছোটোগল্প আর অ-গল্পের বিভেদ স্পষ্ট হচ্ছে না পাঠকদের কাছে, অনেক লেখকের কাছেও। ছন্দচর্চা, ফর্ম-চর্চা কবিকে যে শিল্পশিক্ষা দ্যায়, একজন ছোটোগল্প-প্রণেতার ওরকম কোনো পদ্ধতির অনুশীলন-অনুধাবন করতে হয় না ব'লে তার বিপদ আরো বেশি : আরো বেশি এজন্যে যে ছোটোগল্প অত্যন্তরকমে প্রকরণঘনিষ্ঠ শিল্প—যদিচ তার বিষয় ও বিন্যাসের স্বাধীনতাও অসীম। আমাদের বিষয়নিবিষ্ট পাঠক, ও লেখকেরাও কেউ-কেউ, এই চেতনারই অভাবে ছোটোগল্পে বিন্যাসের প্রগাঢ় ও নবীন ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখলে বিমূঢ় হ'য়ে যান। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না : যদি বলি, আমাদের কবিতাও প্রকরণচেতনায় দীন। প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সমীভবনে আমাদের লেখকেরা যে-দিন আস্থাবান হবেন, সে দিন তাঁদের হাতে সত্যিকার ফসল ফলবে ; কেননা ইতিমধ্যেই তাঁদের অর্জনে আছে প্রাণবান, সদ্যোজাত, তেজি বিষয়পুঞ্জ। কিন্তু সাধারণ অনেক পাঠকের মধ্যেও আছে সেই ভালো ও সুকুমার বোধ, যার দ্বারা তাঁরা একটি ভালো ছোটোগল্পকে, অনেক শিল্পশোভন কুটকুশলতা না জেনেও, আশ্চর্যভাবে শনাক্ত ক'রে ফেলতে পারেন অনেক সময়।

এইখানে ঈষৎ আত্মপ্রসঙ্গ তুলতে হচ্ছে ব'লে আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা যখন গল্প লেখা শুরু করলুম, তখন, ততোদিনে, বৈশ্বিক

ও বাংলা ছোটোগল্প অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। সেইজন্যে ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার ক'রে নিয়ে, খুব স্বাভাবিকভাবেই, আমরা ধরলুম পরবর্তী পথ। আমাদের গল্প যদি বহির্লোককে অপেক্ষাকৃত কম মূল্য দিয়ে অন্তঃপৃথিবীতে প্রবেশ ক'রে থাকে, তাহ'লে তার জন্যে দায়ী বৈশ্বিক ও বাংলা ছোটোগল্পের এই দীঘল-ব্যাপক উত্তরাধিকার। অন্তঃপৃথিবীকে মূল্য দান করায়, বস্তুজগতকেই যাঁরা ধ্রুব জ্ঞান করেন, মুখ ফিরিয়ে রাখেন তাঁরা। মনে হয় এঁরা ছোটোগল্প-সম্পর্কিত একটি অচেতন সংস্কারে বাঁধা। সাহিত্যে নূতন এই শিল্পরূপটি (সাহিত্যের অপর মাধ্যমগুলির তুলনায়) যে জীবনের সার্বত্রিক রশ্মি ধারণ করতে পারে, এটা তাঁরা পুঁথিগতভাবে বোঝেন হয়তো—সংস্কারাতীত হ'য়ে নয়। একটি কবিতা যদি মরমী হ'তে পারে, একটি ছোটোগল্প কেন পারবে না? কোনো গল্পে আত্মিক সমস্যা দেখলে কারো-কারো আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তাঁরা নিশ্চিত ধ'রে নেন এ বিদেশি বা বিদেশাগত;—যেন আত্মা আমাদের নেই, আমাদের নিজস্ব কোনো আত্মিক সমস্যা থাকতে পারে না। ছোটোগল্পে যা-কিছু গতানুগতিচর্চিত, রক্ষণশীলিত, বহুব্যবহৃত এক-মাত্র তাই-ই দেশজ—এরকম ধ'রে নিয়েছেন আমাদের কোনো-কোনো লেখক-পাঠক-সমালোচক; এঁরা যে-কোনো নূতনের দেখা পেলে তাকে বিদেশি বা বিদেশাগত মনে করেন, তা যে কোনো বাঙালি লেখকের হৃদয়-মনন থেকে জন্মাতে পারে তা কল্পনা করতে পারেন না। এই সংস্কার থেকে শুধু পাঠকেরা নয়, লেখকেরাও যতোদিন-না শুদ্ধচিত্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসতে পারছেন, ততোদিন ছোটোগল্প সর্বত্রগামী জীবনকে স্পর্শ করতে পারবে না। ফলত আমাদের অন্তঃপৃথিবীর সত্যসন্ধিৎসাকে এঁদের কারো মনে হয়েছে অনচ্ছতা ও দুর্বোধ্যতা; কারো অভিযোগ আমাদের গল্পগুচ্ছ অবক্ষয়িষ্ণুতার কালো পথ ধ'রে চলেছে; কেউ মনে করেছেন আমরা বড়ো-বেশি প্রকরণচেতন। 'জীবন' ও 'অভিজ্ঞতা' —এই শব্দদ্বয় এঁরা প্রায়শ ব্যবহার ক'রে থাকেন, এবং ব্যবহার ক'রে থাকেন ভুল অর্থে। 'জীবন' বলতে এঁরা বোঝেন 'বহির্জীবন'; এবং 'অভিজ্ঞতা' বলতে বোঝেন বহির্জীবনে সংঘটিত 'ঘটনা'—অধিকাংশ সময়ে চমৎকার ঘটনাবলিকে। এ-কথা এঁদের কে বোঝাবে যে জীবন অন্তঃ-পৃথিবী ও বহিঃপৃথিবীতে সমভাবে বিমিশ্রভাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে এবং অভিজ্ঞতা মাত্রেই আত্মিক।

বাংলাদেশের গল্প হবে গ্রামভিত্তিক, যেহেতু এর অধিকাংশ অধিবাসীর জীবন তাই : এ-রকম মতবাদ মাঝে-মাঝে ধ্বনিত হয় এঁদের কণ্ঠে। কিন্তু আমাদের লেখকেরা? তাঁরা তো নগরবাসী, নাগরিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত তাঁরা, নাগরিক সভ্যতাই তাঁদের পক্ষে স্বভাবী। সুতরাং শহরে ব'সে কল্পিত গ্রামের গল্প রচনায় একটি ফাঁকি থেকে যায়। উপরন্তু গ্রামের তথাকথিত অন্ত্যজদের নিয়ে গল্প লেখার একটি ঝোঁক আছে, যদিচ তাঁদের জীবনের সঙ্গে লেখকদের পরিচিতি আরো ক্ষীণ একেবারে ক্ষীণ। আমাদের শহরগুলি এখনো নাগরিক যাতনা ও আনন্দের অংশিদার হয়েছে কিনা এই প্রশ্নও ওঠে। অন্তত অংশত হয়নি কি? গ্রাম-শহরের মধ্যেকার পতনোন্মুখ, বা ইতিমধ্যেই পতিত, সেতুটি কেন্দ্র ক'রেই তো অজস্র গল্প রচিত হতে পারে। আরো : নগরবাসী এইসব গল্পকারেরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান; কিন্তু তাঁদের রচনায় যখন সে-জীবনের দুঃখে-সুখে তাঁরা লালিত হচ্ছেন, সেই মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের বিন্দুতম ছায়াসম্পাত ঘটে না, তখন কি মনে হয় না কোথাও ফাঁকি থেকে গেলো। অন্য একটি প্রসঙ্গও আমাকে তুলতে হচ্ছে। আমাদের সরলমনা লেখক-পাঠক-সমালোচকদের এরকম একটি ধারণা আছে যে, মুসলিম সমাজের চিত্রাঙ্কন করলেই গল্প 'অনাধুনিক', 'অপ্রগতিশীল' বা ধর্মীয় হ'য়ে পড়বে। কিন্তু জীবনের সঙ্গে ধর্মের যে সম্পর্কই থাকুক (সেই জটিল বিষয় আমাদের প্রসঙ্গভূত নয়), জীবনাচরণে সংস্কৃতিতে বিশেষ ধর্মের ছাপ প'ড়ে থাকেই : আমাদের জীবনযাত্রায় তার স্বাক্ষর অনপনেয়ভাবে মুদ্রিত। আমাদের অধিকাংশ গল্পলেখক এসেছেন মুসলিম সমাজ থেকে, এদেশের অধিকাংশ জনসাধারণও তাই, সুতরাং গল্পে মুসলিম সমাজের চিত্র থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের গল্প থেকে মুসলিম সমাজের কোনো অব্যবহিত ছবি, জীবনাচরণের সাধারণ কিন্তু আবশ্যিক চিত্র গোয়েন্দা লাগিয়েও পাওয়া দুষ্কর (এক-ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অতিরঞ্জিত রচনার কথা বলা হচ্ছে না। আবার, আমাদের ধর্মধ্বজীদের নিয়ে চমৎকার সব গল্প লেখা যেতে পারে, লেখা উচিতও; কিন্তু আমাদের ধর্ম সমাজ তা স্বীকার বা সহ্য করতে এখনো নারাজ। লেখকরাও ঐ সাহসে বঞ্চিত। এই উভমুখ সমস্যায় আমাদের ছোটোগল্প থেকে মুসলিম সমাজের আবশ্যিক ছবি (আমি আবার বলছি : ভালো বা মন্দের কথা বলা হচ্ছে না, তার আবশ্যিক জীবনাচরণের কথকতা যে-ঘনিষ্ঠ জীবনাচরণের ছবি দাবি করে—তার), সেই আবশ্যিক

ছবি পাচ্ছি না। মোট কথা : আমাদের গল্পলেখকেরা অধিকাংশই নগরবাসী, মধ্যবিত্ত, মুসলিম সমাজের সন্তান; কিন্তু তাঁদের রচনায় নগর, মধ্যবিত্ত জীবনযাপন ও মুসলিম সমাজের ছবি অতিবিরল। ফলত এদেশে যাঁরা বাস্তবপন্থী গল্পকার ব'লে পরিচিত, অথবা তার প্রবক্তা, তাঁদের গল্পধারা অত্যন্ত খণ্ডিত।

অন্য-একটি বিষয়, যা খানিকটা মজারও বটে, সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই। ছোটোগল্পলেখকেরা গল্প রচনা করেন গদ্যে; কিন্তু সেই গদ্যেই তাঁরা সাধারণত ছোটোগল্প সম্পর্কে, কিংবা তাঁর পূর্বজ, উত্তরজ বা সমসাময়িক গল্পকারদের সম্বন্ধে, কিছু লেখেন না। দৈববলে সে-রকম যদি ঘটে, এবং সে রকম ঘটে একমাত্র ফরমাশে, অন্তঃপ্রেরণায় নয়—তাহ'লে তার মধ্যে মননের অংশ থাকে শোচনীয়ভাবে সীমিত। এরকম গল্পলেখকদের দুএকটি আলোচনা আমি পড়েছি, যা পরবর্তী গল্পলেখকদের প্রতি ক্রোধে ও আক্রোশে প্রপূর্ণ। এটা হ'তে পারে যে গল্পকারগণ কেবলমাত্র তাঁদের গল্পমাধ্যমেই আপন-আপন বাণী রাষ্ট্র করতে চান, কিন্তু এ কি অস্বাভাবিক নয়, যখন দেখি যে কবিতা বা নাট্যের চর্চা যারা করেন তাঁরা কেবল সৃষ্টিশীলতায় নয়, প্রবন্ধাকারেও তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন? আরো মজার ব্যাপার এই : যাঁরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শরিক হ'তে চান, তাঁরা তাঁদের একান্ত-পার্শ্ববর্তী সহজীবীদের সম্বন্ধে শীতল গভীর নীরব উদাসীনতা পালন করেন।

গত পঁচিশ বছরে বহু বিচিত্র ঢেউ ব'য়ে গেছে এদেশের উপর দিয়ে : দাঙ্গা, ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস; দেশবিভাগ; নূতন দেশের জন্ম; স্বপ্ন, যুদ্ধ, স্বপ্নভঙ্গ—একের পর এক তরঙ্গের ঝাপটা উঠেছে; আন্দোলিত হয়েছে বারেবারে আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন, আমাদের জনমানুষেরা অনেক প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত অতলস্পর্শ অনুভূতি-বিচিত্রতায় ঝংকৃত হয়েছে। এই চলিষ্ণু বিচিত্রিত ঝংকার স্বাভাবিকভাবে একএকটি ছোটোগল্পের তন্ত্রীতেই আঘাত তুলতে পারতো সবচেয়ে বেশি, চিরকালের জন্যে রেখায়িত হ'য়ে থাকতে পারতো, ছোটোগল্পের পক্ষেই সহজ সম্ভব ছিলো এই ঝংকার ও রণনগুচ্ছকে পুঞ্জীকৃত ক'রে রাখা—কিন্তু ছোটো গল্প তাতে ব্যর্থ হয়েছে, সাধারণভাবে আমাদের সাহিত্যেই ও-সবের স্বাক্ষর পড়েছে অতাল্প, ছোটোগল্পে দুর্লভ, শুধু আমাদের কবিতায় ইতস্তত স্বাক্ষরিত হ'য়ে আছে, সে-ও খানিকটা ভুলভাবেই। যা ছিলো কথকতায়

কাজ, আমাদের কবিতা তা সম্পূরণ করতে গিয়ে কথকতার লাভ হয়নি, কবিতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কবিতা, ছোটোগল্প, এবং সাহিত্যের অপরাপর মাধ্যমগুলি ক্রমাগত অপরের কাছ থেকে পরিগ্রহণ করলেও, তাদের অন্তিম চারিত্র্য অপরিবর্তিত র'য়ে যায় ব'লেই আমি মনে করি। সুতরাং যে-প্রাপ্তি আমাদের ছোটোগল্পের কাছে কাম্য ছিলো, কবিতা তা কোনোকালেই পূরণ করতে পারে না ঃ কবিতা যখন সেই অসাধ্য সাধন করতে গেছে, তখন তা হ'য়ে উঠেছে সমসাময়িক শস্তা ভাবোচ্ছ্বাসের ক্ষণিক-রঙিন জনচিত্তের উপরিতল-বিজয়ী বুদ্বুদ।

এদিকে অন্তঃপৃথিবীর পথ ধ'রে চলতে-চলতে, বহিঃপৃথিবীর তরঙ্গে আন্দোলিত হ'তে-হ'তে, আমরা ক্রমশ অন্যএক উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছি। আমরা জেনেছি ঃ কথকতা শুধু কালের বিষয় নয়, এতে সমভাবে দেশেরও প্রসঙ্গ লগ্ন। আমরা দেখেছি ঃ বৈশ্বিক ও বাংলা ছোটোগল্পের উত্তরাধিকার আমাদের উপর অর্শেছে, সময়ের দায় মেটাতে চেয়েছি আমরা ; কিন্তু যে-বিশেষ জনপদ আমাদের আশ্রয় কথাশিল্প দাবি করে তারও বহিরূপায়ণ, যে-বিশেষ সাহিত্যধারার সন্তান আমরা তার প্রতি দায়িত্ব আছে আমাদের এবং ঐ বিশেষ জনপদের অস্পৃষ্ট জনমানুষেরাও আমাদের জন্যে অপেক্ষমান। ত্রিবিধ এই দায়িত্বের চাপে—যা বহিঃস্থ মতবাদে বা প্রতি-মতবাদে নয়, আমাদেরই আভ্যন্তর উপলব্ধির দান—ত্রিবিধ এই দায়িত্বের চাপে আমাদের কম্পাশের মুখ এখন ঘুরে যেতে চাচ্ছে বহির্লোকের প্রতি—যে-বহির্লোককে আমাদের সমকালীন পূর্বজেরা মূল্য দিয়েও, সর্বাংশে তো দূরে থাক, ইতস্তত মাত্র স্পর্শ করেছেন। যে-ভিত্তিভূমি পূর্বজদের গড়ার দায়িত্ব ছিলো তা তাঁরা সম্পূর্ণ করতে পারেননি ব'লেই পরবর্তীদের উপর ভার পড়েছে বস্তুধর্মী গল্প রচনার ; কিন্তু তাঁদের স্ব-সময়ের দায়িত্বও বিস্মৃত হ'য়ে গিয়ে নয়—ফলে তাঁদের উপর যে-দায়িত্ব এসে পড়েছে তা বহুদিক্‌স্পৃশী। বাংলাদেশের অজস্র ভূমি ও জনমানুষ এখনো অস্পর্শিত র'য়ে গেছে ; এখনো মানসলোকের বিবিধ জিনিশ উচ্ছিষ্ট হয়নি—নূতন ছোটোগল্প এই যুগল ধারাকে স্বাঙ্গীকৃত ক'রেই অগ্রসর হ'য়ে যাবে। অন্তঃপৃথিবী ও বহির্লোক—দুয়ের সম্মিলিত সৌজন্যে রচিত হবে পরবর্তী, নূতন, আসন্ন গল্প। পঁচিশ বছরের গল্পস্রোত সেই অন্তর্লোক বহির্লোকস্পর্শী মোহানায় কবে প্রবেশ করবে, আমরা আছি তারই [illegible]ক্ষায় ।।

এক শস্যপর্যায় ঃ কবিতা

হ'তে পারতো এই ক্রান্তিমুহূর্ত আকস্মিকে দীপ্র,—আকস্মিকে, আবার অবিচ্ছিন্নতায় লগ্নও বটে, যদিচ প্রতিটি নবপ্রবেশের সময় সহসা তীব্রতায় ধনুকের মতো টান-টান হ'য়ে ওঠে। তা হ'য়েছিলো ঃ ১৯৬০-এর লগ্নপ্রাথম্যিকে যথারীতি আলো জলেছিলো, দীপের সন্তানেরা গিয়েছিলো দাঁড়িয়ে সারি বেঁধে, ধনুকে লেগেছিলো টংকার, আর এক তীব্র ঝননরননে প্রবীণেরা ন'ড়ে'চড়ে বসেছিলেন, আমাদের সাহিত্যে এক নবীন হৈ-হৈ দল যেন খানিকটা জোর ক'রেই প্রবেশ করেছিলেন রঙ্গভূমিতে। কারো সেই সূচনা—উত্তরবর্তী কালের অগ্রসরণের, কারো-বা সেই প্রথম জাগরণ—এবং অন্তিমা। আজাদি উত্তরবর্তীকালের একসঙ্গে এতোগুলি লেখকের উন্মীলনের উপমা ঠিক তার পূর্ববর্তী দশকেই প্রাপ্তব্য ; কিন্তু এই অতিতরুণেরা যা করেছিলেন, বা আরো সঙ্গত হয় যদি বলি ঃ যা করতে চাচ্ছিলেন, অগ্রজেরা জীবনে তার মোকাবিলা করেননি, হয়তো দু একজনের কবিতাবিন্যাসে তার খানিকটা আভাস আবছায়িত ছিলো মাত্র। ইতিমধ্যে কোথায় যেন নবীনদের এই দাঁড়ানোর চাতালে ফাট ধরেছে, যেন একটু-বা মিইয়ে এসেছে উৎসাহের স্রোতোবাশি। এই সময়টি শুধু তরুণদের ব্যক্তিগত উন্মীলনের পর্ব নয়, সামগ্রিকভাবে আমাদের সাহিত্যেও উপহার দিয়েছে কিছু ফসল, সেই ফসলের জাত আলাদা, সেই ফসলের চাষ স্বতন্ত্র। সেই ফসল পরিমাণে সামান্য হ'তে পারে, কিন্তু তা-ই সবুজ সওগাত—আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন, নবীন, নব্য। তাই এই মুহূর্তে, ষাট দশকের প্রান্তে এসে, দশকের প্রান্তভূমিতে দাঁড়িয়ে, সময় যেখানে গড়িয়ে গেছে অপর দশকের উৎরাই-এ, একবার সেই স্মৃত ও অবিস্মরণ ও চলতি মুহূর্তগুলি ফিরিয়ে আনা জরুরি।

কী সেই নূতন, যা এনেছিলেন তরুণেরা, যা বাংলা সাহিত্যে নূতন রক্ত সঞ্চার করেছে? বাংলাদেশের কবিতায়? যদি এই জিজ্ঞাসার বর্তনশীলতা শুরু হ'য়ে যায়, এই সব জিজ্ঞাসার, তৎক্ষণাৎ আমাদের অভিনিবেশ পড়ে দূরমণ্ডলে। পঞ্চাশ দশক, চল্লিশ দশক, তিরিশ দশক: ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। তিরিশ দশকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই: সেই দশকের কবিকুল অতিরৈবিক শৃঙ্গারে ক্লান্ত, স্বরূপের অভাবী অপিচ অতিপ্রজ; কিন্তু পরোক্ষ সূত্রসন্ধানী যোগ আছে: বর্তমান দশকও সেইমতো নিরনুভব উদগীরণে ও নিঃসরণে ক্লান্ত ও ক্লান্তিহীন। চল্লিশ দশকের স্বরসঙ্গতি, তার মহাজনেরা, সুখ্যাত সেই চতুরঙ্গ জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে, তাঁদেরই পিছন-বেঞ্চির কবিত্রয় বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অজিত দত্ত), এবং অব্যবহিত পরবর্তী কবিযুগ (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সমর সেন)—এঁদের সমবায়ী স্বাক্ষর বিভিন্ন কোণ মোড়-বাঁক ঘুরেও এখনো হায় জয়ী এবং বর্তমান দশকভুক্ত কবিসম্প্রদায় সম্ভবত এঁদেরই বিস্পষ্ট পৌত্রের পর্যায়ী। পঞ্চাশ দশকের কবিসংঘ একটু স্ফারিত এবং মূলত চল্লিশেরই অংশভাক। অনন্তর, এই নূতনের কেতন উড়েছে, এই ষাট দশকের।

কিন্তু এঁরা কি স্বয়ম্ভর? নাকি নেহাৎ পরনির্ভেকী? পরজীবী? শূন্যসন্ততি?—তার উজ্জ্বল উত্তরে জানাই, পঞ্চাশের কবিবংশে যে-অতৃপ্তি ছিলো না, পূর্বজের প্রতিধ্বনিতে শূন্যঅবলেহনে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের নির্বিকল্প সমীভবনে যে-নিটোল নির্কবিতা নির্মিত হ'তো, এঁরা সেখানে উৎকীর্ণ করলেন চীৎকার, বস্তু ও স্বপ্নের বিমিশ্র অক্ষর দারুফলকে হাতুড়ির আঘাত পেরেকের মতো প্রবেশ করলো, যেন বাস্তবিক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও স্বাপ্নিক শাহাদাৎ হোসেন মায়াবীর মতো জাদুবলে রসায়িত হ'লেন যতো সব অধুনাতন কাব্যপ্রচেষ্টাবান তরুণের দ্বারা পরিচালিত সংরক্ত পত্রালিপুঞ্জে। হাঁ, সংরাগ, গাঢ় সংরাগ: এই কথাটি ষাট দশকের বহু কবিতার প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে। এবং এই কথাটি তারুণ্যের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, যে-অবক্ষয়িষ্ণু কবিতার পালা শুরু হ'য়েছিলো চল্লিশ দশকের পায়ের আঙুল থেকে, চকিতে ও এক-মুহূর্তে তার সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, গ্লানিম ঘুচিয়ে দিলে এই আবেগসান্দ্র সংরাগ-দীপিকাখানি। যেন শবে-বরাতের

সন্ধেবেলা চঞ্চল আগুন একের পর এক জ্ব'লে উঠলো কএকজন সোনালি বালকের কএকজন রূপোলি বালিকার প্রদীপাশ্বয় থেকে। সেই প্রদীপিত দীপাবলিই ষাট দশকের কবিতাগুচ্ছ।

হয়ত সে-ও উপাংশু, চল্লিশের রশ্মিবিথারে গুচ্ছীকৃত কিন্তু সারা গায়ে মেখেছে সে শাশ্বত খোলশ—কবিতার সংরাগ, প্রেরণা, উত্তেজনা : এই তার মৃত্যুত্তীর্ণ উৎস, সে পরোয়া করেনি কবিতার নিয়মাবলির, নিজের নিয়মে সে দুর্ধর্ষ, আর সেই নিজের নিয়মই কবিতার স্বয়ংসিদ্ধ নিয়ম, স্বয়ম্বর আইন, আবেগে সে উড্ডীন আর কে-না জানে আবেগই কবিতার মূলধন, আবেগ যদি মাঝপথে খেই না-হারায় তা'হলে সেই জঙ্গম স্রোতেই কবিতার স্থির নিদিধ্যাসন রচিত হ'তে পারে।

আরো পাশ্বিকে নামি :—কেননা কবিতা যদিচ শাশ্বত ভাস্বর প্রকাশরূপ মানে, তবু কাব্যবিবেচনা আসলে পরিপ্রেক্ষিতেরই চাকর। ষাট দশকের একজন বাংলাদেশি তরুণ কবির সংকট কোন ফাটলে, সংকটনির্মুক্তি কোন পথে? সমস্যার ঘরেই থাকে নির্মোচনের দরোজা। সামনা করছেন তিনি দু-রকম জিজ্ঞাসাচক্রের : একদিকে আছে সামান্য বাংলা কবিতার প্রতাপ, আর-একদিকে বাংলাদেশের উভয়ার্থে পূর্বজ কবিতার চাপ; ষাট দশকের কবি অনুভব করলে, তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে হবে চল্লিশের কবিত্বমণ্ডল ও পূর্বজ কবিতার পশ্চাদ-ভার থেকে যেতে হবে এগিয়ে। শেষপর্যন্ত, দেখা গেলো, সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে চল্লিশের সমবায়ী দুর্ধর্ষ শিকারীদের সঙ্গেই—যদি সেই কবিতার সংকটসময়কে অরণ্যের সঙ্গে তুলনা দেয়া যায়; কারণ, মূলত পূর্বজ কবিতা চল্লিশের মোহিনী মণ্ডলেরই অন্তঃপাতী। যুবশোভন সংরাগের তলোয়ারে নেতিয়ে-পড়া বায়ুজীবী কবিতা যেন এক-মুহূর্তে চেতিয়ে উঠলো ফের। হ্যাঁ, খানিকটা অসংস্কৃত কিন্তু কিছুমাত্র জং-ধরা নয়—এই প্রেরণাপ্রেরিত সংরাগই বাংলা কবিতায় ষাট দশকের প্রধান দান; এবং পরোক্ষপ্রতিমা রচনা ক'রে বলা যায় 'চল্লিশের কবিত্বলোক অতিক্রম ক'রে যেতে হবে' এই অন্তর্জ্ঞানও সঞ্চার করলেন তাঁরা সহজীবী ও উত্তরজীবীদের মনে, শান্ত মানসসরোবরে অস্তিত্বপ্রভব ঝড় উঠলো। মুকুলাবরণ ভেদ ক'রে দুলে উঠলো সেই ঝড়,—বিষয়ে ও ভাষাপ্রয়োগে, প্রাসঙ্গিক ও প্রাকরণিক চক্রব্যূহে এঁরা যেন প্রবেশ করলেন

যতো-সব নিষিদ্ধ দরোজা চূর্ণ ক'রে। কিন্তু এইটুকু সূচনা মাত্র,—তার উত্তরবর্তী সিদ্ধির ইতিহাসের জন্যে আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে, তার স্পষ্ট চারিত্র্যের জাগরণ একান্ত ব্যক্তিগত হৃৎপদ্মের উন্মীলন ও ধ্বংসিত পুরোনোর উপর ধ্বংসাশী দুর্গের স্থাপন-এর জন্যে, আশায়, সংগীত-ভরা আশায়।

ষাট দশকের কবিতার এই ভূমিকাংশ যাঁদের নির্মাণ, তাঁরা একত্রিত হ'য়েও চিরকালের সৃষ্টিনিয়মে একাকী, ঐকিক রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়েও একক ভূমিকায় আসীন। শাহজাহান হাফিজের শান্তবলয়, আসাদ চৌধুরীর প্রকরণাঢ্য, রফিক আজাদের শারীরী শাহরিকতা, মোহাম্মদ রফিকের অধ্যাত্মঅন্বয়, হায়াৎ মামুদের স্বগত মঞ্জরী, আফজাল চৌধুরীর দ্বি ঈশমানব-দৃষ্টি, হায়াৎ সাইফের ছন্দোবাণ বিপ্রতীপে পরস্পর মেরুদূর। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ফারুক আলমগীর, জিনাত আরা রফিক, প্রশান্ত ঘোষাল, মফিজুল আলম, সিকদার আমিনুল হক, শহীদুর রহমান, ইমরুল চৌধুরী—এঁদের সচ্ছল উচ্চারণ ও নিসর্গজি উন্মেষ আলো প্রকাশের তাড়নায় মুদ্রিত থাকবে কোনো-কোনো হৃদয়ের দারুমণ্ডে। কথকতার জগৎ থেকে কোনো-কোনো তরুণ গাল্পিকের কবিতার দেশে ভ্রমণ আশ্চর্য সুস্বাদ ব'য়ে আনে। সৃষ্টি-অংশ এঁদের কারো-কারো ইতিমধ্যেই স্থগিত, স্তিমিত কেউ, কেউবা ইতিমধ্যেই বিস্মৃতিলোকে প্রয়াণ করেছেন। স্ফারবক্ষ তারুণ্যের ঝলশ দেখিয়ে দু-তিনটি শোনিতার্দ্র কবিতা লিখে নিরুপাধি ভিড়ে মিশে গেছেন মুশফিকুর রহমান। আবদুর রশিদের দীপ্তিদেহিনী কাব্যানুবাদ চোখে পড়েনি আর। তত্রাচ, সামগ্রিকভাবে, ষাট দশকে জাগ্রত প্রতিশ্রুতিবান এই কবিগণ আবার এইভাবে একটি সমবায়ী অর্কেস্ট্রায় আপনাপন কনককণ্ঠ ঢেলেছেন—চাঁদ, সোনা ও নারীর একটি আধারে মিশোনো রসায়নের মতো।

একই শামিআনার নিচে, খুব ব্যবহিত নয়, সমুদ্রসমতলে আরো কাজ চলছিলো, আরো কবিতার উৎসব। পাশাপাশি দুটি স্রোতোরেখার উল্লেখ রাখা দরকার এখানেই, যদিচ তরস্বান ষাট দশকের উপর্যুক্ত কাব্যধারাই: তার একটি প্রবীণ ও অনতিপ্রবীণদের কবিতাপাশগুচ্ছ, কখনো ঐ পাশ ছিঁড়ে সমকালিক উচ্চারণ, নির্মোচন, নিষ্কাশন কিন্তু অধিকাংশ সময়ে প্রাক্তন অয়নে বদ্ধ; অপরটি দশকের প্রান্ত থেকে জাগ্রত নূতন কবিতার

প্রবাহ যা ক্ষীণতোয়া, যা স্পষ্ট কোনো রূপ ও চারিত্র্যের অভাবে এখনো শারীরীকৃত হয়নি। অনতিপ্রবীণেরা পরিণততর হয়েছেন, কেউ-কেউ পরিবর্তিতও, হয়তো বহির্ভূমির আসরও মাৎ করেছেন কিন্তু তার আসল দখল উপর্যুক্তদেরই হাতে, অন্তত এক লহমার জন্যে হ'লেও বিধৃত ও সমর্পিত ছিলো, অন্তত তাঁরাই এই সময়ের সাক্ষাৎ সন্তান।

এ-কথা কবুল করতেও নির্দ্বিধ হওয়া উচিত যে ষাট দশকের কবি-বৃন্দের স্খলন-পতন-ত্রুটি বিপুল: বৈদেশি আবহাওয়ার প্রয়োগ, নিঃসংলগ্ন শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার, বিষয়ের এলোমেলোমি ও কৃত্রিমতা, অসংস্কৃত আবেগের রূপায়ণ, তিরিশচেতন পুনঃআবহ নির্মাণ ও সাধারণভাবে অকবিতার দোষগুলি তো বটেই। তবে, ঈষৎ চিন্তার আলোয় তলিয়ে দেখলে চোখে পড়বে: সদ্যকথিত স্খলন-পতন-ত্রুটিগুলির অন্তত কএকটি কবিতামুক্তির কল্যাণায়তনে যেমন কার্যকরী তেম্নি আসলে এগুলি গুণ-পনার পরোক্ষ বা ছদ্মবেশী নজির।

বস্তুত ষাট দশকের কবিতা যতো-না প্রযত্নপ্রসাধিত ততোধিক প্রেরণাপ্রেরিত; আবার তার পিছনে সচেতন শিরা-উপশিরায় রক্তের সঞ্চালন অলক্ষ্যে কাজ ক'রে গেছে। সমবায়ী এই কাব্যপ্রচেষ্টা এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রাখে, তার গন্তব্যের দিকে যাত্রায় এবং তার সিদ্ধিমঞ্জিল দূরাবস্থিত হ'লেও: ষাট দশকের কবিতাচেষ্টা বাংলা কবিতার শরীরে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যোজনা করতে চেয়েছিলো॥

সোনালি চুলের নীল শীত

'বাংলাদেশে সবচেয়ে রুচিস্নিগ্ধ ঋতু কোনটি?' যদি কেউ আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দেবো: 'শীত'। শীত কেন, তার উত্তর দিতে অবতারণা করবো না দারুণ যুক্তিমালার,—কারণ: ভালোবাসার যুক্তি নেই, আছে জোর, যে-আবেগের গ্লেসিআর যুক্তির নিটোল-অটল পাথরপংক্তি ধ্বসিয়ে ফ্যালে একেবারে সাতবাঁও জলের অতলে। অবশ্য গ্রীষ্মামোদিত দীঘল দুপুর বা হঠাৎ বাতাস-ওঠা বাতাস-দেয়া গা-জুড়োনো মন-কেমন-করা সবুজ গোধূলি; অবিচ্ছিন্ন ঝর্ঝর শাদা কালোয় বিতরিত সে কোন হারিয়ে-যাওয়া দয়িতার মায়াবী চোখ-চাওয়ার মতো শ্রাবণের জ্যোৎস্না-জলা শারদ-রাত—রজনী শব্দেই যার একমাত্র পরিচয়পত্র, হেমন্তের অর্ধহিম দিনগুলি বা হলুদে-সবুজে মেশা বাড়ন্ত পত্রালি ভরা চৈতী দু-প্রহর:—এই সব একদিন মনের ভিতরে দ্বিতীয়, অলীক ও স্নিগ্ধ সূর্য জ্বেলে দিতো। দিতো, কেননা দিনানুদিনের কর্মধারা, বাস্তবতা ও মনোমলিনতা, এই ভিতর-সবিতা ভেঙে ফেলেছে টুকরো-টুকরো ক'রে, আমি ক্রমশ নির্বাপিত হচ্ছি, কোন অতল থেকে কেবলি উঠে আসছে কালো বাতাস, এসে নিবিয়ে ফেলতে চাচ্ছে আনন্দ-দেয়ালি।

মনে পড়ে: কৈশোরিক সেই দিনগুলি, যখন আনভোবনান্ত বেজে উঠেছিলো শারীরী সেতার, যে-সেতারের তারগুলি রামধনু দিয়ে তৈরি। তখন শ্রাবণ হ'য়ে উঠতো আমার জন্মলগ্নের ঝর্ঝর। যে-শ্রাবণ আমাকে একদিন আরক্ত-হরিৎ ঘাসের উপর জন্ম দিয়েছিলো আবার সে আমাকে জন্মে দিতো মাংসের দেদীপ্য হরষে, বাংলার শ্রাবণ বদলে যেতো ছলচ্ছল বুকের শাওনে, চৈতালি দুপুরে গাছতলায় বিছানা-পেতে-শোয়া একলা আমার দুপাশ দিয়ে লালচে-হলদে পত্রাবলি ঝ'রে যেতো শিকলের মতন, হঠাৎ-ওঠা বাতাস দয়িতার খুনশুটি ক'রে ছুঁড়ে-মারা ফুলের মতন

গায়ের উপর নিক্ষেপ করতো শুকনো মচ্‌মচে কুঁকড়োনো একরাশ পাতা, ছোট্টো আনন্দী দুষ্টু চঞ্চল মেয়েটির মতন ঘূর্ণি হাওয়া পাতা-রাশ নিয়ে খেলতো এখানে-ওখানে এলোমেলো ; অথবা চাঁদ-ওঠা গরমের রাতে ঠাণ্ডা ও নীল হ'য়ে এসেছে শহর, লেবুর সুগন্ধি পোরা রেশমি বাতাস রাস্তা দিয়ে চলছে কুটোপাতা আর বাস্তবতা ঝেঁটিয়ে রাতের রাস্তায় ঠিক একটি আশ্চর্য গাড়ির মতন মৃদু শব্দ তুলে—চলছে আমার জীবনের অন্ধকার সমুদ্রে এই সব দিনরাত্রির আলো-জ্বলা মুহূর্ত। এখন, যখন অনুভূতি ক্রমশ ভোঁতা হ'য়ে আসছে, আনন্দধারা মিয়োনোর পথে, তখন সৌভাগ্য মানি সেই কৈশোরেই বহিঃপ্রকৃতির মতন অন্তঃশরীরের মতন শিল্পানন্দের ক্ষেত্রেও লাভ করেছিলুম একান্ত কনকপরশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবেদন তখন আমার কাছে নিঃস্ব ; বরং ভালোবাসতুম মোহিতলাল, নজরুল, জীবনানন্দ এমন কি খানিকটা সত্যেন্দ্রনাথকে। মনে হয় ঃ এঁদের কবিতার বহিঃসজ্জা আর অলংকার-মুখরতাই কিশোরের হৃদয় লুণ্ঠন করেছিলো। "ঝরা পালক" তখনই প্রথম ও শেষবারের মতো হাতে পড়েছিলো আমার, কী-যে ভালো লেগেছিলো ঃ সেই অনুভূতির বিষাদ, জীবনানন্দ দাশ, পশ্চিমের আকাশের তামা, উড্‌ডীন চিলের একটি সংমিলিত চিত্র হ'য়ে যেন মনের ভিতরে টাঙানো রয়েছে এখনো। কবির "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-ও প্রথম তখনই পড়ি, তখন তাঁকে শুধু কলেজের পরীক্ষার খাতায় প্রিয়তম কবির আসনে অভিষিক্ত ক'রেই থামিনি, ট্রেনে-চলা মুহূর্তে ছড়ানো বাংলার নিসর্গপ্রকৃতিতে স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি তাঁর কবিতার দীপিত-বিষাদিত আবহ। তাঁর উপপ্লবের কবিতা নয়, হানা দিয়ে ফিরেছিলো নজরুলের চিত্রলতা। মোহিতলাল-ও জাগিয়েছিলেন হৃদয়, খাঁচার ভিতরকার আড়ষ্ট পাখিকে, সেই তখনকার পড়া, এক দশকেরও বেশি আগের সেই প্রেমে-পড়া পংক্তিগুচ্ছ—দেখছি—এখনো জলছে মনেঃ 'ইয়ারা, তোমার পিয়ালা শপথ সেই দিনই।/শারাব খানার পথটি প্রথম নেই চিনি।/ পথে যেতে দেখি পিরাহান মোর মদ-মাখা।' একটু অকালপক্কই ছিলুম হয়তো, কিন্তু সেই ভালোবাসা কবিতার জন্যে আমার প্রথম প্রেম, শোণিতে সেই প্রাথমিক শরাবের ফিরোজা উত্তেজ। কবিতার উদ্দেশেই এখন ঐ প্রিয় লাইন দু'টি নিবেদন করতে পারিঃ 'ইয়ারা, তোমার পিয়ালা শপথ সেই দিনই।/শারাব খানার পথটি প্রথম নেই চিনি।' কিন্তু সেই প্রেমের পিরাহান পথে যেতে-যেতে ধুলোয় হ'য়ে উঠেছে ধূসরাভ, সেই

চিত্তশিখা বোরখা-পরা মুসলমানীর মতন শরীরানন ঢেকেছে, যতো দিন যাচ্ছে—ততোই যেন ক'মে আসছে ভালোবাসার বিদ্যুৎক্ষমতা। জ্ব'লে উঠে আমার অনেক দিন নিবে গেছে, লুপ্ত হয়েছে অনেক জাগর ভালবাসা, শিহর দ্যুতি,—তবু, তবু সব হয়তো ফুরোয়নি, ভাঁড়ারে কোথাও হয়তো এখনো লুকোনো আছে অগ্নিকণা, আছে অপেক্ষা ক'রে আধার-পোরা গোপন ও দীপ্ত দেশলাই, তাই হয়তো এখনো হঠাৎ এক-একটি দিন জ্ব'লে উঠছে রঙচঙে নজরুল-গীতির মতন, এখনো একটি ঋতু আলো আর স্বপ্ন আর বাণী নিয়ে আসছে ঃ শীত। কবে, কোন ছেলেবেলায় ভালোবেসেছিলাম বাংলাদেশের এই উপেক্ষিত ও রুচির ঋতুটিকে—এখন তা মনে পড়ে না। ছেলেবেলা থেকে ভালোবেসেছিলুম আমার জন্মঋতু বর্ষাধারাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ আমার মনোলোকে উদ্বোধন করতো এক আশ্চর্য চিত্রপ্রদর্শনীর, হৃদয়ে জাগাতো এক উদাস বিধুর পেলব শরীরচিহ্নহীন সুরের মণ্ডল। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকেই শীতের প্রতি পক্ষপাতও জ'ন্মে গেছে আমার। সচ্ছল সূর্যের এই আমাদের দেশে গরম কি হাঁপ-ধরানো হ'য়ে ওঠেনি কখনো? অবিরল বর্ষণ একঘেয়েমির তালে গাঁথা নয় কি? আর, বসন্তকাল যাকে বলি তা কি গ্রীষ্ম ঋতুরই বলবন্ত দখলে নয়, শরৎ যেমন বর্ষার বিস্তার? আর, সূক্ষ্মতার প্রতি আমার যতোই দুর্বলতা থাকুক অনচ্ছ হেমন্তে আমি কোনোদিন মুগ্ধ হইনি। আমি ঘনতার পক্ষপাতী, সান্দ্রতার, উজ্জ্বলতার কেন্দ্রে অভিসার আমার। হয়তো এসব আমার চরমপন্থী মনোধারা প্রকাশের রাস্তা, রঞ্জিত প্রতীক। কিন্তু আমি যা চাই তা এই তো ঃ আমার বইএর মলাটে রঙোচ্ছলতা, মেয়েদের শাড়ি-কাপড়ে উজ্জ্বল ও তেজি বর্ণবিন্যাস—তবে, বলা বাহুল্য, রুচিমনস্কভাবে। ব্যতিক্রমী দু'একটি দিন বাদে—যেমন ঃ ঘুম-ভাঙা চন্দ্রচূড় এক শরৎ-নিশীথে দেখা বিশদ জ্যোৎস্নার প্রপাত কি হেমন্তের আবছা কেকের মতো বিকেলে ফসল ভরা মাঠ পেরোনো—এ-রকম দু-একটি দিন বাদে শীতের প্রতি আমার ভালোবাসা ছেলেবেলা থেকেই জাগ্রত ছিলো। কুয়াশাক্রান্ত ভোরবেলা ভেঙে হাঁটতাম রোজ আমরা প্রায় সূর্যের ভিতর দিয়ে ঃ নীলাভ কুয়াশার মধ্য দিয়ে সোনা-রঙের এক-একটি বড়ো-বড়ো কিরণ নেমে এসেছে উজ্জ্বল তক্তার মতো, তরুণ ফুলকপি মুলো শরষে ফুলের খেত ভরপুর, চোখে স্বপ্ন বিন্দু জলছে সোনা। নিরালা এই সোনা মাড়িয়ে ভোর-ভ্রমণ করেছি

কতোদিন শৈশব সখাসখীদের সঙ্গে। ভয়-ভয় ইশকুল পরীক্ষা শেষ হ'য়ে যেতো; রাতে লেপের তপ্ত-কোমল পরশের নিচে দিব্যি শুধু চিন্তাহীন উদ্বেগহীন এলোমেলো গল্পের উন্মেষ, শুয়ে থাকাই কতো মধুর-মনোরম। আর দুপুরবেলা রোদে ব'সে থাকা যেন হাওয়ায় নেবুফুলের সুবাস নেওয়া যদিও কোথাও নেবু-ফুল নেই। খাওয়া-দাওয়ার দিক থেকেও এই ঋতু আমাদের দেশে সবচেয়ে সুখদ ঃ শস্তা, বিচিত্র ও সুপ্রচুর তরিতরকারির দেশ।

অথচ বাংলা সাহিত্যে এই ঋতুর কোনো প্রভাব নেই। গ্রীষ্মবহুল ও বর্ষাবহুল এই দেশ সত্যি, কিন্তু আমার কাছে এদেশের সবচেয়ে সুন্দর ঋতু শীত, সবচেয়ে রুচিবান ও সুখদ ঋতু শীত। এ-দেশে এ রকম শীত পড়ে যা আমাদের শরীরের পক্ষে সহনশীল, আনন্দকর বরং। পাশ্চাত্যের মতো এ-দেশে তুষারপাত হয় না, বরফ জমে না, গাছপালা নিষ্পত্র হ'য়ে ওঠে না, পাখি পালায় না অন্য দেশে। ও দেশে সত্যিকারভাবে ও সাহিত্যে শীত তাই হ'য়ে ওঠে বিনাশের প্রতীক। ইংরেজি তথা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যপ্রভাবী বাংলা সাহিত্যেও শীত হ'য়ে ওঠে শবাচ্ছাদ। বাংলাদেশের উজ্জ্বল-মধুর শীত বাংলা সাহিত্যে কবে তার আতপ্ত-কোমল দ্যুতি বিতরণ করবে, তার কথা ভাবি। শীতের পক্ষে এই-যে এতো কথা বলছি, তা হয়তো এখন এই লেখার মনো-মণ্ডলে শীতের দখল আছে ব'লেই। হয়তো অন্য ঋতু যখন আসে, তখন তা-ও খানিকটা ভালো লাগে, তা না-হ'লে বেঁচে থাকি কোন মধুরের উৎস পান ক'রে। তবু মৃদু ঘাসে বেতের চেআর পেতে উজ্জ্বল রোদে পিঠ দিয়ে এক-গুচ্ছ বই আর সাময়িকীর অক্ষরবিন্যাসে ভরা এই যে একটি ছোটো দিন চ'লে গেলো, এর কি তুলনা পাবো কোথাও? আর, এখন, ইলেকট্রিক আলোর সামনে ব'সে, এলোমেলো কম্বলের উষ্ণতা শরীরে মেখে, এই-যে লিখে চলেছি, এর পিছনে চলছে কাজের সুখ, নরম তাপের সুখ, হৃদয়ের দ্যুতি। এই শীত-রাতে, আরো—আরো অনেক রাত পর্যন্ত আমি লিখবো, ইলেকট্রিক আলোর তলায় বাণী পাবে আমার স্বপ্নরাজি, অন্য লেখার নকশা আঁটবো, ভাববো, লিখবো, পড়বো, বিরতি তারপর, অপেক্ষা ক'রে আছে বিছানা, চতুর্দিকে হিমের ভিতর তাপের খোড়ল তৈরি ক'রে আমি আবার স্বপ্ন দেখবো, দেখতে-দেখতে, রাতের এক আশ্চর্য কারখানার মতো শব্দ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়বো এক সময়॥

'শিল্পকলা' ঃ একটি লিট্‌ল্‌-ম্যাগাজিনের নেপথ্য-গল্প

১৯৬৯-এর শীতকাল। চাকরি-ব্যপদেশে তখন আমি সিলেটে। আমাদের কর্মক্ষেত্রে এলো এক উজ্জ্বল চঞ্চল-উৎসাহী তরুণ ঃ আবদুস সেলিম। এসেই মাতিয়ে তুললো আমাদের শীতের রোদের মতো, আমাদের ঈষৎ-ঝিমিয়ে-পড়া জীবননাট্যে বেজে উঠলো সুর-স্বর-স্বনন। আমার মতোই ঢাকা-র সন্তান সে, আমার মতোই ঐ রাজধানী তার রক্তে মিশেছে, দুশো মাইল দূর থেকে শোনিতের শিকড়গুচ্ছ ধ'রে টান দিচ্ছে মায়াবী। আর আমরা দুজনই সাহিত্যের ছাত্র, সাহিত্যের অধ্যাপক, না-লিখলেও সাহিত্যের প্রতি রক্তের টান রয়েছে সেলিমের। সবচেয়ে বড়ো কথা ঃ উত্তম তার বাঁধ মানছে না, কিছু-একটা করা চাই। হেজে-ম'জে-যাওয়া পুরোনো পুকুর নয় সে, উচ্ছল নির্ঝর ঃ নিজেও সে দুপুরবেলা ঘুমোয় না, আমাদেরও ঘুমোতে ছায় না, ঘুম কেড়ে নিয়ে নেমে পড়ে শত-রকম চাঞ্চল্যের মাছ ধরতে। আর, সবার চেয়ে স্বভাবের কোনো-কোনো মিলনদাক্ষিণ্যে, তার সঙ্গে জ'মে উঠলুম আমি। এবং একদিন আমাদের এক-বন্ধুর অফিসকক্ষে ব'সে একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনাও ক'রে ফেললুম, নামও ঠিক হ'য়ে গেলো ঃ 'শিল্পকলা'। ইতিমধ্যে ঢাকা-য় বদ্‌লির আদিষ্ট হয়েছি আমি, আমার আনন্দ ছাখে

'শিল্পকলা'

প্রথম সংকলন ঃ ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুআরি ১৯৭০
দ্বিতীয় সংকলন ঃ চৈত্র ১৩৭৬, মার্চ ১৯৭০
তৃতীয় সংকলন ঃ কার্তিক ১৩৭৭, সেপ্টেম্বর ১৯৭০
চতুর্থ সংকলন ঃ ফাল্গুন ১৩৭৮, ফেব্রুআরি ১৯৭২
পঞ্চম সংকলন ঃ বৈশাখ ১৩৭৯, এপ্রিল ১৯৭২
ষষ্ঠ সংকলন ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, জুন ১৯৭২
সপ্তম সংকলন ঃ পৌষ ১৩৭৯, ডিসেম্বর ১৯৭২
অষ্টম সংকলন ঃ বৈশাখ ১৩৮০, এপ্রিল ১৯৭৩

কে, কিন্তু আমার স্বলাভিষিক্ত জন আসছে না ব'লে আমি ঢাকা-র উদ্দেশে পাড়ি জমাতে পারছি না, কিশোরের মুঠোর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রজাপতির যে-অস্থিরতা—সিলেটের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমারও সেই দশা। যদিও এক-বাড়িতেই থাকি, তবু সেখানে আমরা এসব কথা তুলি না—ও যেন এক নিষিদ্ধ আনন্দ, গোপন হর্ষ, লুকোনো মজা—আনন্দে উৎসাহে জলজ্বল করতে-করতে সিলেটের সবচেয়ে সুন্দর নির্জন দ্বিতল হোটেলে বিকেলে বা সন্ধেবেলা চ'লে যাই আমরা দুজন, একটি একক ও আলাদা ও নিভৃত জায়গা না-হ'লে যেন আমাদের দুজনের স্বপ্নকে লালন করা যায় না। ঢাকায় আসার স্বপ্ন 'শিল্পকলা'র কল্পনা-পরিধি কিংবা পরিকল্পনার মধ্যে ধ'রে রাখি দুজন।

এর কিছুদিন আগে থেকেই, ঢাকা-য় আসার আগে থেকেই, একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছে মনে-মনে লালন করছিলুম। 'শব্দশিল্প' নামে আমার সম্পাদিতব্য-প্রকাশিতব্য একটি কবিতাপত্রের বিজ্ঞাপনও মুদ্রিত হয়েছিলো 'কণ্ঠস্বরে'। সে-ইচ্ছেরও দীর্ঘ পটভূমি আছে।

ইশকুলে যখন পড়তুম, বেশ নিচু ক্লাশেই: ফাইভ কি সিক্স-এ হবে বোধ হয়, তখন, খুব সম্ভবত 'প্রভাতী' কি এম্নি কোনো নামের একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বের করেছিলুম। দু-তিনটির বেশি সংখ্যা বেরোয় নি, আর সেটিকে ঠিক দেয়ালপত্রও বলা চলবে না, কেননা পত্রিকাটি আমরা টাঙিয়ে দিয়েছিলুম আমাদের বাড়ির সামনের গ্যাশ-লাইটপোস্টে। পত্রিকাটির জন্যে লেখা তো লিখেছিলুমই, এমনকি—মনে আছে—একটি কার্টুনও এঁকেছিলুম আমি। খোকন নামে আমার তৎকালীন কিশোর-বেলার এক বন্ধুর সঙ্গে এই কর্মটি করেছিলুম।

এর পর, কলেজে, আমরা পাঁচজন বন্ধু একটি গোপন সাহিত্যচক্রের মতো হ'য়ে উঠলুম: সিকান্‌দার দারা শিকোহ (আমার পুরোনো বন্ধু, ইশকুল-জীবনের, কবি আবদুল কাদিরের ছেলে—বাকি বন্ধুরা নূতন, কলেজলব্ধ), মফিজুল আলম, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আমিনুল ইসলাম (বেদু), আর আমি। 'ময়ুখ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনাও নিয়েছিলুম আমরা, পরিকল্পনার চেয়ে খানিক দূর অগ্রসর হ'য়ে, তারপর তার আলো অর্ধপথে ভেঙে যায়—এসে পড়েনি আর।

আমাদের সেই গোপন বাসনা ফ'লে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় কি তৃতীয় বছরে আমরা বের করলুম আমাদের বহু দিনের সাধআহ্লাদের একটি মুদ্রিত প্রতিরূপ : 'সাম্প্রতিক'। 'সাম্প্রতিক'-এর সম্পাদক ছিলো শাহজাহান হাফিজ—যে ছিলো আমাদের নূতন লেখক-বন্ধু, নূতন ছিলো আর একজন : লতাফত হোসেন (১৯৭১ সালে নিহত হয়েছে)। সিকান্‌দার দারা শিকোহ্‌ আমাদের সংস্পর্শ থেকে স'রে গিয়েছিলো। পলওএল-এ ছাপা, মোটা কালো লম্বিত একটি রেখার পাশে জ্বলজ্বলে কালো বর্জাইস হরফে আমাদের 'সাম্প্রতিক'-এর উদ্যোক্তা বা কর্ণধারগণের নাম মুদ্রিত 'সাম্প্রতিক'-এর চমৎকার প্যাডখানি মনে আছে আমার এখনো। এই পত্রিকার বীজ প্রোথিত হয়েছিলো কলেজে থাকতেই, তার প্রমাণ : এর উদ্যোক্তাদের সকলেই ছিলো ঢাকা কলেজের সহপাঠি প্রাক্তন ছাত্র। 'স্বাক্ষর' প্রথম সংখ্যা বেরোনোর অনতিকাল পরেই, সম্ভবত, বেরিয়েছিলো 'সাম্প্রতিক'। মাত্র একটি সংখ্যাই। অনেক পরে 'সাম্প্রতিক' আবার বেরোতে থাকে; এখন 'সাম্প্রতিক'-এর কর্তৃত্ব বদল হয়েছে—চরিত্রও। আত্মচারিত্রিক সেই 'সাম্প্রতিক'-এ সম্পাদক হিশেবে আমার নাম ছিলো না ঠিকই, কিন্তু এর নামকরণ থেকে শুরু ক'রে যাকে বলে সম্পাদনা তা আমার হাত দিয়েই ঘটেছিলো· আর পত্রিকাটির জন্যে অন্যভাবেও খেটেছিলুম আমি,—সেজন্যে ঐ সংখ্যাটির সঙ্গে নিজেকে আমার বড়ো একাত্ম মনে হয়। অবশ্য এর অর্থসংক্রান্ত দিক সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানতুম না আমি, সে-সব ব্যবস্থা অন্যরা করেছিলেন। তবে, সব সংখ্যা ছাড়ানো যায়নি প্রেস থেকে, এটুকু শুনেছি; ছাপা হয়েছিলো 'সমকাল' প্রেস থেকে। পরে আমাদের সেই যৌথ স্বর্গ ভেঙে যায়।

পরে আর একবার সমবায়ী চেষ্টা করেছিলুম আমরা আর একটি পত্রিকা বের করবার। নিজেরা চাঁদা তুলে আর বিজ্ঞাপন জোগাড় ক'রে। নাম ঠিক করেছিলুম 'কালান্তর', ছোটোগল্পের পত্রিকা, যদি বের হ'তো তাহ'লে এটাই হ'তো এখানকার প্রথম একক ছোটোগল্পের পত্রিকা। এর উদ্যোক্তা ছিলুম, খুব সম্ভবত, আসাদ চৌধুরী, মুহম্মদ মুজাদ্দেদ, ইলিয়াস আর আমি; আর সহায় ছিলেন শফিক খান (এই নেপথ্যবাসী, সাহিত্যপ্রেমিক, তরুণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিটি এদেশের বহু লিটল-ম্যাগাজিন প্রকাশের মূলে ছিলেন, এঁর সহায়তাতেই 'সপ্তক' বের হ'তে

পেরেছিলো, 'কণ্ঠস্বর' দুঃসময়ে ছিলো জীবিত ঃ এখনো তিনি 'কণ্ঠস্বর'-এর সহ-সম্পাদক)—তাঁর প্রেস থেকে দু-এক ফর্মা ছাপাও হয়েছিলো, এর মধ্যে ছিল আমাদের গল্পের উপর লেখা আসাদের প্রবন্ধ। পরে এ পত্রিকা বের হয়নি আর কেন-যেন।১

তারপর আমি লেখায় মত্ত হ'য়ে যাই; বহু পত্রিকার সঙ্গে লেখক হিশেবে যুক্ত হ'য়ে পড়লেও, 'লেখক' ও 'সম্পাদক' এই দুটি বিপরীত শব্দ ব'লে ক্রমশ মনে হয় আমার। সম্পাদক হ'লে লেখার ক্ষতি হবে, এরকম একটি ধারণা হয় আমার। কিন্তু, ক্রমে দেখি, আমাদের প্রায় সব সাহিত্যিকই এই মনোভাব পোষণ করেন। সম্পাদনার যে-একটি মহৎ দিক, সাহিত্যিক দায়িত্ব পালনের দিক, সমাজ ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণ ও নির্দেশের দিক, সে-দায়িত্ব—দেখলাম—কেউ ঘাড়ে নিতে চায় না, এবং যাঁরা সেই দুরূহ দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা হন নানাভাবে সমালোচিত। সাহিত্য ব্যক্তির, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সাহিত্যিক-যে তাঁর সমাজের প্রতিও দায়িত্বে বদ্ধ, তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসের ও চলমানতার প্রতি দায়িত্বে বদ্ধ—এই সত্য আমি ক্রমে উপলব্ধি করি, এবং একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ করতে হ'লে যে-সব বস্তুগত দিকের মোকাবিলা করতে হয়, আমি তাতে সীমাহীনরূপে অক্ষম। সেলিম এসে সেই ভার নেওয়ায় আমি নিশ্চিন্তভাবে অগ্রসর হ'য়ে যাই।

১৯৭০ সালের ১২ই ফেবরুআরি তারিখে ঢাকা-য় এলুম; সে দিনই দাড়ি বিসর্জন ও চাকরিতে যোগ দিই। কএকদিন পরেই সেলিম ঢাকায় আসে, এবং আমরা পত্রিকার কাজে নেমে যাই। একটি লেখা আগেই পেয়েছিলুম, বাকি রচনা এখান থেকে সংগৃহীত হয় প্রথম সংখ্যা, সম্ভবত, মার্চেই বেরিয়ে গিয়েছিলো ঃ ২৪-পৃষ্ঠার ছোট্টো পত্রিকা; সম্পাদক ঃ আমি আর সেলিম; প্রকাশক ঃ ইউনুস আলি; প্রচ্ছদের 'শিল্পকলা' বর্ণলিপিটি সেলিমের এক চিকিৎসক-বন্ধুর কৃত; দাম, তিরিশ পয়সা। ভেবেছিলুম কে পড়বে ঃ ছাপা হয়েছিলো মাত্র দেড়শো কপি। কিন্তু, আমার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ ক'রে, পত্রিকার সমস্ত কপি অল্পদিনেই নিঃশেষিত হয়। মনে পড়ছে ঃ সেই প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধের প্রথম শব্দটি নিয়েই এক মুশকিল বাধে। প্রয়োজনীয় লেখা প্রস্তুত, টাকারও মোটামুটি বন্দোবস্ত

করা গেছে, প্রেস্-ট্রেস সব ঠিক, আমরা পুরো পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে এসেছি —যে-দিন প্রথম প্রুফ পাওয়ার কথা, প্রেসের কর্তা জানালেন : ছাপা হয়নি, এবং তিনি ছাপাতে পারবেন না, সময় নিয়ে তিনি বিবেচনা ক'রে দেখতে পারেন। কারণ ? কারণ আর কিছু নয়, একটি শব্দ : 'সমকামিতা', সেলিমের 'সাহিত্য ও অশ্লীলতা' প্রবন্ধের প্রথম শব্দ (বাক্যটি এই : 'সমকামিতার খোলাখুলি স্বীকৃতি দিয়ে আঁদ্রে জিদ ফরাসি দেশে এক আলোড়ন এনেছিলেন।') লোকটির এই আকস্মিক ব্যবহারে সেলিম স্তম্ভিত, রাগে আমার গা জ্বলছিলো। জানতুম : লোকটি ইশকুল মাষ্টার ; এ যুগের যা লক্ষণ : ইশকুলমাষ্টারিতে ক পয়সা আর, ভেবে তিনি মুদ্রণ ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। সমকামিতা : এই শাদামাঠা শব্দটি—আশ্চর্য—দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিলো। অতিকষ্টে রাগ সংবরণ করে, ফাইল নিয়ে, তখনি উঠে পড়লুম, এবং আমাদের চেনা একটি প্রেসে (ছাপা ততো ভালো না-হওয়ায় যেখানে আগে দিতে চাইনি) লেখাগুলি অর্পণ করলুম। আসল কথা কী : প্রথমোক্ত প্রেসে থাকতেই টের পেয়েছিলুম যে সেখানে কিছু মাকিন-আপিশী কাজ এসে পড়েছিলো, এবং সে মাকিনী মুদ্রা এই ব্যক্তিটিকে অন্য-কোনো ছোটোখাটো কাজ থেকে বিরত করবার জন্যে যথেষ্ট। হয়তো আমার ব্যক্তিগত কুখ্যাতিও এর জন্যে অংশত দায়ী : '৬৯-এর নবেম্বরে আমার গল্পগ্রন্থ "সত্যের মতো বদমাশ" তদানীন্তন সরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় ; ভদ্রলোক হয়তো ভেবেছিলেন, এই বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের লেখক আবার-না কোন বিপদে ফেলে দ্যায় তাঁকে। দ্বিতীয় সংকলনে পৃষ্ঠা সংখ্যা বর্ধিত হ'লো, মুদ্রণ সংখ্যাও বেড়ে হ'লো তিনশো কপি। এই সংখ্যায় শিল্পকলার insignia ব্যবহার করা শুরু করলাম। 'সম্পাদকীয়' লিখলাম দুজন দুটি আলাদা ক্ষুদ্র রচনা 'ব্যক্তি ও সমাজ' ও 'শিল্পবোধ এবং তার সমবিতরণ' শীর্ষনামে। ততোদিনে আমাদের অলক্ষ্যেই পত্রিকার চরিত্র তৈরি হ'তে শুরু করেছে, এবং পাঠকদেরও চোখে পড়ছে। একদিন, ন্যুমার্কেটে, আমাদের তৎকালীন নিয়মিত সান্ধ্য-ভ্রমণকালে, আমার অচেনা একটি ছেলে, এঞ্জিনিয়ারিং য়্যুনিভারসিটির ছাত্র তখন, 'শিল্পকলা' সম্বন্ধে সোৎসাহ কৌতূহল দেখানোয় ভিতরে দারুণ প্রাণ-না পেয়েছিলুম। পাকিস্তান আমলে বেরিয়েছিলো আর একটিমাত্র সংকলন, '৭০-এর শেষাংশে। মাত্র চব্বিশ পৃষ্ঠার হ'লেও এ সংখ্যাটিও ছিলো মোটামুটি পরিকল্পিত।

'৭১ সালের বিলোড়নে দিশেহারা আমাদের পক্ষে, স্বাভাবিক কারণেই, কোনো নূতন সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। প্রেসে পাণ্ডুলিপি ও কাগজ ইত্যাদি গিয়েছিলো, ছাপাও আরম্ভ হয়েছিলো; কিন্তু তা প'ড়ে থাকলো এক বছরের উপর, মুদ্রিত ফর্মা নষ্ট হ'য়ে গেলো। বাংলাদেশের জন্মের পরে, সম্ভবত '৭২ সালের জানুআরির শেষে কি ফেবরুআরির সূচনায়, অনেক ক্ষতি স'য়ে, 'শিল্পকলা'র চতুর্থ সংকলন বেরোলো প্রায় নবীভূত হ'য়েই। যতোদূর মনে পড়ে, বাংলাদেশের জন্মের পরে এটিই ছিলো প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যপত্র। এই সংখ্যায় জীবনানন্দের জন্মমাস উপলক্ষে কবির কএকটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা সংকলিত হ'লো; যুক্ত হ'লো 'প্রাসঙ্গিকী' নামে একটি নূতন বিভাগ[২]; আর তরুণ শিল্পীদের স্কেচ। পঞ্চম সংকলন ১৩৭৯-র বৈশাখে প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য রচনা ভূষিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। নজরুল ইসলামের দুর্লভ রচনা-সমন্বিত ষষ্ঠ সংকলন প্রকাশিত হয় 'একুশটি কবিতা সংবলিত ক্রোড়পত্র' সমেত; 'শিল্পকলা'য় সৃষ্টিশীল লেখা এই প্রথম ভুক্ত হয়; আর এটাই এ পত্রিকার সবচেয়ে সুদর্শন সংখ্যা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরল রচনা সপ্তম সংকলনে গ্রথিত হয়েছে।

মোট আটটি সংখ্যায়, ৪২২-পৃষ্ঠার 'শিল্পকলা'য় (কৌতূহলবশত গুনে দেখেছি) আমাদের স্বপ্নের এক আইসবার্গ অংশই মাত্র প্রকাশিত। কোনো সংখ্যাই একশো পৃষ্ঠার বেশি করা যায়নি। এর মধ্যে যে-সব লেখক, পাঠক, সমালোচক, চিত্রকর, ফোটোগ্রাফার, বিজ্ঞাপনদাতা, অর্থদাতা, মুদ্রাকর আমাদের সহযোগিতা করেছেন—তাঁদের কাছে আমরা ঋণী। অনেকের কাছে একাধিক অর্থেই ঋণ র'য়ে গেলো! 'শিল্পকলা'য় বহু নূতন লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, বস্তুত বন্ধু-মহলের ও পরিচিত অনেককে দিয়ে আমরা লেখাতে চেষ্টা করেছি; 'শিল্পকলা'য় কোনো লেখাই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়নি। আমাদের বন্ধু মুহম্মদ খসরু-র কল্যাণে চলচ্চিত্র বিভাগে আটটি সংকলনের জন্যে আটজন বিভিন্ন লেখকের লেখা সংগৃহীত হয়। এ দেশ এবং পশ্চিম বাংলা থেকে যে-সব স্বতঃস্ফূর্ত পত্রালি আমরা পেয়েছিলাম, তার প্রতিটি আমাদের মধ্যে স্নিগ্ধ ও জ্বলন্ত কোনো অঙ্গারের মতো এসে পড়েছিলো, পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশে প্রেরণা জ্বালিয়ে দিয়েছিলো; সে-সব চিঠিপত্রের সবগুলির জবাব দেওয়া হয়নি।

এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে 'স্বাক্ষর'-'কণ্ঠস্বর'-এর ভেঙে যাওয়া আদি সদস্যদের —আমার সমসাময়িক—জোড়া দেবার একটি পরোক্ষ চেষ্টাও নিয়েছিলুম ঃ এঁদের অনেকে লেখা ছেড়ে দিলেও, 'শিল্পকলা'র পৃষ্ঠায় দু একবার এঁদের উপস্থিত করতে পেরে, তৃপ্তি পেয়েছি।

শিল্পের বিচিত্রবিধ বিষয়ে আমাদের উৎসাহ স্বাক্ষরিত হ'য়ে আছে 'শিল্পকলা'-র পৃষ্ঠাবলিতে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যই ছিলো আমাদের প্রধানা দেবী, কিন্তু অপরাপর শিল্পের প্রতিও সমান সচেতন ছিলুম আমরা—চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ও নাটক ;— অর্থাৎ এক কথায়, যাকে বলে সংস্কৃতি, তার চর্চায় নেমেছিলুম আমরা। ঠিক 'শিল্পকলা' ধরনের কাগজ বাংলা ভাষায় দেখিনি আমরা ; অন্য কোনো ভাষাতেও না। আমাদের অজ্ঞাতেই 'শিল্পকলা' কখন তার নিজস্ব রূপ গঠন ক'রে নিয়েছিলো —তার মধ্যে বদলও ঘটছিলো। সবচেয়ে আশ্চর্য ঃ পত্রিকাটি দিন-দিন লোকপ্রিয় হ'য়ে উঠছিলো। প্রথম সংখ্যার দেড়শো মুদ্রণসংখ্যা থেকে সে এসে পৌঁছেছিলো অষ্টম সংখ্যার এক হাজার কপিতে। 'শিল্পকলা' সম্পাদনার একটি আনন্দজনক অভিজ্ঞতা এই ঃ আমি এদেশের পাঠকের প্রতি শ্রদ্ধাবান হ'য়ে উঠেছি ; ভালো জিনিশ করতে পারলে পাঠক তার আদর করবে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই, এবং আজ আমার সন্দেহ হয় ঃ আমরাই আমাদের সুমনা পাঠকদের সুখাদ্যের যথাযথ জোগান দিতে পারছি না। পাঠকের সঙ্গে সেতু রচনার প্রবল অভীপ্সা আমাদের মধ্যে জেগে ছিলো সব সময়, পাঠক ও লেখককে বিচ্ছিন্ন ক'রে আমরা রাখতে চাইনি ('মননের সঙ্গে সৃজনের বিবাহে যে-আনন্দ, সেই আনন্দ আমরা উদ্‌যাপন করতে চাই পাঠকের সঙ্গে এক ফরাশে ব'সে।') এই দায়িত্ব ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেবার উচ্চারণ যখন বেজে উঠেছে আমাদের মধ্যে, তখনই শেষের ঘণ্টা প'ড়ে গেলো, তার তুঙ্গ পর্যায়েই অস্তমিত হ'লো 'শিল্পকলা'। তবু আজ মনে হয় আমাদের আর্থনীতিক সাধ্য তো ছিলো অতিসীমিত ; ফলে, পত্রিকা বেরোলেও, আমরা কতোদূরই-বা করতে পারতুম। বরং খুশি হবো শিল্পকলা ধরনের কিন্তু আরো অনেক উন্নত ও রুচিবান ও সর্বমুখী একটি পত্রিকা বেরোলে ; 'শিল্পকলা' সেই অনাগত অপ্রকাশিত পত্রিকার ক্ষণিক-রঙিন পূর্বসূরী হ'য়েই থাকুক।

মানতেই হবে এই ক্ষুদে পত্রিকাটি তার সমকালীন ও উত্তরবর্তী পত্রিকাগুচ্ছকে বহুল ভাবে প্রভাবিত করেছে। বৃহত্তর পাঠকমহলে তার

প্রভাব পড়বার আগেই তাকে নেপথ্যে চ'লে যেতে হ'লো বটে, কিন্তু কোনো তরুণ মনে এর কোনো রঙিন স্ফুলিঙ্গ উড়ে গিয়ে পড়বে না কি? উদ্বুদ্ধ করবে না কি পাণ্ডুলিপির রঙিন হওয়ার আয়োজন? কিন্তু সে-আশা এই মুহূর্তে দূরবর্তী ব'লেই মনে হয়, যখন কাগজের দাম অসম্ভব চড়া, ব্লকের দাম বিপুল, প্রেস-মালিকরা প্রায় দয়া ক'রে এ জাতীয় চুনোপুঁটি পত্রিকা ছাপেন, সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাগুলি বা দৈনিকগুলি যখন টাকা খায়—আর এই সব লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন বেরোয় লেখক ও সম্পাদকের গাঁটের টাকা খরচ ক'রে, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের এসব পত্রিকায় লেখা মানেই সব দিক থেকে ক্ষতি স্বীকার (আর্থনীতিক তো বটেই, এদের প্রচারসংখ্যাও সীমিত)। এ-সবের দিকে না-তাকিয়ে লিটল্-ম্যাগাজিন বের করবেন সত্থাগত তরুণরা, প্রতিষ্ঠিত কাগজে প্রতিষ্ঠিত বিষয় ও বিন্যাসের পুনরাবৃত্তি না ক'রে, আত্মকণ্ঠ উপার্জন করতে হ'লে, নিজের কথা নিজের ভাষায় বলতে হ'লে, এইসব মুখপত্রের মধ্য দিয়েই আত্ম-প্রকাশ করতে হবে তাঁদের। যদি এদেশে কোনো দিন নূতন সাহিত্য সৃজিত হয়, তাহ'লে লিট্‌ল্-ম্যাগাজিনের মধ্য দিয়েই ঘটবে।[৩]

দুঃখ? হাঁ, দুঃখ তো আছেই: 'শিল্পকলা' তার সবচেয়ে গৌরবের দিনে, সবচেয়ে সম্ভাবনার প্রান্তে এসে, তিরোহিত হ'লো। কিন্তু এ-ই হয়তো স্বাভাবিক—পত্রিকার এরকম পরিণতিই হয়তো মনে-মনে ভেবেছিলুম, নয়তো ডিক্লারেশান-এর জন্যে উৎসাহ বোধ করিনি কেন কোনোদিন, প্রথম থেকেই কেন 'সংকলন' অভিধায় চিহ্নিত করেছিলুম। আরো: সম্পাদক হিশেবে, আমার স্বভাবে লেগে-থাকার ব্যাপারটিও নেই। আর, সবদিক থেকেই 'শিল্পকলা' হ'লো লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের চারিত্র্যানুগ: যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে: একটি বিদ্যুল্লেখা সে চিহ্নিত ক'রে গেলো। সত্যি বলতে কি, শেষ-দিকে একটু কি ক্লান্তি আসেনি, লেখা জোগাড় ক'রে, প্রেসে ছুটে, পয়সার চিন্তা ক'রে, আর সর্বোপরি নিজের লেখার ক্ষতি ক'রে, একটু কি হতাশ্বাস লাগেনি? কিন্তু আনন্দ, যে-অমল আনন্দ পেয়েছি সেলিম আর আমি কোনো ভালো লেখা পেয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেসে থেকে, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় প্রেস থেকে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় চা খেতে-খেতে, এক ফর্মা সুন্দর মুদ্রণে, পরবর্তী সংখ্যার ক্লান্তিহীন পরিকল্পনার ছক তৈরি করতে-করতে, প্রাপ্ত চিঠিপত্রের জবাব দিয়ে, একসঙ্গে সম্পাদকীয় রচনায় (বস্তুত, আমাদের বেশ কএকটি

সম্পাদকীয়ই যৌথ সৃষ্টি)—তার তুলনা নেই কোনো। 'শিল্পকলা' বন্ধ হ'য়ে গেছে; কিন্তু আমরা দুজনে মিলে যে-আনন্দ সৃষ্টি করেছিলুম, যে-ক্ষণিক রাখী বেঁধেছিলুম, তার স্থায়ী প্রমাণপঞ্জি হিশেবে এই আটটি সংখ্যা, তার প্রকাশ্য নেপথ্যের ছোটো-বড়ো কথিত-অকথিত অজস্র কাহিনী সমেত, আমাদের চিরসময়ের আনন্দস্মৃতি হ'য়ে থাকবে। 'শিল্পকলা' বন্ধ হ'য়ে গেছে; কিন্তু শিল্পকলা কোনো দিন বন্ধ হবে না। 'শিল্পকলা'র সপ্তম সংকলনের সম্পাদকীয়তে উৎসাহে অলঙ্কৃত করতে-করতে এক-সময় যা লিখেছিলুম, এখানে তার পুনরুদ্ধার করি:

'শিল্পকলা'র উদ্দেশ্য বা বক্তব্য সরাসরি বলিনি আমরা কোনোদিন, পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই পরিব্যাপী রেখেছি। বস্তুত আমরা চাই শিল্পের সর্বমুখে আমাদের চেতনা জাগ্রত রাখতে, সঞ্চারিত ক'রে দিতে, নিজেকে ছড়িয়ে দিতে। চাই শিখে জীবনকে শিল্পধারে সংহত ক'রে তুলতে, চাই রুচির প্রতিষ্ঠা। তাই শৈল্পিক চৈতন্য আমরা জ্বেলে রাখতে চেয়েছি সাহিত্য-চিত্রকলা সংগীত-ভাস্কর্য-নৃত্য-স্থাপত্য-চলচ্চিত্র-নাটকের আধারে। আমাদের মধ্যে ও চতুর্দিকে এই আলো-জ্বালানোর দায়িত্ব আমরা নিয়েছি।

এই দায়িত্ব আয়তচক্ষু ও সহাস্য। তাই এই পত্রিকা বিশেষজ্ঞদের জন্যে নয়—সাধারণ পাঠকের উদ্দেশেই নিবেদিত। তারই মধ্যে একটি স্ট্যাণ্ডার্ড সংস্থান ও নির্মাণের প্রয়াস আমরা ক'রে চলেছি। মোটামুটি যে-একটি নিয়ম আমরা তৈরি ক'রে নিয়েছি, পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলোই তার সাক্ষ্য দিক। সেই সঙ্গে এইটুকু কেবল যোগ করতে চাই কোনো কঠিন ও অনড় নিয়মের পাশে আমরা ধরা দেবো না। আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে আমাদের চতুষ্পার্শ্বের সঙ্গে তাল রেখেই আমাদের পত্রিকা বেড়ে উঠবে—জীবনেরই মতো। মননের সঙ্গে সৃজনের বিবাহে যে-আনন্দ, সেই আনন্দ আমরা উদ্‌যাপন করতে চাই পাঠকের সঙ্গে এক ফরাশে ব'সে। আমরা আনন্দ ভাগ ক'রে খেতে চাই।

দেশজ ও দেশোত্তর, অতীত ও আগামীর মিলনে আমরা সমুৎসুক। বিশেষ দেশ-কালের মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু চোখ আমাদের বিশাল বিশ্বে ও অনন্ত সময়ে। যেমন আমরা পায়ের তলার মাটিকে অস্বীকার করতে চাই না, তেমনি মাথার উপরের আকাশকেও। আমরা জানি আমাদের সত্তার একাংশ অতীতনিবিষ্ট, অপরাংশ ভবিষ্যৎমগ্ন। সমস্তের যোজনাসূত্র তারুণ্য—যে-তারুণ্যকে আমরা একটি শিখায় প্রদীপিত ক'রে তুলতে চাই; সেই শিখাটির নাম 'শিল্পকলা'॥

১, আরো পরে, আমাদেরই উদ্যোগপ্রাধান্যে বেরিয়েছিলো 'আসর' নামে একটি পত্রিকা, এক-সংখ্যাতেই অবসিত হয়, যার মধ্যে 'কালান্তর'-এর আমরা কজন ছাড়া আমাদের আর-এক বন্ধু, সৈয়দ ইকবাল রুমীও, অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো।

৮. এই বিভাগটি এই নামেই পরে আরো দুএকটি পত্রিকায় চালু হ'য়ে যায়; 'প্রাসঙ্গিকী' শব্দটি আমারই নির্মাণ।

৬. 'শিল্পকলা' থেকে আনুষঙ্গিক আরে একটি কাজে হাত দিয়েছিলুম আমরা।—নাট্য-প্রযোজনার ইচ্ছে ছিলো, প্রথমদি ে া সংখ্যাগুলোতে তার বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিলো; কিন্তু পরে নাট্যবিষয়ে আমার উৎসাহ নির্বাপিত হওয়ায়, এবং নাট্যপ্রযোজনা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে মনোযোগযোগ্য বিবেচনা ক'রে, সে-সাধ বাদ দিই। আমাদের সে-সাধ বাংলাদেশ হওয়ার পরে অন্য অনেকের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হয়।

'শিল্পকলা' থেকে আরো প্রকাশিত হয় আমার অনুবাদ কবিতা-গ্রন্থ "মাতাল মানচিত্র" আর ইউনুস আলি-সম্পাদিত মিনি-ম্যাগাজিন 'শব্দশিল্প'। তখন আমাদের এখানে মিনি-ম্যাগাজিনের চল হয়েছে। ছোট্টো চৌকোনো আকারে এরকম কাগজ বের করতে আমরাও উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠলাম। সম্পাদনার ভার দেওয়া হ'লো আমাদের প্রকাশক ইউনুস আলিকে—সে-ভার কৃতিত্বের সঙ্গে পালিত হ'য়েছিলো। 'শব্দশিল্প' বেরিয়েছিলো এক সংখ্যাই; ভিতরে ধূসর কাগজে ছাপা; সে-কাগজের নির্বাচন আর প্রচ্ছদের পরিকল্পনা আলমগীর রহমানের—যে "মাতাল মানচিত্রে"র মলাটের পরিকল্পনাও করে। এ সময় ইংরেজি গ্রন্থে লেখকের কপিরাইটের সংকেতদ্যোতক যে-C ব্যবহার করা হয়,তার বিকল্প আমরা খুঁজছিলাম। আলমগীরের মাথা থেকে বেরোয় [স্ব]; 'মাতাল মানচিত্রে'ই প্রথম এই [স্ব] ব্যবহার করা হয়; আমাদের পক্ষে সুখের কথা যে, তারপর থেকে এটি বহুলভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। যাই হোক, ইউনুস আলিকে ভীষণ খাটতে হয়েছিলো 'শব্দশিল্পে'র এ সংখ্যাটি বের করতে: নিজে সে ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, আমাদের পাল্লায় প'ড়ে সাহিত্যে ঝুঁকেছে, প্রোৎসাহী সে সাইকেল কিনে নিয়েছিলো শুধু প্রেসে দৌড়ঝাঁপ করার জন্যে—আর সে কী প্রেস: একটা ফ্যান নেই, তখন দারুণ গরমকাল, এত্তোটুকু একটা দোকানঘরের মতো জায়গা, আমরা 'শিল্পকলা'র ত্রয়ী একসঙ্গে গেলেই সে-ঘরে আঁটে না. প্রেসের দরজার বাইরে, রাস্তার ধারে, প্রায় রাস্তার ওপরেই, আমাদের জন্যে টুল পেতে বসবার জায়গা ক'রে দেওয়া হয়।

সমাপ্ত